শারদীয়া চিত্রবাণী

★ ১৩৫৯ ★

সম্পাদনা ও পরিচালনায় : গৌর চট্টোপাধ্যায় এম এ

সম্পাদনায় সহযোগী : লালচাঁদ দত্ত
কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়

শিল্প-সজ্জায় : রামকৃষ্ণ বসু ও রামকৃষ্ণ দত্ত

কর্ম্মাধ্যক্ষ : নিতাই চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞাপন-সচিব : অধর মুখোপাধ্যায়

সহকারিতায় : গৌরবরণ ভট্টাচার্য্য

সূচীপত্র

আশ্বিন, ১৩৫৯

ছবির পাতায়

আর্ট প্লেটে : 'দর্পচূর্ণ' ছবিতে কানন দেবী ; 'মায় কানন' চিত্রে অঞ্জলি রায় ; 'ভোর হ'য়ে এলো' ছবিতে প্রণতি ঘোষ ; 'কবি চন্দ্রাবতী'র নায়িকা অনুভা গুপ্তা ; এম-পি'র 'আঁধি' চিত্রের এক দৃশ্যে রাধামোহন ভট্টাচার্য্য ও দীপ্তি রায় ; 'কাজরী' ছবির এক দৃশ্যে বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও জয়শ্রী সেন ; অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ; নার্গিস : সুরাইয়া ; 'মীমাংসা' চিত্রে বিপিন মুখোপাধ্যায় ও প্রমীলা ত্রিবেদী; 'উর্ষা-কিরণ' চিত্রে নিম্মি ; 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিতে সুচিত্রা সেন ; 'আজকে যাঁরা বিস্মৃত' ভারতীয় চিত্রশিল্পের প্রথম যুগের জনপ্রিয়া নায়িকা মাধুরী ও বেবী গার্বো ; 'চতুরঙ্গ' : নীলিমা, মঞ্জু, অনুভা ও দীপ্ত ; 'প্রতীক্ষা' চিত্রে সিপ্রা দেবী ;

সাধারণ পৃষ্ঠায় : মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় : 'কবি চন্দ্রাবতী' চিত্রে নাম ভূমিকায় অনুভা গুপ্তা, জয়ানন্দের ভূমিকায় অসিতবরণ, বংশীদাস-রূপে পাহাড়ী সান্যাল, এবং একটি দৃশ্যে অনুভা ও পাহাড়ী ; নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ; 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকে শিশিরকুমার ও প্রভা ; আলি আকবর খাঁ ; তিমিরবরণ ; রাধারাণী ; রবিশঙ্কর ; লতা মঙ্গেশকর ; গীতা রায় ; বিমলভূষণ ; দ্বিজেন চৌধুরী ; সত্য চৌধুরী ; সাবিত্রী ঘোষ ; দিলীপকুমার রায় ; 'ভোর হ'য়ে এলো' চিত্রের দুটি বিভিন্ন দৃশ্যে অভি ভট্টাচার্য্য ও প্রণতি ঘোষ ; 'সাড়ে চুয়াত্তর' চিত্রের এক দৃশ্যে উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (ছোট) ; মার্লিন ডিয়েট্রিক।

চিত্রবাণী

নাট্য, চিত্র ও শিল্পকলার
সচিত্র মাসিক পত্রিকা
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য—১২৲ সাধারণ
ডাকে) : ১৫।৭ (রেজিষ্ট্রী ডাকে)

পঞ্চম বর্ষ	শারদীয়া ১৩৫৯	প্রথম সংখ্যা

পঞ্চম বর্ষের যাত্রাক্ষণে

পঞ্চম বর্ষের আজ যাত্রারম্ভ, যাত্রা সুরু পশ্চাতের অরুণিত অতীত ছেড়ে সম্মুখের উজ্জ্বলতর উদিতির উদ্দেশে, প্রারম্ভ আজ প্রারব্ধ পরিক্রমণের নতুন এক পর্যায়। বর্তমানের তোরণ-প্রান্তে পৌঁছে প্রসারিত প্রেক্ষণায় ভাসমান দিগন্তবিলীন বিস্তৃত পথ-রেখা—উপান্তের আলোকস্তম্ভে প্রজ্জ্বলিত কল্প-শিখা—অম্লান, অকম্প, অর্কোদীপ্ত—যে শিখার দিশারী-আলোকে যাত্রাসুরু একদিন চার বছর আগে।

'চিত্রবাণী'র জীবনে আরও একটি শুভ্র শারদীয়ার আবির্ভাব। সমুজ্জ্বল এই চতুর্বর্ষের ইতিহাস সাফল্যের নিরিখে গৌরবময়, অভঙ্গ-ব্রাত্যের অনমনীয়তায় সার্থকতাপূর্ণ, অমলিন রুচি-শালীনতার সৌষ্ঠবে সুন্দর। প্রতিরোধহীন নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে, অমার্জ্জিত মালিন্যের আবিলতায় যখন শঙ্কিত চলচ্চিত্রের মননশীল সংস্কৃতির জগৎ, আমোদ পরিবেশনার অবিরত ভূলুণ্ঠিত যখন প্রলুব্ধ আদর্শ স্ফীত-বিত্তের অমোঘ আকর্ষণে, তখন সেই সুনিশ্চিত সঙ্কটের প্রলয়মুখে অভ্র লেহনের বলস্ফূর্ত্ত দৃঢ়তায় দাঁড়িয়েছে 'চিত্রবাণী', দাঁড়িয়েছে সংস্কারব্রতীর মুক্ত-পিধান তীক্ষ্ণ নির্ম্মমতায়, নিরপেক্ষ সেবার নিঃস্বার্থ মহত্ত্বে। চিত্রজগতের এই ঐকান্তিক সেবার অভীপ্সা সঞ্জীবিত যাঁদের প্রেরণার প্রাণপ্রাচুর্যে সেইসব সংখ্যাতীত শুভাকাঙ্খীদের জানাই আন্তরিক শুভকামনা আজকের এই নির্মেঘ আলোক-স্বচ্ছ শরতের দিনে, পঞ্চম বর্ষের যাত্রাক্ষণে।

১৯৫২

★ ★

মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়

বাংলা চিত্রশিল্পের পুনরুজ্জীবনে আজ সত্যিই আনন্দিত হবার কথা। পূর্ব্বেকার মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির তুলনায় এ-বছরের ছবিগুলি অধিকতর সাফল্যলাভ করেছে। বাংলাদেশে তোলা দু'খানি হিন্দী ছবি বাংলাদেশের বাইরে অভূতপূর্ব্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এইসব ছবির সাফল্যের একমাত্র কারণ হলো নতুন টেকনিকে তোলা অভিনব কাহিনীর উপাদান। চিত্রশিল্পের পক্ষে এটি শুভ সঙ্কেতের সূচনা করেছে এবং এটি যে চিত্রশিল্পের উন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর ফলে বহু প্রযোজক বাংলাদেশে হিন্দী ছবি তোলার জন্য বিশেষ উৎসাহিত হয়েছেন।



মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়

নতুন ক'রে ছবি তোলার এই যে উদ্যম দেখা দিয়েছে এ-বিষয়ে আমাদের অর্থাৎ প্রযোজকদের খুবই সতর্ক থাকা উচিত, আমরা যেন বিদেশীর অনুকরণে ছবি না তুলি—বিদেশী ব'লতে আমি অ-ভারতীয় বোঝাতে চাই। প্রমোদের নামে গতানুগতিক পাইকারীহারে কতকগুলি অবেদনহীন যৌন-লোমহর্ষপূর্ণ ছবির অনুকরণ যেন না ক'রে বসি। চিত্রশিল্পের যে সত্যিই বহুমুখী এবং কার্য্যকরী ক্ষমতা আছে সে সম্বন্ধে কোন ধ্যানধারণা না নিয়ে অকারণে শুধু ছবিতে প্রমোদ উপভোগের কথাটার ওপরই আমরা জোর দিই। একথা সত্যি যে প্রত্যেক ছবিতেই প্রমোদের উপকরণ কিছু থাকবেই, কিন্তু সে প্রমোদ পরিবেশনে একমাত্র যৌনতাসর্ব্বস্ব ছবি তোলার পদ্ধতিকে গ্রহণ করলেই চলবে না।

ছবি দেখতে যাঁরা আসেন তাঁদের মনের খবরটাও উপেক্ষা করলে চলবে না। নিঃসন্দেহে দেখা গেছে যে দর্শকসমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের ধাত বিভিন্ন ও বিচিত্র, সেই বিভেদ হোলো বয়স, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা এবং পরিবেশের তারতম্য অনুসারে। আবার তাদের মধ্যে অধিকাংশই হোলো মনের দিক দিয়ে পিছিয়ে। সেজন্যই বলি আমরা যে-ছবি তুলবো তার একমাত্র উদ্দেশ্য শুধু দর্শকদের ভুলিয়ে রাখা বা আনন্দ পরিবেশনই নয় সেই-সঙ্গে তাদের শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্বও ছবিকে নিতে হবে। সবাই জানেন যে, সত্যিকারের প্রমোদ মানেই কোনো না কোনো ভাবে শিক্ষা দেওয়াও বটে।

ছবির কাহিনী সম্বন্ধে ব'লতে গেলে এই কথাই বলতে হয়, বিশেষ ক'রে বাংলাদেশে তোলা হিন্দী ছবির প্রযোজকদের দেখতে হবে যেন অভিনয়শিল্পীদের কণ্ঠে উচ্চারিত [illegible] নির্ভুল হয় এবং উচ্চারণ-ভঙ্গীটিও যেন ঠিকমতো হয়। [illegible] বিষয়বস্তু বা কাহিনী-

গত উৎকর্ষ থাকা সত্ত্বেও সে ছবির সাফল্য অনিশ্চিত থেকে যাবে। তেমনি ছবির সঙ্গীতাংশ সম্বন্ধেও যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে কারণ কোন ছবির সাফল্য বা অসাফল্য সমানভাবে নির্ভর করে এই সঙ্গীতাংশের ওপর।

পরিশেষে সমস্ত প্রযোজকের কাছেই আমি আবেদন জানাই, ছবিতে প্রদর্শিত দুর্নীতি যেন সর্ব্বতোভাবে পরিহার করা হয়। অবশ্য যাঁরা বুঝতে পারেন না কোথায় তাঁদের অনুশোচনার কারণ ঘটেছে এবং কোথায় তাঁদের শুধরে নেওয়া প্রয়োজন, তাঁরা আমার এই ধারণাকে বিদ্রূপ করতে পারেন তবু আমি নিঃসন্দেহ যে অন্ততঃ কেউ কেউ আমার এ কথায় কান দেবেন এবং ভবিষ্যতে তাঁরাই একদিন আর পাঁচ জনকে পথ নির্দেশ করবেন।



শ্রীমতী কানন দেবী
দীর্ঘ দিন পরে তাঁকে আবার দেখা যাবে নবরূপে
নবতর মাধুর্য্য-মহিমায় তাঁর নিজস্ব চিত্র প্রতিষ্ঠান
শ্রীমতী পিকচার্সের আগামী 'দর্পচূর্ণ' ছবিতে



স্বর্গতঃ বড়ুয়া সাহেবের পরিচালনায় শেষ ছবি 'মায়াকানন'-এর নায়িকা শকুন্তলা চরিত্রে শ্রীমতী অঞ্জলি রায়

"শ্রীকান্ত"-র চিত্ররূপ

[শরৎচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাস-সাহিত্যের মধ্যে আবালবৃদ্ধ-বনিতার কাছে দীর্ঘদিন ধরে সমানভাবে পরিচিত ও প্রিয় 'শ্রীকান্ত' যতখানি, ততটা বোধ হয় আর কোনো উপন্যাসই নয়। একাধারে বহু চরিত্রের ভিড় দীর্ঘ চারটি পর্ব্বে, বহু ঘটনার ঘনঘটা, বহু আবেগ-অনুভূতি হৃদয়াবেদন, বহু বিচিত্র মন দেওয়া-নেওয়া, উল্লাস ও অশ্রুজল, বৈচিত্র্যময় পটভূমিকা ও পরিবেশে সার্থক এবং কৌতূহলোদ্দীপক এই উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে সকল শ্রেণীর দর্শককে পরিতৃপ্ত করার অপরিমিত এবং অনন্যসাধারণ উপাদান। দীর্ঘ চারটি পর্ব্বের এই অদ্ভুত চিত্রোপযোগী উপাদান নিয়ে বিরাট এক অনন্যসাধারণ ছবি তোলা যেতে পারে যা' ভারতীয় চিত্রশিল্পে আজো সম্ভব হয় নি, যা' ভারতীয় চিত্রশিল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাসে নতুন ঐশ্বর্য্যের দীপ্তি বিকীরণ করতে পারে। তাই 'শ্রীকান্ত'র চিত্ররূপ হয়তো বহু নিষ্ঠাবান চিত্রনির্ম্মাতার বহুদিনসঞ্চিত স্বপ্নের আকারেই আজো বিদ্যমান। ছোট বড় সমস্ত চরিত্র নিয়ে 'শ্রীকান্ত'র চারটি পর্ব্বে চল্লিশটি প্রধান ও অপ্রধান পুরুষ ও মহিলা চরিত্র। 'শ্রীকান্ত'র চিত্ররূপ যদি ভবিষ্যতে কোনোদিন তোলা হয় তবে এই চল্লিশটি চরিত্রের মধ্যে কোন্ চরিত্রটি আপনার কল্পনা ও ভালোলাগাকে নাড়া দেয় এই প্রশ্ন করা হয়েছিল বাংলা চিত্রজগতের প্রবীণ ও নবীন দলের অভিনেতা-অভিনেত্রীকে। তার উত্তরে শিল্পীরা যা' জানিয়েছেন তা'এখানে সবিস্তারে প্রকাশিত হোলো। ভারতীয় চিত্র-ইতিহাসে এই অপূর্ব্ব শিল্পীসমাবেশ ও মণিকাঞ্চন যোগ হয়তো কোনোদিনই সম্ভব হবেনা, তবু যদি কোনোদিন সত্যিই সম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায় তবে ভারতীয় দর্শক উল্লসিত হবেন ঠিকই, তার চেয়েও বেশী উল্লসিত এবং উৎফুল্ল হবো আমরা এই শিল্পীসমাবেশের প্রাথমিক আয়োজন ও নির্ব্বাচন পর্ব্বে উদ্যোগী হতে পেরেছিলাম ব'লে !

প্রথমেই জানানো হচ্ছে সম্পূর্ণ ভূমিকালিপি, পরে প্রধান চরিত্রগুলির ভূমিকা-গ্রহণেচ্ছু শিল্পীদের নির্ব্বাচন সংক্রান্ত বক্তব্য—'চিত্রবাণী'-সম্পাদক]

ভূমিকালিপি

প্রধান চরিত্র

রাজলক্ষ্মী	...	চন্দ্রাবতী দেবী
অন্নদাদিদি	...	কানন দেবী
পিসিমা	...	মলিনা দেবী
কমললতা	...	ভারতী দেবী
অভয়া	...	সুমিত্রা দেবী
টগর বোষ্টমী	...	প্রভা দেবী
সুনন্দা	...	মঞ্জু দে
মালতী	...	অনুভা গুপ্তা
পুঁটুরাণী	...	তৃপ্তি মিত্র
নিরুদিদি	...	সিপ্রা দেবী

শ্রীকান্ত (ছোট)	...	মাষ্টার নীরেন ভট্টাচার্য্য
শ্রীকান্ত (বড)	...	রাধামোহন ভট্টাচার্য্য
ইন্দ্রনাথ	...	কমল মিত্র
শাহজী	...	কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
নতুনদাদা	...	বিকাশ রায়
গহর	...	অসিতবরণ মুখোপাধ্যায়
বজ্রানন্দ	...	উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়
মনোহর চক্রবর্ত্তী		তুলসী চক্রবর্ত্তী
ছিনাথ বহুরূপী	...	ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (ছোট)
অভয়ার স্বামী	...	অমর মল্লিক
মেজদা	...	শ্যাম লাহা
মন্মথ	...	[illegible] মিত্র
[illegible]	...	[illegible]রিমোহন বসু

অপ্রধান চরিত্র

দ্বিতীয় পর্ব্বে

নন্দপাগড়ী … জীবেন বসু
(বিখ্যাত মিস্ত্রী, বর্ম্মা-জোড়া যাঁর নাম !)
জাহাজের ডাক্তারবাবু … ছবি বিশ্বাস
রোহিণীদাদা … পাহাড়ী সান্যাল
(অভয়ার ভরসা ও সম্বল)
দা-ঠাকুর … তুলসী লাহিড়ী
(বর্ম্মার হোটেলওয়ালা)
ঠাকুর্দ্দা } পুঁটুরাণীর গুরুজন … ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
রাঙাদিদি } পুঁটুরাণীর গুরুজন … শোভা সেন

তৃতীয় পর্ব্বে

সতীশ ভরদ্বাজ … অভি ভট্টাচার্য্য
(শ্রীকান্তের সহপাঠী)
কুশারী-দম্পতি … জহর গঙ্গোপাধ্যায় ও দীপ্তি রায়
(গঙ্গামাটির নায়েব পরিবার)
যদু তর্কালঙ্কার … কালী সরকার
(আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন পণ্ডিত, কুশারীর ভাই ও সুনন্দার স্বামী)
চক্রবর্ত্তী-দম্পতি … আশু বসু ও বনানী চৌধুরী
(গয়না বাঁধা রেখে যাঁরা অতিথি সৎকার করেন)
পাঞ্জাবী ডাক্তার … গৌতম মুখোপাধ্যায়
(রেল লাইনের ডাক্তার)
শিবু ও রাখাল ভট্টচায … নবদ্বীপ হালদার ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়
(দুই পাণ্ডিত্যাভিমানী পুরোহিত)

চতুর্থ পর্ব্বে

দ্বারিকাদাস গোঁসাই
(কমললতার বড় গোঁসাই) … [illegible] সরকার
পদ্মা … সন্ধ্যারাণী
(কমললতার সহচরী

যতীন … মাষ্টার সত্যব্রত
(মন্মথ-র ভাইপো)
গণৎকার
(জনৈক উড়িষ্যাবাসী) … হরিধন মুখোপাধ্যায়
কালিপদবাবু … গৌরীশঙ্কর
(শশধরের পিতা)

রাজলক্ষ্মী (চন্দ্রাবতী দেবী)

রাজলক্ষ্মী, 'সত্যিই এমন নাম কে রেখেছিল কে জানে !' রূপে-গুণে, অর্থে, প্রাণতায় রাজলক্ষ্মী রাজলক্ষ্মীই। ক্ষমায়, ধর্ম্মে, 'যাদুমন্ত্রে বশীভূত করবার ক্ষমতায়' বোধ-হয় এর জুড়ি মেলে না। তবু কয়েকদিনের 'পিয়ারী'-বৃত্তিতেই সে তখনকার সমাজে অচল ঃ ঠাকুর্দ্দা চিনতে পেরেও একটু মুচকি হেসে পা সরিয়ে নেন; রতন বারবার বরখাস্ত হয়েও চাকরী ছেড়ে যেতে পারে না; বজ্রানন্দ দু'দিনের স্নেহ-চর্য্যাতেই সকল সন্ন্যাস পরি-ত্যাগ করে কেমন ছোট ভাইটির মতো হয়ে ওঠে; "বঙ্কু সবকিছু জেনে-শুনেও মা বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে না"—বরং খানিকটা গর্ব্বই অনুভব করে (অবশ্য সম্পত্তি পাবার ও বিয়ে করবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত); সুদূরের অভয়া শ্রদ্ধা জানায়; কমললতার মতো উচ্ছল-যৌবনা বৈষ্ণবীও হার না মেনে পারে না; আর অনন্ত বৈরাগী শ্রীকান্তের হৃদয়-জুড়ে জননী-জায়া-পরিচারিকার বর্ণাঢ্য রূপের কল্যাণমূর্ত্তি নিয়ে, কখনো সরল পরিহাসে, কখনো লঘুতায়, কখনো বা আত্মসমর্পণের অকুণ্ঠ উৎসর্গের আড়ালে যে 'মন্ত্র', যে 'ইষ্ট দেবতা'-কে খুঁজে পায়, বন্ধনের নাগপাশে জর্জ্জরিত করেও যে মহামুক্তির আস্বাদ দেয়, যে ভালোবেসে বাঁচতে চায় একটিমাত্র মুহূর্ত্তের বৈচিমালার শুভক্ষণকে কেন্দ্র করে, যে সকল অহঙ্কারকে ফেলে দিয়ে বলতে পারে "তোমাদের মতো পুরুষের জন্যে কত শত মেয়ে ঐ জিনিষটাকে ("সম্ভ্রম") ময়লার মতো ফেলে দিতে পারে তা যদি জানতে; কিন্তু থাক সে কথা"—যে অনায়াসেই বিপদে সাড়া দেয় অথচ বিদায়ে

বাধ সাধে না, যার অদ্ভুত ক্ষমতাবলেই সুনন্দা ও কুশারী-গিন্নীর মধ্যেকার অচলায়তন বিচ্ছেদটা ভেঙে পড়ে, যার কামগন্ধহীন ভালোবাসা দূর থেকে মঙ্গলকামনা ক'রে প্রিয়তমের শত অমঙ্গলকে দূরে সরিয়ে রাখে, যে পাবার আগে আপনা হতেই শতগুণ দেয়, যে জীবিকার জন্যে জড়োয়ার সাজ পরে—অদৃষ্টের পাক্-চক্রে সেই কুলটা, সে-ই বহু-বিবাহিতা, সমাজ-সংসার-সংস্কার-বিবর্জিতা, তথাকথিত সকলের ঘৃণ্যা। কিন্তু এরই মধ্যে অন্নপূর্ণারূপী সাক্ষাৎ বাঙলাঘরের মায়ের পরিচয় পাই, এই চরিত্রেরই অনুচিন্তনের মাঝে খুঁজে পাই অলক্ষ্য অথচ সদা পরিদৃশ্যমান স্বাধিকারবোধদৃপ্তা, স্বাবলম্বিনী, নিষ্ঠাময়ী বাঙলার চিরবধূকে।

তবু আশ্চর্য্য, শ্রীকান্তের চোখ দিয়ে তার স্বার্থপরতা, প্রিয়তমের গুরুগম্ভীর শাসনে অবনত হয়ে থাকার বাসনা ও চির জীবন-জনম একই ধ্যান-জ্ঞানে কাটিয়ে দেবার সাধনার মধ্য থেকেই, শাশ্বতী রাজলক্ষ্মীকে আবিষ্কার করি: তার সমস্ত দোষ-গুণের মাঝেই নিজেকে হারিয়ে ফেলি। তার ছিম্‌ছাম চেহারা, 'অর্থের বিনিময়ে আয়ত্ত বিদ্যা' ও সাতাশ বছর বয়ঃক্রম, এমনকি, ভক্তির প্রাবল্যে নাক-চুল-কাটা অবস্থাটাও যেন বেশ আয়ত্ত হয়ে আসতে পারে, মনে হয়।

এই চরিত্রের প্রতি আকর্ষণ আমার বহুদিনের। এদেশের চিত্র-নির্মাতারাও কি-জানি কেন, "চন্দ্রমুখী" দেখবার পর ঐ ধরণের চরিত্রে আমায় নিয়োজিত করে ফললাভ করেছেন। সমাজচ্যুত অথচ জীবনবোধ ও আত্মসম্মানে সম্রাজ্ঞী, সেবাপরায়ণ এবং কিছুটা জ্ঞানী—এই ভাব-সমন্বয়কে আমি, বোধ হয়, ভালই ফুটিয়ে তুলতে পারি।

অন্নদাদিদি (কানন দেবী)

পরিপূর্ণ বিষাদের কালো ছায়াখানি।

সাতপাকের মোহে বুঝেছিলেন, স্বামীছাড়া বাঙালী-মেয়ের আর অন্য কোন অস্তিত্বই নেই। কিন্তু হলে হবে কি, ঘর-জামাইটি ছিলেন লম্পট, অর্থগৃধ্নু এবং পরে খুনী। ক্রমে ফেরার। পরে ফিরলেন তিনি; চিনলেন অন্নদা, ঘর ছেড়ে বাইরে পা দিলেন। যাতনার দরজা উন্মুক্ত হোল, যত্নের দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হোল পেছনে। সহধর্ম্মিণী, তাই মুসলমান হোতে হোল, সাপুড়ে হোতে হোল—নেশাবাজ, হতশ্রী একটা পুরুষ, স্বামী বলেই, তার ধ্যান-জ্ঞান অনুশীলনেই জীবন উষর হয়ে গেল। অথচ সাধ্বী; পরিপূর্ণ নিষ্ঠা, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, শুচিতায় হার মানায় কে? স্নেহ-ভালবাসার অপ্রতুল ভাণ্ডার যাঁর মন, ঝলসে দেবার মতো যাঁর রূপের জ্যোতি, পিতা যিনি পেয়েছিলেন ধনবান্—তাঁকেই অবশেষে দুটি কানের মাকড়ি বিক্রি করে মৃত স্বামীর ঋণ শোধ করতে হোল। স্নেহের বিনিয়োগে ইন্দ্রনাথের মতো দামাল ছেলেকেও বশীভূত করেছিলেন তিনি। অথচ, হিন্দুয়ানীর চরম ধর্ম্ম দেখিয়েও নারীত্বের পরিচিতি পান নি। পেয়েছেন অপযশ, ঘৃণা, লাঞ্ছনা, দুঃখ এবং অপরিসীম অর্থকষ্ট।

গঙ্গার পাড়ে নিজের সিঁদুর নিজেই মাটী ঘসে ঘসে তুললেন, নোয়া-শাঁখা ভাঙ্‌লেন; নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন তারপর, একটা করুণ হাতছানি রেখে। সমাজ-সংসার কেউই ফিরেও চাইলে না।

অন্নদাদিদির চরিত্রায়ণ আমার মনোলোকের বাসনা। অন্যান্য ছবিছাড়াও আমার 'অনন্যা' যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা মনে হয়, 'অন্নদাদিদি' রূপে আমাকে দেখলে খুব নিরাশ হবেন না। আঙ্গিক ও কণ্ঠবৈশিষ্ট্য যেখানে আমাকে ঢেকে দেখাবে না আমার রূপায়ণকে, ঠিক সেই রকম একটি চরিত্র "অন্নদাদিদি"। শরৎচন্দ্রের এই অমর সৃষ্টির প্রতি আমার বাস্তবিক একটা উদগ্র ভালোবাসা আছে।

পিসিমা (মলিনা দেবী)

সংসারের সবচেয়ে ব্যক্তিত্বসম্পন্না আদর্শ গৃহিণী হচ্ছেন পিসিমা। পিসেমশায় থেকে দেউড়ির দারোয়ান পর্য্যন্ত যাঁর 'হাঁ'-কে 'না' করবার দুঃসাহস রাখে না; এমনকি 'নাকঝাড়া', 'থুতুফেলার' টিকিট দস্তখতকারী একবার শ্রীকান্তকে ধমকাতে গিয়ে বেজায় 'থ' বনে গেল, যে

মেজদার দাপট ছোটদের কারো কাছেই অবিদিত ছিল না। স্বল্পভাষিণী অথচ স্থায়-নিষ্ঠাবতী ; লুকিয়ে লুকিয়ে নিরুদিদির মতো অসহায়া, 'একঘরের' কাছেও দান পাঠান ; সু-রসিকা তো বটেই—কেননা ছিনাথ বহুরূপীর স্থাজ কেটে দেবার কথায় পিসেমশায়কে বলেন : ওটা কেটে তোমার কাছেই রেখো, অনেক কাজে লাগতে পারে।

সকলের অলক্ষ্যেই কাজ করে যান ; সবাইয়ের ওপরই স্নেহ-ভর্ৎসনা-ঘেরা শান্ত-সুস্মিত দৃষ্টি ; অথচ পাঁজি দেখে বার্তাকু ভক্ষণ করেন, আবার অসুখ করলে খাইয়ে-দাইয়ে শ্রীকান্তকে নিজের ঘর খুলে বিছানার ওপর শুইয়েও রাখেন।

এমন চরিত্রকে অনুধাবন করার মাঝে কোথায় যেন একটা অভ্রংলিহ গর্ববোধ লুকিয়ে থাকে, চারিত্রিক ভঙ্গি-মাতে অসম্পূর্ণ নিজেকে একবার পুরোপুরি দেখে নিতে বাসনা হয় ; হয় না কি ? এই পিসিমার ভেতর দিয়ে ?

সচরাচর মাসিমা-পিসিমা ক'রে যেসব চরিত্রগুলোর মধ্যে আমাদের ঠেসে ধরা হয়, তাদের চাপে আমরা প্রায়ই কোনঠাসা হয়ে পড়ি। কিন্তু এই 'পিসিমা' যে একে-বারে অন্যজাতের সে কথা তো আগেই বলেছি। মঞ্চে ও শরৎচন্দ্রের বা ঐ-ঘেঁষা গুটিকয়েক ছবির মধ্যে আমার যে পরিচয় দিতে পেরেছি, আশা করি, এই 'পিসিমার' ভেতর দিয়ে আমি তার শতগুণ ধরে দিতে পারব। এটা যেন আমার নিজের গড়া একটা ভূমিকা।

টগর বোষ্টমী (প্রভা দেবী)

কণ্ঠি বদল করেছে বলেই যে নন্দ পাগড়ীকে বিয়ে-করা সোয়ামী বলতে হবে এমন কোন কথা এদের শাস্ত্রে লেখা নেই।

ইয়া দশাশয়ী চেহারা, দাপটের চোটে নন্দ বেচারী অস্থির। নিজের খাওয়া-দাওয়া, ঘুম, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আগে, তারপর সংসারের আর সব। চলেছে নন্দ পাগড়ী বর্ম্মা-মুল্লুকে, এবারে একেবারে টগরকে সঙ্গে নিয়ে।

জাঁহাবাজ মেয়েছেলে। গলার স্বরেও কমতি নেই। ডেকের ভেতর কয়েকটা কাবুলিওয়ালা মিন্সের দিকে ঘন ঘন নরম দিষ্টি ছুঁড়ে মারতেও ঘাটতি নেই। ওদিকে নন্দর খাবারের হাঁড়ি যে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে, কারোর বলবার জো আছে! দুপুরবেলা ঘুমোলে কারোর ডেকে তোলার সাধ্য আছে? তবু মিস্তিরীর কী আশ্চর্য্য স্নেহ, অবিমিশ্র কৌতুকবোধ।

মাথা ধরলে বিরাট পাগড়ী বাঁধে—বিশ বছরের কণ্ঠি-বদলানো দেহে এতটুকু টোল খেতে দেবে না সে কোনমতেই।

একটু খুঁজে-পেতে দেখলে, দেখা যাবে, এই সব মিস্তিরি-কুলকে এই টগর বোষ্টুমীরাই চিরকাল ধাতে রেখে এসেছে।

প্রভা ছাড়া ন্যাকা ন্যাকা কথা-বলা দজ্জাল মেয়েছেলের চরিত্র অভিনয় করার কথা কেউ ভাবতে পারে,—আপনারাই বলুন না, এঁ্যা? আমার অতশতয় দরকার নেই বাপু, এই "বোষ্টুমী"-ই মাৎ করে দেব, দেখ'খন!

অভয়া (সুমিত্রা দেবী)

চওড়া কপাল, অপরূপ রূপসী, 'চাপা-আগুন' মনে হয় যেন মেয়েটিকে। বাইশ-চব্বিশ বছর বয়েস, রোহিণী-দাদাকে সঙ্গে নিয়ে বর্ম্মা-মুল্লুকে হারিয়ে-যাওয়া স্বামীকে খুঁজতে বেরিয়েছে, তার জন্যে সে কৃতসঙ্কল্প, কোন বাধা, কোন ছোট দেওয়া-নেওয়া, কোন ওজর-আপত্তিতেই টলতে রাজী নয়। ভেতরে হয়তো একটুখানি কমপ্লেক্স্‌ও আছে—রূপ যার এতো, একবার চাইলেই যেখানে মা-লক্ষ্মী সংসার সাজিয়ে দেন, এমন শুশ্রূষা পরিচর্য্যা করবার দক্ষতা যার আছে, হৃতস্বামীর সম্মুখীন হ'লে তাকে আপন করে নিতে পারবেই। এই তার অনুমান। এই তার দাবী।

অথচ, তা হোল না। সারাগায়ে বেত্রদণ্ডের কলঙ্ক মাখিয়ে সতী-সাধ্বীকে পরমগুরু স্নেহের গঙ্গা বইয়ে দিলেন অতএব পালিয়ে আসতেই হোল—সংস্কারকে পেছনে ফেলে রেখেই। একেবারে সটান রোহিণী দাদার কাছে, যার হৃদয়-দুয়ারে ওর আসন পাতাই ছিল। তবু মনে মনে বিদ্রোহ করে, বারবার প্রশ্ন করে নিজেকে, শ্রীকান্তকে—ভুল তার কিছু হয়েছে কিনা! তার এই প্রাণ, এই সফল যৌবনের জীবনস্পৃহা কি এতই নগণ্য যে রুদ্ধ-দ্বার স্বীকৃতির গর্ভে বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রতিবাদে নিজেকে সঁপে দিতে হবে? অথচ, সকল সম্পদই তো তার উন্মুখ হয়ে রয়েছে ফুলে-ফলে ভরিয়ে দেবার,—এ সংসারকে। কঠোর যুক্তি নিয়ে চলে, যেখানে আজন্ম সংস্কারও হোঁচট খায়, বাধ্য হয় মাথা নোয়াতে।

প্রত্যাশা না নিয়েই আকর্ষণ করে, প্রাণ ঢেলে সেবা ক'রে, যত্ন ক'রে আপন করে নিতে চায়। এ মেয়ে তবুও অধঃপতিতা, সমাজে অস্পৃশ্যা একেবারেই উপেক্ষিতা। এমন, যা রাজলক্ষ্মীকেও বিশেষ প্রভাবিত করেছিল।

অভয়ার সঙ্গে প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য যে আমারও খানিকটা আছে, একথা অন্তরে-অন্তরে বুঝি। 'স্বামী' ছবিতে আমার অংশটুকু যাঁদের পরিতৃপ্ত করেছে, তাঁরা, আমার মনে করা অন্যায় নয়, 'অভয়া'-রূপে আমাকে দেখবার দাবী নিশ্চয়ই করতে পারেন। আমারও দৃঢ় ধারণা, 'অভয়ার' মধ্য দিয়ে আমি তাঁদের সে দাবীটুকু নিঃসন্দেহে পূরণ করে দিতে পারি।

কমললতা (ভারতী দেবী)

প্রকৃত উর্ব্বাঙ্গিনী, 'একজোড়া মোটা কালো ভুরুর' পাল্লায় পড়ে অবশেষে নবদ্বীপে আসে কমললতা। এক টাকার বিষ কিনতে পাঠালো যাকে, সে হতভম্ব হোল: বদনামের ভাগী হয়ে আত্মহত্যা করলো, করালেন নিজের 'জোড়াভুরু' কাকা। শিলেটের মেয়ে। বাপের সম্পত্তি ছিল! ভরা যৌবনের স্বপ্নে বিভোর—পদস্খলনও হোল। অথচ উপায় নেই। সমাজের সাজা মাথা পেতে নিতেই হবে!

প্রাণে-টগমগ, যার কীর্ত্তন শুনে গহর মজলো, শ্রীকান্ত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল—সে কেন এভাবে আত্মসমর্পণ করলো গেরুয়া রঙের কাছে? আশ্চর্য্য লাগে। জাগিয়ে দেবার, বাঁচিয়ে রাখার কী অপূর্ব্ব উন্মাদনা ওকে ঘিরে

থাকে ওর চারিদিকে, কিন্তু সে ডাকে সাড়া দেবে কে? আবার বদনাম। গহর বেচারা! ইষ্টিশান থেকেই ছাড়াছড়ি। শ্রীকান্তকে কী চোখেই না দেখেছিল! শেষ বিদায়ের আগে অন্ধকারে একটা টিপ্ ক'রে বুঝি পেন্নামও করলো।

কমললতার কামনা জড়ায় না কাকে; কেন জড়াবে না? দোষটা তার কি? কেই-বা তাকে দেখিয়ে দেবে কোথায়? রক্তের ডাকে, মাংসের হিসাবেই মানবী সে। তবু কতো নিঃস্বা, কতো অনুশাসনের চাপে প্রপীড়িতা, কী ভয়ঙ্কর আত্ম-অস্বীকারের আয়োজন তার চারিপাশে, তার সত্তার বিরুদ্ধে।

কমললতাই তো শ্রীকান্তকে দেখিয়ে দিয়েছিল তার আসল রূপ; ধরা দিয়েও অভিমান করে দূরে সরেছিল; তারপর অনায়াসেই বিচ্ছেদকে আপন করে নিলো—কোন অনুযোগ, অভিযোগ করলে না; যাবার আগে শুধু রেখে গেল বৈরাগীর পদপ্রান্তে একটি উজ্জ্বল প্রণাম। অসময়ে, মন-গোধূলি বেলায়।

'বন বুল বুল গাছি গান' দেখার পর, মনে হয় না, 'কমললতা' করায় আমার অভিনয় বাঙলার দর্শকসমাজ সইতে পারবেন না। ঠিক এই ধরণের চরিত্রই আমি চাই, যেখানে আপাতঃ আনন্দ থাকলেও ভেতরে ভেতরে একটা করুণতার ছাপ থাকবে! উপরন্তু আপনারাও নিশ্চয়ই বলবেন, প্লে-ব্যাক গানে আমি লিপস্ ভালই দিয়ে থাকি—কমললতার কয়েকখানা কীর্ত্তন থাকতে পারে এটা তো ঠিক।

পুঁটুরাণী (তৃপ্তি মিত্র)

সরল গ্রাম্য মেয়ে। জানে চোদ্দ বছর পেরিয়ে গেলে আর বিয়ে হবে না। বিয়ের খদ্দের মাত্রেই ভাল। শ্রীকান্তকেও পছন্দ হয় আবার শশধরকেও। জানে, বিয়েতে টাকাটাই আসল। সেটা যেমন করে হোক্ জোগাড় করা চাই-ই।

প্রীতি দিয়ে লজ্জা দিয়ে সংসারকে তরাট করার স্বাভাবিক নিপুণতা আছে। শুধু ঠা[illegible], সব লজ্জা খুইয়ে এসেছে শ্রীকান্তে[illegible]র করতে। ধরা পড়লেও, সত্যি কথাকে বেঁকিয়ে বলার বালাই নেই—যা বলার অকপটেই বলতে পারে।

সংসারে গড্ডালিকা প্রবাহের মতো এরা আসে যায়; গুরুজনদের বিধান, সে যতো কঠোরই হোক্, মাথা পেতে নেয়। ভাগ্যকে বিশ্বাস করে ভগবানের চাইতে বেশী। আর, মেয়েমানুষ তো ভাগ্য নিয়েই জন্মায়!

পুরুষ মানুষ, অবিবাহিত অথবা মৃতদার হলেই, যখন বাপ্-মায়ের বিশেষ খাতিরের কারণ হয়ে ওঠে—এরা বুঝে নেয় ঠিক তখন তাকে কেন 'অমন' করা হচ্ছে। কোন সঙ্কোচ নেই দ্বিধা নেই; এরা যথারীতি যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়েই আছে।

পুঁটুরাণীর ভাগ্য ভাল যে, শ্রীকান্তের কাছে শশধরের কথাটা বলতে পেরেছিল। এর মধ্যে ঠাকুদ্দার হাত কতখানি কে জানে! তা না হলে, ঠিক ঐ সময়ে, তিনি বাহরেই বা চলে গেলেন কেন?

"গোপীনাথ" (হিন্দী) ও গণ-নাট্য সংঘের নাটকগুলোতে আমাকে যারা দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এটুকু বুঝেছেন যে, বেশী কথা বলার চেয়ে ভাব-ব্যঞ্জনা ও সুষ্ঠু প্রকরণাদির ভেতর দিয়েই আমি অভিনীত অংশটিকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করি। বাঙলার গ্রাম্য মেয়ে, ভাষা নেই ভাব আছে, দাবী নেই ক্ষমা আছে, এমন চরিত্রই হচ্ছে "পুঁটুরাণী"—যার রূপ-যশও বিশেষ আছে বলে মনে হয় না। বহু চরিত্র থাকা সত্ত্বেও "পুঁটুরাণী" তাই আমার selection.

সুনন্দা (মঞ্জু দে)

নির্ভীক নারীত্বের সমুজ্জ্বল শিখা এক। শিবু তর্কালঙ্কারের মেয়ে, যদু কুশারীকে হৃদয়-বিদ্ধ করিয়া জয় করিয়াছে, মানুষ করিয়া তুলিয়াছে—পার্থিব স্নেহ-শ্রদ্ধার উপরে প্রকৃত ধর্মাধর্ম-জ্ঞানকে স্থান দিবার উপযুক্ত শিক্ষা, সৎসাহস ও বুদ্ধি দিয়াছে। শ্যামবর্ণা, সুন্দরী, বিদুষী, কিছু-প্রগল্ভা, ধীর, স্থৈর্যশালিনী ও স্বামী-পুত্রের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার। কষ্টে পড়িয়া স্বামীকে হাটে বেগুন বিক্রি করিতে পাঠাইয়াছে, কিন্তু দমে নাই।

কানাই বসাকের স্ত্রী-পুত্রকে কড়ায়-গণ্ডায় তাদের সম্পত্তি না বুঝানো পর্যন্ত রেহাই নেই—এমনই ধনুকভাঙ্গা জেদ। ভাশুরের মুখের উপর সত্য বাক্য বলিয়াছে, অপ্রিয় জানিয়াই। রাজলক্ষ্মীকে বিভ্রান্ত করিয়াছে; শ্রীকান্ত-'লক্ষ্মী'র মধ্যে একটা হাল্কা ব্যবধান করিয়া দিবার সহায় হইয়াছে; আবার ভাঙ্গা সংসারে জোড়া লাগাইয়াছে—সুখকে দশগুণ করিয়া বাড়াইয়া দিয়াছে। অহং-শূন্যা, বিনয়ী, ক্ষমাশীলা সে। বয়সে যদিও তরুণী।

তবু, রাজলক্ষ্মীর যেন মনে হয়, তার এ সমস্ত বিদ্যাই যেন অপরের মনে কষ্টের উদ্রেক করিবার জন্যই; মনে হইয়াছে, এ বিদ্যা হয়তো প্রকৃত বিদ্যা নহে।

অথচ, সুনন্দার সহিষ্ণুতা, অকপট-আচরণ, "পান হঠাৎ ফুরোয়নি, হঠাৎ একদিনই ছিল," 'লক্ষ্মী'কে মুগ্ধ করিয়াছে, বশীভূত করিয়াছে। এমনকি, শ্রীকান্তকেও ভুলাইয়াছে। হায় রে!

আমাকে দিয়ে খালি sophisticated রোল করানো হয় কেন জানিনা, দু'পাতা ইংরিজি পড়েছি বলে? "সুনন্দা" চরিত্রটি বাস্তবিক আমার এত ভাল লেগেছে যে আর কি বলব। অমনি তেজোদৃপ্ত, দরিদ্রা অথচ আদর্শাশ্রয়ী পার্ট না করলে আমার অভিনয়-জীবনই যেন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কেবল মনে হচ্ছে, সুনন্দা আর মঞ্জু দে—দুজনেই এক নয় তো? আপনারা হাসবেন হাসুন, আমার আপত্তি নেই। আমার বক্তব্য আমি খোলাখুলি প্রকাশ করলুম।

মালতী (অনুভা গুপ্তা)

ছোটঘরের মেয়ে। আঁট-সাঁট গড়ন। অতি অস্বাভাবিক রকমের সাজ-পোষাকবিলাসিনী। কাঁচপোকার টিপ পরে, রূপো-পেতলের গয়না পরে। নবীন ভালবেসেছে। ঝগড়া করে বটে, কিন্তু মালতীর জন্যে অনেক করেছে। অনেক কিছু বিলাসের উপকরণ জুগিয়েছে; বিয়েও করেছে। ছোট জাত, তাই হাতের শাঁখাগুলো পটাপট্ ভেঙে দিলেই বিধবা করে দেওয়া যায়! নবীন রেগে একদিন তাই করে দিলে।

জীবনটা সত্যি-মিথ্যের আলো-আঁধারি। নবনে যখন মাথা ফাটিয়ে জেলে গেল তখন কান্নাকাটি করলে, দুঃখু করলে। গঙ্গামাটির মা—রাজলক্ষ্মী, চুপিচুপি দু'শ টাকা দিলেন; নবনে-মালতী একরাতেই কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল—পুলিশের খপ্পর থেকে।

কিছুদিন পরে নবনের কোন পরিবর্তন হোল না বটে, কিন্তু মালতী বেশ আর একটা ভাঙ্গা করে নতুন সংসার পাততে এলো গঙ্গামাটিতেই। নবনের সে-রকম কিছু দোষও যে ছিল তা নয়।

এই ধরণের নিষ্ঠুর এবং উস্কে-দেওয়া চরিত্র অভিনয় করবার ইচ্ছে আমার বহুদিনের। প্রচলিত নীতি ও সমাজ-বোধ এদের অত্যন্ত অল্প বলেই এরা সুখকে আয়ত্তের মধ্যে পায়, খামখা গুমরে মরে না। শরৎচন্দ্র ছাড়া অন্য কেউ লিখলে এই মালতীকে একটা কিম্ভূত করে দাঁড় করানো হোত; সেইজন্যেই মালতীকে খুঁজে দেখার এত আগ্রহ আমার।

স্থূল হলেও আবেদন যার সূক্ষ্ম, এই চরিত্রই আমার বেশ ভালো লাগে। 'রত্নদীপে' যে আমি আপনাদের খুসী করতে পেরেছি, তার অন্যতম কারণ হয়তো শ্রদ্ধেয় দেবকীবাবু আমার এই মনোভাবটি সুস্পষ্ট ধরতে পেরেছিলেন। 'কবি', 'রত্নদীপ' ও 'শ্রীকান্তে' 'মালতী' আমার তো মনে হয়, একই সিঁড়ির বিভিন্ন কয়েকটি ধাপ মাত্র। এ-চরিত্রের সদ্ব্যবহার, আশা করি, আমার দ্বারা অসম্ভব হবে না।

নিরুদিদি (সিপ্রা দেবী)

পাকচক্রে পড়ে লোকাচার-দুষ্ট সামাজিক অনুশাসনের কবরে আজ 'একঘরে'। মূর্তিমতী বেদনা। অথচ একদিন ছিল, যখন পাড়ার সবাইকার খোঁজ রাখতেন, অসুখে কষ্টে আপ্রাণ সেবা-শুশ্রূষা করে ভালো করে তুলতেন, নিঃস্বার্থভাবেই।

এখন, দেখবার মধ্যে আছে পোড়ভাঙ্গা শ্রীকান্ত, আর পিসিমার গোপন [illegible]। এঁরই শেষদৃশ্যটি অতীব মর্মন্তুদ। [illegible] ধীরে ধীরে গ্রাস করতে আসছে।

'কালো কালো ভয়ঙ্কর দূতেরা দাঁড়িয়ে আছে জানলার বাইরে, ম্লান ভাবে ডেকে বললেন, "শ্রীকান্ত আজ তুই বাড়ী যা।" ওরা কেবল শ্রীকান্তের জন্যেই ভেতরে ঢুকতে পারছে না, তাই বাইরে থেকেই চোখ রাঙাচ্ছে। দেখেছিস? তারপর তারা এলো···মৃত্যুর ঘোরে কী সে আকুল মিনতি, কী ভয়!'

ছোট্ট চরিত্র, কিন্তু দশটা বড় বড় চরিত্র-ও এ-ট্রাজেডী, এ-বেদনা-বিধুরতায় ম্লান হয়ে যায়। অন্তরে, যে জীবনে কোনদিন, খুব বড় ব্যথা পেয়েছে, অথবা, দেখবার সুযোগ পেয়েছে, শুধু সে-ই নিরুদিদির মতো সার্থক চরিত্রসৃষ্টিকে অবলম্বন করে দুর্বল সমাজের চোখে নতুন করে আবার জল এনে দেবে, দিতে পারে।

ট্রাজেডীই আমার অভিনয়-জীবনের রক্ষাকবচ। জীবনে অনেক ভাঙ্গা-গড়ার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকায় এবং বিশদ করে, ভাল চাইতে গিয়ে বিপদ বরণ করে নেবার অযথা বিড়ম্বনা আমাকে বহুবার ভোগ করতে হয়েছে। নিরুদিদির শেষদৃশ্যটি আমাকে, কেন জানিনা, যতবার পড়ি ততবার অভিভূত করে ফেলে। সাদাসিধে হলেও একটু ট্রাজেডী আছে এমন চরিত্র অভিনয় করে, মনে হয়, আমি বাঙলার দর্শকসমাজকে কিছু খুসী করতে পেরেছি।

শ্রীকান্ত (রাধামোহন ভট্টাচার্য্য)

আপাতঃদৃষ্টিতে গোবেচারা, পরের অন্নে ও দয়ায় মানুষ নির্বিরোধ আদর্শ-সংসর্গ নির্ব্বাচনে পটু, নেতার একান্ত ডিসিপ্লিনড্ শিষ্য হিসাবে এই চরিত্রের সূত্রপাত —বয়স বড় জোর বার হইতে চৌদ্দ। এরপর প্রায় ছিন্ন-বিছিন্ন বিশ বৎসরের ইতিহাস—রোগের ভোগের বাসনার অভিমানের উৎপ্রেক্ষিতার, বৈরাগ্যের, অনুশোচনার, অভিজ্ঞতার। অতিসাধারণ বাঙালী-ঘরের ছেলে, দাপট নাই, বিক্রম নাই, অর্থ নাই, কিন্তু প্রাণ আছে; বিপর্যস্ত হইবার দেহ আছে কিন্তু কাহারো উপরে আক্রোশ নাই; বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার [illegible] করিবার, দুরন্ত রোগে শিয়রে বসিয়া নীর[illegible]বা করিবার, "আসিবার পূর্বে খুঁটির ধারে তখনকার বহুমূল্যবান পাঁচ পাঁচটি টাকা রাখিয়া আসিবার" অপরের ব্যথায় ব্যথী হইবার সৎসাহস আছে। ভালোবাসিবার মতো হৃদয় আছে, নিজেকে পূর্ণ সমর্পণের সৎসংকল্প আছে, কিন্তু পুরুষ মানুষ হইয়া জন্মিয়া 'সম্ভ্রম' ত্যাগ করিবার মতো বৈপ্লবিক চেতনা নাই—অথচ কলঙ্ক-কালিমা বহন করিয়া বেড়াইবার দুর্জয় সাহসেরও অভাব নাই। সাহসী, তামাকুপ্রিয়; চা-জল খাবার নিঃসঙ্কোচে গলধঃকরণ করিতে আপত্তি নাই; ছুঁৎমার্গ নাই, জাতি-বিচার নাই; তবু একান্তভাবেই যার হাতে আপনাকে সঁপিয়া শান্তি, তার উপরই রাজ্যের আঘাত, অপমান, অভিমান হানিয়া, এমনকি, অভয়া ও তার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম তফাৎ লইয়া খানিকটা মনোকষ্ট; সংসারে ভক্তি করিবার মতো একমাত্র পিসিমা ছাড়া আর কেহ নাই, এমন ব্যক্তি যে বারবার জ্বরে অসুখে বিঘ্নিত, সময়ে সময়ে অর্থাভাবে বিড়ম্বিত, বিপদে 'লক্ষ্মী' ছাড়া গতি নাই; মনের অন্ধ প্রকোষ্ঠে এক বৈরাগীকে লইয়া শুধু বাস করে—সে শুধু নিশ্চুপ নিশীথে একান্ততার মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়ায় আর বলে, 'ছি, ছি।' তাই কমললতাকে ভালো লাগে : নিজে বৈরাগ্য-অহমিকাবোধে, অপরের নির্ভয় আশ্রয়স্থল না হওয়ায়। একদিকে যেমন বেপরোয়া, আবার অন্যদিকে ততখানিই নীড়-অভিলাষী, শান্ত, সংযত, রসিক ও নির্জনতা-প্রিয়। সমাজ অব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন—কন্যাদায়গ্রস্তকে বিমুখ করতে নারাজ, জীবিকা-কল্পে চাকুরী ছাড়া অনন্যোপায়, প্রায়-ক্ষীণজীবি অথচ দৃঢ়-চেতা। এ-ই তো বাঙলার পুরুষের সাধারণ ছবি, ইনিই একাধারে শিব-শঙ্কর-পরশুরাম-কার্তিকেয়। মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত, প্রথমটি বর্মা যাওয়া পর্য্যন্ত; দ্বিতীয়টি বর্মা হইতে ফিরিয়া আসার পর। এমন চরিত্রের সহিত একাত্ম হইতে কে না চায়!

শ্রীকান্ত চরিত্রটি পছন্দ হওয়ার মূলে আমার দুইটি কারণ রহিয়াছে; প্রথমতঃ, এই চরিত্র খাঁটি ও নির্ভেজাল বাঙালী চরিত্র; দ্বিতীয়তঃ ইহা জ্ঞান ও স্বীয় জীবনদর্শনকে লাঠি উঁচাইয়া দেখাইতে চাহে না এবং মূলতঃ শম্বুকবৃত্তি-পরায়ণ! অথচ অতি সহজেই দাগ কাটে : সহজ বলার

কারণ, অতি দুরূহ আভিনয়িক কার্য্য-কলাপের পরবশ বলিয়াই। আমার অভিনয়-রীতির সহিত যাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে তাঁরা হয়তো জানেন, আমার কৌশল ভাবণে উপলব্ধ বিষয়বস্তুর প্রতি অসংশ্রবঘটিত জ্ঞানোন্মেষক, পরিচ্ছন্ন অভিব্যক্তিতে। শ্রীকান্তের মার্জিত অসহায়তা একটি রূপক নিশ্চয়ই।

ইন্দ্রনাথ (কমল মিত্র)

বাঙ্‌লা সাহিত্যের বিস্ময়কর চরিত্রসৃষ্টি এই 'বড়লোক রায়েদের ছেলে ইন্দ্রনাথ বয়েস ১৬।১৭, খুব লম্বা-চওড়াও নয়, অথচ ধনঞ্জয়ের মতো আজানুলম্বিত বাহুযুগল, যা নিমেষে অসাধ্য সাধন করতে পারে। কিল-চড়-লাথি, ঘুসোঘুষি, পটাপট ছাতাভাঙার শব্দ, মুখ-খারাপ, 'ওরে বাপরে' ইত্যাদির ভেতর থেকে অনায়াসে, ফুটবল ম্যাচ গ্রাউণ্ড থেকে, ঠিক আপন শিষ্যটিকে বেছে নিয়ে পথ দেখিয়ে বাইরে নিয়ে আসতে পারে। কেউ তার পথ রুখে দাঁড়ানার সাহস করে না, দু'ঘা দেবার মতো স্পর্দ্ধার কথা চিন্তাই করতে পাবে না।

অথচ, সংসার সম্পর্কে একেবারই নির্বিকার, ভবঘুরে, একটু ফিট্‌ফাট্, পরোপকারী, দুরন্ত সাহসী, অজাতশত্রু, সর্বময়গতি, দয়ালু, বিরাট হৃদয়, ছকবাঁধা লেখাপড়ায় বিরোধী, কিছু অভিমানী ও নির্জ্জনতা-বিলাসী ; স্থিরপ্রতিজ্ঞ, বলবান ও মন্ত্রগুণ-বিশিষ্ট যার বাগ্‌ভঙ্গী। যা সহজে বশ মানায়, পোষে।

দু' পাঁচ বছরের পরিসরের মাঝেই হঠাৎ দেখা দিয়ে সমস্ত চেতনাকে অসাড় করে দিয়ে, আবার অকস্মাৎই অন্তর্দ্ধান হয়, ফেলে রেখে যায় একটা বুকভাঙা স্মৃতি, মুগ্ধ ভালবাসা, অপার বিস্ময়।

বোধহয় মীনরাশিতেই তার জন্ম, এবং চন্দ্রও তুঙ্গে ছিল তার। অন্ধকারকে জয় করাতেই তার আনন্দ : আর অদ্ভুত তার বাঁশী বাজাবার ক্ষমতা, দাঁড় বাইতে পটু, দক্ষ নাবিক সে—নদীর গতিবিধির যে কোন অবস্থাতেই।

বন-জঙ্গল, সাপ-খোপ, ভুতের ভয় করে তাড়িয়েছে ; সারাবাড়ীর যা সাহস হোল না, এই ছোট ছেলেটাই তাই করলে', হ্যারিকেন আলো নিয়ে গিয়ে ছিনাথ বউরূপীকে আবিষ্কার করলে বাঘের চামড়ার ভিতর থেকে! ইস্কুলে কি একটা, পণ্ডিতের পিঠের ওপর করে, শিক্ষকের শিখা-গুচ্ছটি সযত্নে কাঁচি দিয়ে কেটে পকেটের মধ্যে ন্যস্ত করে। ('পাছে খোয়া যায়'—এই ভয়ে), রেলিঙ টপকে সেই যে বেরিয়ে এল, তারপর থেকে আর গেটের পথ দিয়ে ঢুকতে পারলে না। অথচ অন্নদাদিদির জন্যে প্রাণ কাঁদে ; চুরি করে মাছ ধরে বিক্রি করে, টাকা নিয়ে গিয়ে দেয় ; শাহজী দু' একটা কি বিশ্বে দেয় নি বলে মারামারি-গালমন্দ করে ; এক সঙ্গে বসে তোফা গাঁজা খায়—তাছাড়া কাঁচা সিদ্ধি, চুরুট ('বাপরে সে কি টান!') তো আছেই।

অথচ, নতুনদাদাকে খাতির করে ; সদ্যমৃত শিশুকে পরম যত্নে কবর দেয়—তার মুখের ওষুধের গন্ধ পায়, সে 'ভেইয়া' বললে বলে, 'আমাকে ভয় দেখিয়ো না ভাই, তাহলে অজ্ঞান হ'য়ে যাব।' আধিদৈবিক ব্যাপারে বিশ্বাসী, মৃতের আত্মার উপস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ, প্রাণের ডাক রাম নামে ভক্তিমান, শিশুর মতো কোমল, এবং ঐ বয়সেই যা তার পক্ষে জানা অসম্ভব তা সে সকলের অগোচরে, আঁধার রজনীতে, উত্তুঙ্গ জলোচ্ছ্বাসের ঘূর্ণাবর্ত্তের মাঝে থেকে জেনেছে। নিজের সাহসকে সহজেই শিষ্যের মধ্যেও সঞ্চারিত করেছে।

প্রকৃতির একান্ত নিজের, স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ প্রাণের জোয়ার নির্ভীক এই ইন্দ্রনাথ—অন্নদাদিদির অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেও হারিয়ে যায়। মনে মনে ইন্দ্রনাথ না হতে চায় কে? আমি তো চাই-ই।

আমার আয়তনের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের হয়তো পুরোপুরি মিল নেই, তবু শিশুকালের কথা মনে পড়লে ওর সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে পড়ি। আমার স্বরক্ষেপ ও সহজাত চরিত্রায়ণের কথা হয়তো সকলেই জানেন। কঠিন, দুর্জ্জেয়, নির্ভীক অথচ অন্তরে কোমল—এমন চরিত্র অভিনয় করেই মনে হয়, মঞ্চে ও পর্দায় আমি আপনাদের অনেককে আনন্দ দিতে পেরেছি। সুতরাং 'ইন্দ্রনাথের' প্রতি যে একটা আজন্ম টান আমার থাকবে এ আর বেশী কথা কি।

শাহজী (কানু বন্দ্যোপাধ্যায়)

বড়লোকের ঘর-জামাই। অন্নদার মতো স্ত্রী। কিন্তু তাতেও মন ওঠে না ঠিক যে কারণে লজ্জা ঢাকতে যুবতী বিধবাকে হত্যা করে ফেরার হতে হয় সেই কারণেই শাহজী পালিয়ে গিয়েছিলেন। নামটা ছদ্ম। অন্নদাকে দেখতে যখন সেই ছদ্মবেশে ফিরে এলেন, তখন একজন সাপুড়ে, মুখের ভাষা অন্য, পরণে গেরুয়া জামা-কাপড়। নেশাভাঙ বেশ রপ্ত হয়েছে; কেশে কেশে দম আটকে যায়; নগণ্য, করুণাশ্রয়ী, আত্ম-ধিক্কারে-জর্জরিত এক পুরুষের কঙ্কাল—অন্নদার স্বামী। মুসলমান।

অন্নদা ঘর ছাড়লেন—সহধর্মিণী কিনা! সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বেদনা, হতাশা ও রিক্ততাও ভাগাভাগি হয়ে গেল।

নিজে অন্নদার ওপর অত্যাচার করতেন বটে, কিন্তু অপরে কিছু বললে সইতে পারতেন না। ইন্দ্রের ওপর আক্রোশ শেষে হয়েছিল খানিকটা সেইজন্যেই।

নেশাই মৃত্যু ঘটালো। বিষাক্ত গোখরো সাপ মারলো ছোবল গলায়। সাপের হাতেই মরলেন কিন্তু দুজনে একসঙ্গে। আক্রোশে টেনে টেনে সাপটাকে এমন লম্বা করে দিলেন যে গোখরোও সে ধমক্ সামলাতে পারলো না।

মৃত্যুর পরে অন্নদা দিলেন উপহার। নীল ঠোঁটের ওপর তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসার সর্ব্বশেষ চুম্বন শাহজী জানতেও পারলেন না। এমনই হতভাগ্য!

শাহজী চরিত্রটি আমাকে খাপ খাবে বলেই ভালো লেগেছে। কবিগুরুর একটা কথা বিশেষ করে মনে পড়ে: যা পাবার তা লোকে অত্যন্ত করে চেয়ে নেবে, কিন্তু দেবার কথা উঠলেই ভেবে নেবে, বোধ হয় একটু কোথায় ভুল হয়েছিল। এমনি ধরণের কথাই যেন মনে হচ্ছে। 'শাহজী'র পাপ আর প্রায়শ্চিত্ত দুই-ই বাঙলা ছবিতে আজ বারো-চোদ্দ বছর করে চলেছি, ভাগ্যরূপী অন্নদাকে তো খুঁজে পাইনি। তবে 'শাহজী' সাজলে হয়তো খোদ অন্নদাকে পাবো—এই যা সান্ত্বনা!

অভয়ার স্বামী (অমর মল্লিক)

অভয়ার মতো মেয়ের স্বামী হয়েছে যে দেশ ছেড়ে বর্ম্মা মুলুকে আখের গুছতে এসেছে। পরণে তার সাহেবী পোষাক, কিন্তু এতো নোংরা আর দুর্গন্ধময় যে ভূতও তিষ্ঠতে পারে না। উঁচু উঁচু দাঁত, পুরু ঠোঁট আর গালময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি। দু'কশ বেয়ে পান গড়িয়ে পড়েছে, রস শুকিয়ে গিয়ে ঠোঁট দু'টোর ওপর এক কিম্ভূত-কিমাকার রঙ্ হয়ে কামড়ে বসে আছে। পাকা চোর, তাই অতিমাত্রায় কথা বলে, মিথ্যে বলে, মন গলিয়ে দেবার বিদ্যেটা বেশ আয়ত্ত করেছে। বর্ম্মাদেশের একটি মেয়েকে বিয়ে ক'রে, এক পাল ছেলে-পুলে নিয়ে দিব্যি দেশের কথা ভুলে এখানে গেড়ে বসে গেছে।

বর্ম্মাশেল থেকে বিতাড়িত, পরে একটা কাঠের ব্যবসায়ে চাকুরী নেয়—সেখান থেকেও চুরির দায়ে বরখাস্ত।

অভয়াকে ফিরিয়ে নেবার ছল করে হৃত চাকরী ফের বাগিয়ে নিলে, তারপর অভয়ার ওপর পশুর মতন নির্যাতন আরম্ভ করলে, অপবাদ দিলে—আরো কত কি।

আগে দেশে টাকা পাঠাতো কিন্তু নিজের হাল-চালের কোন খবরই দিত না। পরে তাও বন্ধ করে দেয়।

টিপিক্যাল স্বার্থপর, জোচ্চোর বাঙালী—যাদের জন্ম দিয়ে, কুলাঙ্গার করে, বিদেশ থেকে লজ্জা দেশে প্রায় আমদানী হয়ে থাকে।

আমেরিকান কয়েকটা বদমায়েস চরিত্রের সঙ্গে বেশ মিল আছে: এরা ইউনিভার্সাল বলেই হয়তো!

বর্ণে-গন্ধে Villain, পোড়-খাওয়া, মাঝ-বয়েসী এমন চরিত্র যে আমার খুব প্রিয়, এ আমার অভিনয়ের সঙ্গে যাঁরাই পরিচয় রেখেছেন তাঁরাই বলতে পারবেন। আর বানিয়ে মিথ্যে কথা বলা? এসো না দাদা, মল্লিক-মশায়ের সঙ্গে বাজী ধরে বলতে। দশ হাত পিছিয়ে যাবে। 'অভয়ার স্বামী'র যা ভাব-গতিক পড়ে দেখলুম তাতে এইটুকু বিশ্লেষণই তো ক্ষমতা অনুযায়ী করতে পেরেছি। Description কিরকম মিলে গেছে লক্ষ্য করেছ? বহুদিন বাদে এইরকম একটা মার্কামারা Villain Role দেখলুম। যদি কোনদিন সম্ভব হয় তো দেখো, মল্লিক-মশায় যা বলে, তা সুযোগ দিলে করতেও পারে, ফাঁকিটি পাবে না ভাই।

গহর (অসিতবরণ)

শ্রীকান্তের সহপাঠী। জাতিতে মুসলমান্। কিন্তু দরদী, মন-প্রাণ-খোলা অখ্যাত এক গ্রাম্য কবি সে। কৃত্তিবাসের চেয়ে জবর রামায়ণ লেখার বাসনা পোষণ করে; সীতা হরণের দৃশ্যে সে আকুল হয়ে ওঠে। অল্প-শিক্ষিত, কিন্তু প্রকৃত রসের সন্ধান সে পেয়েছে। কমল-লতায় আপনাকে জড়িয়ে ফেলেছে, প্রিয় ভৃত্য নবীনের যথেষ্ট বীতরাগের কারণ হয়েছে, মঠ-কীর্ত্তন করেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। ট্রাজেডী তার যে, সে ভালো-মানুষ। কী চাইলে, পেলে কী, কতখানি দিলে কিছুরই হিসেব-নিকেশ রাখলে না। এক গোছা নোট রেখে গেল শুধু কমললতার জন্যে, শ্রীকান্তের জিম্মায়। আর এক ফোঁটা চোখের জল।

অতি দয়ালু এবং তদধিক বিশ্বাসী। চক্রবর্ত্তী মশাই—এক বিষয়ী ব্যক্তি, গহরের দয়ার দান এবং বিশ্বাসের কড়ির উপযুক্ত মর্যাদাই রাখলেন। গহর কোন-দিন এসবে ভ্রূক্ষেপও করে নি। শ্রীকান্তও স্বীকার করেছে, এমন বাপ-মা যার, বিশেষ করে মা, সে অমন হবে না তো হবে কি?

কবির নীরব ভালোবাসার মধ্যেই সার্থকতা; দুঃখ এই যে, তার অর্থ এবং প্রযত্ন মঠাধীশরা সানন্দে উপভোগ করলেন কিন্তু তার পুণ্যময় প্রেমের মর্য্যাদা দিতে পারলেন না। বড় গোঁসাই ব্যথিত হলেন এতে। কমললতা মঠ ছাড়লো—গহর তখন আর-এক পৃথিবীর পথে বহু বহু দূর এগিয়ে গিয়েছে। হায়, গহর! আল্লার দরবারে তোমার কী বিচার তোলা আছে কে জানে!

সমস্ত বইখানার ভেতর এর চেয়ে আর্টিস্টিক চরিত্র আমার আর কোনটা লাগে নি। কোট-প্যাণ্ট-সার্ট আর অযথা গান গেয়ে গেয়ে যেন পরিশ্রান্ত হয়ে গেছি। এমনি একটা আত্মভোলা, নিরহংকার গ্রাম্য-কবির পার্ট করার জন্যে অন্তর খুব সায় দিচ্ছে। আর তাছাড়া, আপনারা তো দেখেছেন অনেক ছবিতেই, ভালো ছেলে অথবা ভালো-মানুষ বনে যেতে আমার কতো কম সময় লাগে! সবচেয়ে বড় কথা, একটা জাত-বিয়োগান্ত (মানে pseudo নয়) চরিত্র এখন আমার চাই-ই।

নতুনদাদা (বিকাশ রায়)

একটি 'লবেজান' Snob Role করিবার ইচ্ছা আমার অনেকদিন হইতে আছে। character acting করিয়া করিয়া আমার এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, নিজেকে অত্যন্ত Serious ছাড়া কল্পনা করা নিজের পক্ষেই দুষ্কর হইয়া গিয়াছে। অথচ, আমি যে Serio-comic role কতো দক্ষতার সহিত করিতে পরি তাহার খোঁজ বোধ করি আমার গৃহিণী ছাড়া আর কেহই রাখেন (কথাটা তাঁর কাণে না পৌঁছাইলেই ভালো হয়) না। সত্যসত্যই "নতুনদাদার" চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে গিয়া যেন একটি নূতন উদ্যম পাইলাম। এখন একটা departure-এর জন্য প্রাণটা ছটফট করিতেছে—আপনারা বিশ্বাস করিবেন কিনা জানিনা। কিন্তু, বিশ্বাস করুন!

মনে হইতেছে, ইন্দ্রদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া পড়িয়াছি। ইন্দ্রের মাসীমা, অর্থাৎ আমার মা, মানে নতুন-দা'র গর্ভধারিণী সঙ্গে আসিয়াছেন। আমার ধারণা, দর্জি-পাড়া লণ্ডনের একটি রাজ-সংস্করণ। আমার বেশভূষা তাই অতীব জমকালো। এণ্ট্রান্স পাশ করিয়াছি, ভবি-ষ্যতে ডেপুটি হইতে হইবে। সুতরাং আগে হইতে তালিমের প্রয়োজন আছে কি না? আমার স্থির বিশ্বাস আমার চেয়ে ভালো গান আর কেহ গাইতে পারে না; হারমোনিয়াম আমি না ধরিলে কোথাওকার কোন যাত্রা আরম্ভই হইতে পারে না; আমার সাহস আর যে কোন দশটা লোকের চেয়ে বেশী; আমি সৌখীন, মুখে বার্ডসাই তো আছেই। খোট্টা এবং খোট্টা দেশের লোকগুলার প্রতি স্বভাবতঃই আমার একটা অনুকম্পা, মানে অসহ্য বীতরাগ আছে। উহারা আদৌ মনুষ্যপদবাচ্য নহে। এই আমার সংস্কার। আমাকে সহরে দেখিয়া ইন্দ্ররা একটু চমকাইয়াছে। অতএব তাহাদের বশ্যতাকে কাজে লাগানোই উচিত।

রাত্রে তৌ বাহির হওয়া গেল। ওপারে "যাত্রায়"

আমার ডাক পড়িয়াছে। ইন্দ্র ও তাহার এক বন্ধু, কান্ত না-কি, আমাকে নৌকায় করিয়া লইয়া চলিয়াছে। যেমন নৌকার ছিরি, তেমনই ছিরি তাহাদের পোষাকের। কান্তের গায়ের তেলচিটা র‍্যাপারখানা দেখিয়া তো গা ঘিন্ ঘিন্ করিতেছে—ওখানা পাতিয়া বসা চলে। আমার আরাম বিধানের জন্য এই খোট্টাদেশের গেঁয়োভূতগুলা কতো তৎপর হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কিছুই করিতে পারিতেছে না। (এইখানে বলিয়া রাখা ভাল, এখানে ষ্টুডিয়োর অনেক বৃহৎ বৃহৎ তারকারা এই "নতুনদাদার" ভূমিকাটি এতো ভালো করেন যে, খামখা rehearsal-এর প্রয়োজন হয় না।)

কখনও পাল তুলিয়া দেয়, কখনও দাঁড় বাহিতে থাকে আবার কখনও গুণ্ টানে—কিন্তু সময় যে উৎরাইয়া যাইতেছে সেদিকে মূর্খদের খেয়াল নাই। আমি তো দিব্য কম্ফর্টার, ওভারকোট, পায়ে পম্পসু ও গরম মোজা এবং দস্তানায় হাত ঢাকিয়া বসিয়া আছি, কিন্তু আমার ব্যস্ততা কি উহারা লক্ষ্য করিতেছে? আমাকে বাধ্য হইয়াই কতকগুলা অপ্রীতিকর কথা বলিতে হইতেছে। কি করি বলুন!

হঠাৎ আমাকে এক বালির চরে নামাইয়া উহারা কোথায় যেন অদৃশ্য হইল। আলো-আঁধারির রাত। কতক্ষণ একা থাকা যায়? 'ঠুন ঠুন পেয়ালা' গানটিও কেন যেন মনে আসিল। গানে এত বিপদ আছে এই অসভ্য দেশে কে-ই বা জানিত। কতকগুলা কুকুরের তাড়নায় বিরক্ত হইয়া পাশের এক খালে সবশুদ্ধ ডুবাইয়া গলাটি বাহির করিয়া বসিয়া রহিলাম। পরে কান্তের র‍্যাপারখানি পরিয়া বাড়ী পৌছাইলাম। একটা অসভ্য জায়গায় বেড়াইতে আসার বদ-ইচ্ছা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়া গেল!

মন্মথ (শম্ভু মিত্র)

'বাপ্, এমন বিদঘুটে ভুরু লোকের হতে পারে আগে জানতুম না'—এই গোছের পাকা বদমাস টাইপের একজন শিলেটী লোক। ঘোরতর পাপ করে অনুগত ভাইপোর ঘাড়ে দিব্যি চাপিয়ে দিলে; রক্ষকের অগোচরে তাঁর সবচেয়ে বড়ো সর্ব্বনাশ সাধন করলে; বিয়ে করবার আশ্বাস দিয়ে একটা অযৌক্তিক দাঁও কষ্‌লে—টাকার হিসেবে; দিব্যি বেরিয়েও গেল বিপদ থেকে।

তবু কামনার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে অন্তরে। কমললতার পেছু তাই ছাড়ে নি। সুবিধে পেলেই শ্লথ মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করতে চায়—পেতে চায় অভীপ্সিতাকে; তাকে কুলছাড়া করিয়েও ক্ষুধা মেটেনি পাষণ্ডের। সুযোগ ঘটলেই তার অপযশ গায়; পূর্ব্ব-ইতিহাস উন্মুক্ত করে দেখাতে চায় ভদ্রলোকদের; গাছ-পালার আড়াল থেকে উষাকে দেখে, আর পুরু ঠোঁটটা চেটে নেয়।

চরিত্র ছোট, কিন্তু ঘটনা পারম্পর্য্যের ব্যাপ্তি ঘটিয়েছে অনেক দূর। যতীনকে টেনে এনেছে। একটা ফুলের মতো নিষ্পাপ শিশুর মৃত্যুর কারণ ঘটিয়েছে।

এসব চরিত্রের যথাযথ রূপ দিতে পারলে এবং চিত্রনাট্যকার মশাই সদয় হ'লে, এর অভিনয় দেখিয়ে মানবসমাজের প্রভূত কল্যাণ-সাধন করা যায় হয়তো ভীষণভাবে উত্তেজিত ক'রে তুলতেও পারা যায়।

অভিনয়ের আয়তন অল্প, সংযত অনুকার্য্যের দ্বারা চরিত্রটিকে মূর্ত্ত করে তুলে ধরতে হবে দর্শকের সামনে—তারপর শেষপর্য্যন্ত তাকে হয়তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু বাড়ী যাবার পথেও এক একবার চিন্তা করে দর্শক শিল্পকলার বোধ খানিকটা ঝালিয়ে নেবেন আপনার অন্তরের মধ্যে—প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এর মধ্য দিয়েই হয়েছে, যার জন্যে এই "কালো জোড়া ভুরুর" চরিত্রটিকেই আমি বেছে নিয়েছি সর্ব্বাগ্রে। ছাঁচে-ঢালা টাইপ চোখে ভেসে ওঠার কথা শম্ভু মিত্তিরের কখনও মনেও আসে নি। তবু অনেক টাইপের আড়াল থেকে দর্শকের মনের কোণায় আমি উঁকি দিয়ে দেখে যাবো, নাট্যকলার সাধনায় এই আমার ছোট্ট লক্ষ্য। এই ব্রতেই আমি ব্রতী।

বজ্রানন্দ (উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়)

যুবক। ঋজু দেহ। বলিষ্ঠ চেহারা। 'নারায়ণ' বলে এসে দাঁড়ালো। রাজলক্ষ্মী তখন গঙ্গামাটি যাবার পথে

শ্রীকান্তের আহার ঠিক করে দিচ্ছে। দেবে-দ্বিজে অসাধারণ ভক্তি বলেই বজ্রানন্দ (ওরফে "আনন্দ") 'লক্ষ্মীর' আপন জন হয়ে গেল—সেবায়, যত্নে, হয়ে গেল যেন ছোট ভাইটি। "এই রকম বোনেদের দর্শন পাবার জন্যেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হয়" বজ্রানন্দের।

ছিন্ন-ভিন্ন গেরুয়া ধুতি-পাঞ্জাবী, পায়ে ছেঁড়া জুতো। দেখে বুঝবার উপায় নেই যে, এ একজন বড়ঘরের ছেলে, ডাক্তারী পাশ করে জনগণের সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করেছে। ভারী বাক্সটা রাজলক্ষ্মীদের গোযানে শওয়ার করে দিয়ে কতো আলোচনাই না করলে—পায়ে হেঁটে-হেঁটে যেতে। 'লক্ষ্মী'র নতুন করে চোখ খুললো।

আহারে বিলক্ষণ রুচিসম্পন্ন, স্পষ্টবক্তা, মায়াবন্ধনহীন, আদর্শে বিশ্বাসী, জ্ঞানী ও হাতে-কলমে সেবাপরায়ণ ছেলে —এই বাঙলা দেশেরই ধন।

যেমন গ্রাম গড়ার কাজে, তেমনই 'লক্ষ্মী'র প্রসাদে নবরীতিতে ইস্কুল-হাসপাতাল-বাড়ী প্রভৃতি তৈরী করায়, উদ্যোগ ও কর্ম্মে সে নিপুণ : অথচ, নিজের জন্য সে কিছুই রাখে নি!

আমাকে আপনারা ভারী বিপদে ফেললেন দেখতে পাচ্ছি। এ যেন বাঁশ বনে ডোম-কাণা হবার অবস্থা! কোন্‌টা পছন্দ হোল আর কোন্‌টা যে হোল না, ভাবতে ভাবতেই দু'রাত কেটে গেল। তারপর এই "বজ্রানন্দ"কে সবচেয়ে আপন বলে মনে হোল। "বসু পরিবার" নিশ্চয় দেখেছেন? ঐ ভাব নিয়েই আগাগোড়া চরিত্রটা analysis করে ফেললুম! কেন জানি না, আজকাল Stevenson-এর philosophyটা খুব আমার প্রতি affectionate বলে মনে হচ্ছে, অবশ্য, sofar as film-acting is concerned.

ছিনাথ বহুরূপী (ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়) [ছোট]

আপাতঃদৃষ্টিতে হাসির খোরাক জোগালেও, ভেতরে ভেতরে অতি করুণ রসে সিক্ত চরিত্র।

পেটের দায়ে বছরের একটি বিশেষ সময়ে নানান সাজে সেজে এসে পয়সাটা-সিধেটা বড়লোকের ঘর থেকে আদায় করে যায়।

বিপদ ঘটবার আগের দিন নারদ সেজে এসে প্রচুর আনন্দ দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাঘের সাজ সাজতে গিয়েই দেখা দিল যতো বিপদ। ব্যাপারটা এতোদূর গড়াতে পারে কল্পনাই করে নি। কিন্তু বাঘ দেখে দেউড়ির দারোয়ান থেকে কর্ত্তাবাবু স্বয়ং এমনকি পড়ার ঘরের ছেলেরা পর্য্যন্ত এ কেলেঙ্কারী করতে পারে, এটা কি ভেবেছিল? আর ভাবলেই বা অমন সাজ সে কেন করতে যাবে?

ইন্দ্রনাথ এসে সে-যাত্রা সন্দেহ না ভাঙালে কি যে হোত কে জানে? তাই গাছের ধারে (আড়ালে) দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। তারপর শাস্তির বহর, ধড়ম পেটা, লেজ কেটে নেওয়া প্রভৃতির কথা শুনে বেচারা একেবারে কেঁদে ফেললে। হাতজোড় করে বললে, দোহাই বাবু আমায় মাফ করবেন।

আমার মনে হয় আমায় খুব Suit করবে এই পার্টটা। চিত্রে আসার আগে "বহুরূপীই" তো ছিলাম মশাই! অবশ্য সাজ না করেই আনন্দ দিতুম, বন্ধু-বান্ধবদের। তারপর কি কুক্ষণে ছবিতে এসে আপনাদের সবাইকেই নাচাচ্ছি, আর, কোন্ দিক থেকে আমাকে নাচতে হচ্ছে—তা অন্তর্যামীই জানেন! আমার সদাই ভয়, কোন্ দিন না শেষে সাজ খুলে এসে আপনাদের সবাইকার স্নেহ-দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে বলতে হয় : অ মশয়, শুনত্যাছেন! অমি ভানু, ভানু—ছিনাথ নই, ঘাবরাবার কারণ নাই, বোঝল্যান?

মনোহর চক্রবর্ত্তী (তুলসী চক্রবর্ত্তী)

আধা-বয়েসী ভদ্রলোক। গোপনে বন্ধকী-তমসুকিয়ানা চালান। বেশ আত্মতৃপ্ত। সুতরাং, অপরকে উপদেশ দেবার বেশ খানিকটা অধিকার আছে বৈকি!

শ্রীকান্তকে উপযুক্ত পাত্র ঠাউরে সংসারে কেমন করে চলা উচিত, কীভাবে উত্তরপুরুষের জন্য সঞ্চয় করে রেখে যাওয়া উচিত, অল্প খরচ করে কী-করে দিন গুজরাণ করতে হয়—[illegible] ব্যাপারে লম্বা-লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে উচিত-কর্ম্মাদি শিখি[illegible]লেন!

কিন্তু, নিজের অতিবুদ্ধিই শেষে গলার দড়ি হয়ে দেখা দিল একদিন। বর্ষায় দুরন্ত প্লেগের সময় একটা বেজায় সস্তা বাড়ীভাড়া করে রোগ থেকে বাঁচতে গিয়ে "স্বপ্ন দেখতে দেখতে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে কুঁচকী ফুলিয়ে তুললেন।" তারপর পাশের ঘরে দু'টো ঘাড়াঘাড়ি মড়া নিয়ে, সামনে আর একটা আধ-মরা লোককে সামলাতে সামলাতে শ্রীকান্তর রাত কাটলো ; প্রাজ্ঞ মনোহরও শেষ হলেন।

মরবার আগে তখনও সিন্দুকের কথা, চাবির কথা, দেশে নাতি-পুতির কথা চিন্তা করছেন। একেই বলে জ্ঞান !

এ-ও একটা বিশেষ টাইপ। খোজাপ্রহরী-মার্কা যখেদের ওপর বেশ একটা তীব্র শ্লেষের আভাষ পাওয়া যায় প্রাজ্ঞ চক্রবর্ত্তীর ভেতর দিয়ে। তাই নয় কি ?

ঝোলে-ঝালে-অম্বলে-ট'কের কথা উঠলেই তুলসী চক্কোত্তির অমনি ডাক পড়ে, জানি ভায়া! সেই অপরেশ মুখুজ্যের আমল থেকে যাত্রা, মঞ্চ আর এই হাল্-ফিল বায়োস্কোপ—অনেক কিছুই দেখলুম। প্রথমে ডুয়েট নাচতুম আর সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গ করে গান! তাই ভেড়া বলো ভেড়া, বাঘ বলো বাঘ, শেয়াল বলো শেয়াল, তুলসী চক্কোত্তি ঠিক আছে—শুধু মেক-আপ বদলানোর সময়টুকু দিয়ো। "মনোহর" দেখেছিল অনেক, উপদেশও দিতো, কিন্তু নিজের পয়ে কিছুই উঠল না। তুলসী চক্কোত্তির "মনোহর" হয়ে দেখতে তাই বাসনা রইলো!

মেজদা (শ্যাম লাহা)

বয়সের অধিক গাম্ভীর্য্য সঞ্চয় করিয়াছেন। শাসন-দমনাদির ব্যাপারে আপনার রাজ্যের সর্বেসর্বা। ছোটদের কঠোর ডিসিপ্লিনের মধ্য দিয়া গড়িয়া তুলিবার ভার আপনা হইতেই নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন। সুবিধা পাইলেই জিওগ্রাফীর পড়া ধরা ও সঙ্গে সঙ্গে সন্নিকটবর্ত্তী ঝাউ-গাছের ছড়ির ব্যবস্থা হুকুমমতো বরাদ্দ।

নিজে বারকয়েক এণ্ট্রান্স ফেল করিয়া অধিকতর মনঃসন্নিবেশ করিয়াছেন পাশের পড়ায়। গ্রীষ্মের দিনে কয়েক মাইল গ্রীষ্মে হাঁটিয়া তাস্কে [illegible] কিয়া আর এবং শীতকালে নিজের হাত-পা লেপের মধ্যে ঢুকাইয়া বইয়ের পাতা উল্টাইবার জন্য সেবকরা সব সময়েই প্রস্তুত। "থুথু ফেলা", "নাকঝাড়া", "বাইরে যাওয়া" ইত্যাদির টিকিট লিখিয়া, কাগজ-আঁটা-কাঁচি-খাতা প্রভৃতি সামলাইয়া বেশ নিজের রাজ্যটি বাগাইয়া বসিয়া আছেন। সপ্তাহান্তে টাইম-মাপিয়া, ফাঁকি দেওয়ার জন্য শাস্তির বিধিগুলি নিজের পেনাল কোড অনুসারে নিজেই সারেন।

অথচ ছিনাথ বহুরূপীর সাজে ইনিই একদিন সেজ উল্টাইয়া গোঁ গোঁ করিয়া মূর্চ্ছা গেলেন ; আবার পিসিমার হাতে একদিন সোজাসুজি ধরা পড়িয়া শ্রীকান্তকে কেন, আর সবাইকেও, শাসন করিবার মিথ্যা বিড়ম্বনাটুকু হারাইয়া ফেলিলেন।

একটি গ্রাফিক ষ্টাডি। এ-চরিত্র অভিনয় করায় আনন্দ আছে। যথাযথরূপ দিতে পারিলে, দর্শকে হয়তো সারা জীবনেও ভোলে না।

সত্য কথা বলিতে কি জানেন, আমি একটু discipline-এর ভক্ত। উল্লুক হইতে বাঘ পর্যন্ত হেন জন্তু-জানোয়ার নাই যা বাড়ীতে পোষ মানাই নাই, discipline ভঙ্গ করিলেই একেবারে zoo-garden-এর কর্তাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। বহুদিন আগে একটা বাঘের বাচ্চা এক খাব্লা মাংস হাতের উপর হইতে খাইয়া লইয়াছিল। অনুগতজাতীয়দের এ অন্যায় কি করিয়া বরদাস্ত করি বলুন, এঁ্যা! আসল কথা কি জানেন, situational fun-এর চেয়ে characteristic paradox-এই আমি বেশী প্রাণবন্ত হই বলিয়া "মেজদা"কে আমার এতো ভাল লাগিয়াছে।

রতন (হরিমোহন বসু)

আদর্শ ভৃত্য। এরা পয়সার বিনিময়ে বশ্যতা বিনিয়োগ করতে আসে না, আসে প্রভুর সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে, প্রভুর মঙ্গল চিন্তাতেই জীবনটা শেষ করে দিতে।

জাতিতে নাপিত। কাজেই অতি চতুর। বোকার ভাণ করলেও এক লহমায় সব কিছু বুঝে নিয়ে কর্তব্যকর্ম

করার বুদ্ধি ও সৎসাহস রাখে। আসলে রাজলক্ষ্মীর চাকর, কিন্তু বশ হয়ে গেল শ্রীকান্তের।

কখন তামাক দিতে হবে, কখন চা দিতে হবে, কোন্ ঘরে বিছানার বন্দোবস্ত করতে হবে—কখন খেতে যাবার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, এসব এদের জন্মগত জ্ঞান। এই জ্ঞান দিয়ে দু'টি মিলনোন্মুখ সত্তার মাঝখানে এরা সুন্দর সেতু রচনা করে দেয়, জীবনের ফাঁক-অংশটুকু ভরাট করে দিতে সাহায্য করে। গল্প এবং নাটককেও একটা মসৃণ-মোলায়েম গতির মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে প্রভূত সাহায্য তো করেই।

কালিদাস থেকে আরম্ভ করে অধুনাতম লেখকরা নায়ক ও নায়িকার সাযুজ্য সংরক্ষণে এইসব দ্যুতিদের ব্যবহার সঠিক জানেন; শরৎচন্দ্রও যে কিছু কম বুঝতেন না, রতনের চরিত্র থেকেই তার আর-একটা, বহু উদাহরণের মধ্যে অন্যতম হিসেবে, দেখতে পাই।

বহুদিন আগে একটা করবার মতো চরিত্র পেয়েছিলুম "ভুলি নাই" ছবিতে। আপনারা একটু বোধহয় প্রশংসাও করেছিলেন। বুঝলেন, একবার সড়ক ধরিয়ে দিতে পারলে, কোন অভিনেতার পক্ষেই আর হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হয় না। এমন পাকা সড়কের পার্টই মনে হচ্ছে "রতন"। ঐ সড়কের পাশে-পাশেই অভিনয়-জীবন শুরু করি; আমার স্থির বিশ্বাস, চতুর নাপতে রতনের সেবাপরায়ণ বিশ্বস্ততার মধ্যে ঢুকে পড়তে পারলে, সড়কের ওপর দিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যেতেও খুব বিলম্ব হবে না।

কবি চন্দ্রাবতী



[আজ থেকে আড়াই শো বছর আগে। মুসলমান আমলের শেষভাগ। সারা ভারতে তখন চলেছে এক বিরাট রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা। সে ঝঞ্ঝা ও বিক্ষুব্ধ আলোড়নের কিছুটা এসে লাগে বাংলার শ্যামাঞ্চলে, কিছু বা লাগেনা। সুদূর পল্লীর নির্জ্জনতায় বাংলার সমাজ-জীবন তখন মানুষকে কেন্দ্র ক'রে প্রবহমান। তাই সেখানে বড় একটা ধাক্কা লাগেনি রাষ্ট্রিক কাঠামোর বহির্ভাঙ্গনের। কিন্তু তবু তার অবশ্যম্ভাবী ফলের হাত থেকে বাংলাও রেহাই পায়নি। তাই দেখা যায় সে সময় বাংলার রাজনৈতিক চেতনা বিকাশলাভ করেছিল জনগণের মধ্য দিয়ে, রাষ্ট্রিক কাঠামোর ভিত্তি টলিয়ে—বহিরঙ্গনের আভরণ ছুঁয়ে নয়। বাংলার সেই গণ-অভ্যুদয়ের মূলে আজ তাই পল্লীর দান অনস্বীকার্য্য; পল্লীর শিল্প, কাব্য, সঙ্গীত—আজও তাই বাংলার স্বকীয় মৌলিকতা রক্ষা ক'রে সারা ভারতের জন-জাগরণের প্রকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে গৃহীত হ'য়ে আসছে।

এ কাহিনী তারই একটি সাক্ষ্য। এই কাব্যসঙ্গীতময়, প্রাণপ্রাচুর্য্যে ভরা বাংলার কবি চন্দ্রাবতীর কাব্যসাধনা ও ঘটনাপ্রধান জীবনালেখ্যকে চিত্রায়িত করছেন উদয়ন পিক্‌চার্স। আশা করা যায় এই চিত্রের প্রযোজক এবং নবীন উৎসাহী কর্ম্মীদের নিষ্ঠা ও কর্ম্মকুশলতাগুণে এই জীবনালেখ্যর চিত্ররূপ মহিমা ও মাধুর্য্যে যোগ্য রূপায়ণ হ'য়ে উঠবে এই অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যময় কবি জীবনের, তাঁর কবিমানস ও সৃষ্টিপ্রেরণার।

—'চিত্রবাণী'-সম্পাদক]



ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাটওয়ারী গ্রাম। ফুলেশ্বরী নদীর ধারে এই গ্রামখানি দেখলে সত্যিই মনে হয় যেন কোন এক নিপুণ শিল্পীর পটে আঁকা ছবি। আর সেই পটের মতই পাটওয়ারীর জীবনযাত্রার পটভূমি! সে আরও বিচিত্র—বিচিত্র তার জামদানী জাজিমের খোল: রূপে রসে, বর্ণে গন্ধে, ফুলে ফলে, ধনে ধান্যে, কাব্যে ছড়ায় হাজারো নক্সা আঁকা। গোটা বাংলা দেশ যেন পূর্ব্ববঙ্গের ছায়া-ঘেরা ছোট্ট এই পল্লীটির মাঝে খুঁজে পেয়েছিল তার প্রাণ, শুনেছিল তার মরমের গান—সে গান আজও বেঁচে আছে—বেঁচে আছে নব পরিণীতার বাসরে, ঘেঁটু-মনসার ব্রত উদ্‌যাপনে—বিলে-নদীতে, মাঠে-হাটে। আর তার রচয়িতা? সোনার আখরে আজও তাঁর নাম সমুজ্জ্বল লোক-সাহিত্যের ইতিহাসে। বাংলার কবি—অবিস্মরণীয় বংশীদাস।

ছোট্ট ছিমছাম ভিটেখানি। ঝকমকে তকতকে নিকোনো উঠোন। ছড়িয়ে-পড়া সিঁদুর খুঁটে তুলতে কষ্ট হয় না একটুও। বেড়ার ধার ঘেঁসে যেখানে রাংচিতের লতা ঘন হয়ে এসেছে খুব, ঠিক তার পাশেই তুলসীমঞ্চ। ওপর থেকে ঝোলানো ফুটো ঘটে জলের ঝারি। সে জল বাঞ্ছিত। আর অবাঞ্ছিত জল রুখতে খড়ই তো যথেষ্ট। তাল সনে ছাওয়া দো-চালা দু'খানি ঘর। মাটির দেওয়াল—চিত্রিত গ্রাম্য পটুয়ার আঁকা দু'চারটি পটে: কোথাও বর চলেছে পাল্‌কী চেপে, কোথাও বা মনসার মূর্ত্তি আঁকা। তাতে আছে প্রাণ, আছে প্রভা।

ভিটেখানার দিকে একনজর চাইলেই ছবির মতন চোখে পড়ে মালিকের মন ও জীবন। বংশীদাসের মনটা যেন উপ্‌ছে পড়েছে ভিটেমাটির খুঁটি-নাটিতে। সরল অনাড়ম্বর জীবন!

ঋজু ও ছিপছিপে গড়নের এই বংশীদাস। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। বলিষ্ঠ লোমশ বুকের খাঁজে তার গাবের আঠায় মাজা ধবধবে পৈতে। তরতরে নাকে ও চওড়া কপালে সুনিপুণ রসকলির ছাপ। ভক্তির বিজ্ঞাপন নয়, ভক্তের অন্তরের আকুতি ঠাঁই পেয়েছে ঐভাবে।

জাতে ব্রাহ্মণ হলেও বংশীদাস কিন্তু পুরোহিত নয়। বিদেহী দেবতার পূজো ছেড়ে দেহী মানুষকেই সে বরণ করেছে। ভাসান গান গেয়ে রুজি-রোজগারেই চলে তার সংসার। কবি গানের ছড়া লিখে ভাসানের গান বেঁধে রামায়ণের কাব্য রচনা করেই তার দিন কাটে। শুধু সৃষ্টিতেই শেষ নয়, সুরের কাঠামোয় কণ্ঠের মাধুর্য্যে তাকে রূপ দিতে না পারলে বংশীদাসের মন খুঁতখুঁতিয়ে ওঠে। তাইতো সে নিজেই নিজের গানের গায়ক। তার মতন



জয়ানন্দের ভূমিকা রূপায়িত করছেন অসিতবরণ আর কবি চন্দ্রাবতীরূপে রয়েছেন অনুভা গুপ্তা

ময়মী কবিয়াল, সুরেলা ভাসানিয়া নাকি ও তল্লাটে আর নেই। তার জুড়ি মেলাই ভার। তাইতো বংশীদাসের এত নাম-ডাক। নবাব জমিদারের দরবার থেকে সুরু করে বাউল পটুয়াদের আখড়া অবধি বংশীর আমন্ত্রণ, আসেনা এমন কোন গেরস্ত নেই সারা ময়মনসিংহে। এই তো সেদিন ধনেখালির মালীরা এসেছিল বংশীকে ডাকতে। বিয়ের উৎসবে তাকে ভাসানের আসর দিতে হবে। বংশী প্রথমটা একটু নিমরাজি হয়, স্থানটার দূরত্ব মনে মনে হিসেব ক'রে। কিন্তু অন্নদা মালী একেবারে নাছোড়বান্দা। গলায় কাপড় দিয়ে বারেবারে মিনতি করে। অগত্যা বংশী তার অছিলার মোড় ঘুরিয়ে বলে 'কি করি বল্? দু'দিনের পথ। আমার চন্দ্রা-মা'কে একলা ফেলে কি ক'রে যাই বল্?'

কথাটা চন্দ্রার কানে যায়। অসহায় অপরাজিতার লতাটাকে আর রাংচিতের বেড়ার ওপর তোলা হয় না। ছুটে আসে তক্ষুনি। অন্নদা-দের আঙুল নেড়ে বলে—'বাবার কথা তোমরা একটুও বিশ্বাস কোরো না। আমি তো একলাই থাকি, ভয় কিসের! দিনের বেলা জয়ানন্দের সঙ্গে ছড়া কেটে আর খেলে সময় থাকলে তো ভয় দেখবো! আর রাতের কথা? তখন তো খুড়িমাই আছেন, ভয় আর তা'হলে দেখবো কখন?'

বংশীদাসের আর ওজর চলে না। চন্দ্রা ছুটে গিয়ে ঘর থেকে নামাবলী আর কাপড়ের ঝোলা এনে দেয়। হাসতে হাসতে কাঁধের ওপর নামাবলী ফেলে বংশী বেরিয়ে পড়ে দলবল নিয়ে। চন্দ্রা চেয়ে থাকে সেইদিকে যতক্ষণ দেখা যায়। তারপর এসে মাটি থেকে অপরাজিতাটাকে তুলে দেয় বেড়ার ওপরে।

এমনি করেই দিন কাটে কিশোরী চন্দ্রাবতীর। পাটওয়ারীর শ্যামলিমায় বংশীর স্নেহধারায় সে যেন খুঁজে পায় তার মনের সহজ সুরটিকে। তন্বী দেহের সুশ্রী গঠনের মাঝে বাপের আদরেই গড়ে ওঠে তার মন। তাই সে ভালোবাসে ভাসানকে, ভক্তি-ভরে রামায়ণীকে, শ্রদ্ধা করে কবিয়ালদের।

খুব ছোটবেলায় চন্দ্রা মাকে হারায় [illegible]য়ের স্মৃতি তার মনের কোণে হারিয়েও হারায়নি আজো। সেই আবছা স্মৃতিকে ঘনিষ্ঠ ক'রে রাখার জন্যেই বুঝিবা সে অত অন্তরঙ্গভাবে ভালোবেসেছে কবিতাকে। তার ওপর শিশুকাল থেকেই বংশীর সান্নিধ্যে থেকে চন্দ্রার মনে কবিতার প্রভাব প্রবল হ'য়ে ওঠে। এর জন্যে ওকে কষ্ট করতে হয়না একটুও। এ যেন ওর সহজাত। মাঝে মাঝে চন্দ্রা পরখ করে তার কিশোর কবিমনের সৃজনী-প্রতিভাকে। কাজের ফাঁকে কখন একসময় তাকের ওপর থেকে পেড়ে নেয় বংশীর তুলোট কাগজের নতুন কবিগানের খাতাখানা, হয়তো ভাসানের, নয়তো বা রামায়ণের। সবেতেই চন্দ্রার অদ্ভুত দখল। টুপ ক'রে বংশীর অসমাপ্ত পদ পূরণ ক'রে রাখে। বংশীও অবাক্। কাঁচা হাতের লেখা দেখে ধ'রে ফেলে। আনন্দে অধীর হ'য়ে ওঠে। বলে, 'তুই মা বড় হলে কবি হবি!'

চন্দ্রাবতীর সে কবিখ্যাতি এখনও পাটওয়ারীতে ছড়িয়ে না পড়লেও এরই মধ্যে জয়ানন্দের মনের মণিকোঠায় পৌঁছে গেছে। তাই সে যখন বংশীকে রওনা ক'রে ওদের বাড়ীতে এসে হাজির হয় তখন জয়ানন্দ যেন একটু বিদ্রূপের সুরেই বলে,

'কবি চন্দ্রা আইলো ক্যান এ বিথানে।'

চন্দ্রা অমনি গম্ভীর হ'য়ে গ্রাম্য সুরে জুড়ে দেয়,

'জয়ের আশায় মন উজানে গো টানে'।

এর পর আর চলে না কবির লড়াই। হাসির তোড়ে খুলে যায় চন্দ্রার কপট গাম্ভীর্য্যের মুখোশ। জয়ানন্দও যোগ দেয় তাতে সহজ মনের টানে।

জয়ানন্দ চন্দ্রার প্রতিবেশী, সহপাঠী, খেলার সাথী। পদ্ম-দীঘির নির্জন আবহাওয়ায় বসে ছড়া কাটে, পদ্য লেখে। সন্ধ্যার অন্ধকারে বংশীকে ঘিরে উঠোনে ব'সে ব'সে গল্প শোনে: নানান গল্প। কবে, কোথায়, কোন্ আসরে বংশী জয়ী হ'য়েছিল, কে কে গেয়েছিল, কে কি বলেছিল এমনি ধারা অজস্র গল্প।

জয়ানন্দের ভারী ভালো লাগে এই বংশীকে। আর চন্দ্রাকে? সে তো খুব ছোটবেলা থেকেই মনে করেছে নিজের ব'লে! তাছাড়া তার কাছেই তো জয়ের পদ্য

লেখার হাতে খড়ি। পদ্মদীঘির পাড়ে যেদিন সে প্রথম একটা ছড়া লিখেছিল সে-কথা আজও তার মনে পড়ে। আর আজো অলক্ষ্যে একবার কেমন যেন তার মুখখানা রাঙা হ'য়ে ওঠে,—যত না লজ্জায়, তত ভাল লাগার আতিশয্যে। ছড়া শুনে চন্দ্রা বলেছিল ঠাট্টা ক'রে,—'ছিঃ, জয়, তোমার ছন্দ-জ্ঞান নেই একটুও! চন্দ্রাবতীর সঙ্গে কি কখনও ভোলা মহেশ্বর মেলে?'

'তবে কিসের সঙ্গে মেলে?' একটুও না ভেবে বোকার মতো প্রশ্ন করেছিল জয়। তার জবাব আজও তার স্পষ্ট মনে পড়ে। মনে পড়ে সেদিন সে দেখেছিল চন্দ্রার মনের মুকুরে তার মুখের ছাপ, কত স্বচ্ছ, কত অনাবিল। পদ্মর পাপড়ি ছিঁড়ে মধু খেতে খেতে বলেছিল চন্দ্রা,—'চন্দ্রাবতীর মিল শুধু একটা কথায়—জয়াবতী।'

চন্দ্রাবতী যে একদিন জয়াবতী হবে একথা এঁচে রেখেছিল গ্রামের সবাই। ছোটবেলা থেকেই ওদের জানা-শোনা, চেনা-পরিচয়। দু'জনে দু'জনকে ছেড়ে থাকতে পারে না একটুও। চন্দ্রার সংসারের কাজ আছে তবুও তার ফাঁকে জয়ানন্দের সঙ্গে তার দেখা করা চাই-ই। জয়ানন্দও চন্দ্রাকে নানাভাবে সাহায্য করে, সজনে ডাঁটা পেড়ে দেয়, কলসী তুলে আনে আরও কত কি! সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি জয়ানন্দ আর চন্দ্রাবতী দু'জনে গোটা পাটওয়াড়ী গ্রামখানাকে চষে বেড়ায়। বংশীদাসের নজর এড়ায় না কিছুই। তার ভারী ভালো লাগে দু'জনের এই মেলামেশাকে। ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে ওঠে থেকে থেকে।

এমনিভাবে গড়িয়ে যায় বছর, বছরের পর বছর।

চন্দ্রা এখন বড় হয়েছে। কৈশোরের সীমানা পেরিয়ে গেছে। দেহে এসেছে এক অপূর্ব্ব লাবণ্যের জোয়ার। দু'কূল ছাপিয়ে ছড়িয়ে গেছে তার উদ্দামতা। কিন্তু দেহের এই উদ্দামতার সঙ্গে মনের মিল নেই একটুও। কিশোর বয়সের লীলাচপল মনটা যেন হঠাৎ এখন থমকে দাঁড়িয়েছে, ঝর্ণার শীর্ণ জলধারা যেমন পাহাড়ের খাঁজে আটকে নিজেকে ছড়িয়ে দেয়। চন্দ্রার মনও ঠিক তেমনি। অগভীর চাঞ্চল্যের মাঝে নেমে এসেছে গভীরতা ও গাম্ভীর্য্য। সে এখন দায়িত্বশীলা। সংসারের ভার তার ওপর। তাছাড়া বংশীর বয়স হয়েছে, তাকেও দেখাশোনা করতে হয়। ওদিকে কবিখ্যাতিও তার ছড়িয়ে পড়েছে।

বংশীকে এখনও বেরোতে হয় গানের আসরে। দু' পয়সা না হলে সংসার চ'লে কিসে! চন্দ্রা আজকাল তার কবি। ভাসান থেকে সুরু ক'রে কবিগানের ছড়া সবই সে



কবি বংশীদাসকে পর্দার বুকে ভাস্বর করে তুলেছেন পাহাড়ী সান্যাল

লিখে দেয়। তা' শুনিয়ে আসরে বংশী বাহবা পায় খুব। সবাই তারিফ্ ক'রে বলে,—'বয়সের সঙ্গে তোমার কলম যেন দিন দিন খুলছে। খাসা গান বেঁধেছো! আহা কলম তোমার যাহু জানে!'

গর্ব্বে বংশীর বুকখানা ফুলে ওঠে। বলে, 'এমন কলম কি আর আমার হয়! এ আমার চন্দ্রামায়ের বাঁধা গান!'

বিমুগ্ধ শ্রোতারা অবাক হ'য়ে যায় কথাটা শুনে। এই-ভাবে এক কান দু' কান ক'রে গ্রামের পর গ্রাম ছড়িয়ে পড়ে চন্দ্রাবতীর কবিখ্যাতি। সারা পূর্ব্ববঙ্গে রাষ্ট্র হ'য়ে যায় তার রামায়ণ রচনার প্রশংসা।

এদিকে জয়ানন্দও কবিয়াল হয়ে উঠেছে। আজকাল মাঝে মাঝে আসরে বেরোয়। সংসারের খরচ চালায়। কিন্তু চন্দ্রার ওপর তার টান একটুও কমে না। দিনান্তে একবার না একবার আসে। দেখা হয়। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মিলন-বিরহের মাঝে দিন যায়।

আজকাল কিন্তু গ্রামের মধ্যে চন্দ্রাদের এই মেলামেশা নিয়ে মৃদু গুঞ্জন শোনা যায়। অলস পরচর্চ্চা যাদের উপ-জীবিকা তারা এতে বেশ একটু আমোদ পায়। চোখ-মুখের অর্থপূর্ণ ভঙ্গী ক'রে মন্তব্য করতেও ছাড়ে না,—'কাজটা ভালো হচ্ছে না বংশী, দিনকাল খারাপ, একটু সমঝে চলো।'

বংশীদাস আত্মাভোলা মানুষ। মেয়ের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। জয়ানন্দকে সে জানে আর এ-ও জানে ওদের দু'জনের মন মিলেছে কবিতাকে কেন্দ্র ক'রে। ওদের আর প্রয়োজন নেই লোক-দেখানো মন্ত্র পড়ে মিলনের অভিনয় করার। তাই বলে প্রতিবাদ ক'রে,—'ছিঃ, তোমাদের মতো নীচু মন নিয়ে কবি চন্দ্রাবতীকে বিচার করা শোভা পায় না।'

গ্রামের লোকের কথায় চন্দ্রা কান দেয় না। এতে তাদের মেলামেশার স্বাচ্ছন্দ কোথাও আড়ষ্ট হয় না। সেদিন সন্ধ্যায় চন্দ্রা দাঁড়িয়েছিল দোর-গোড়ায়। হিজল গাছটার গা ঘেঁসে। মনটা তার আজ একটু খারাপ। বংশী ক'দিন হলো গেছে দূরের একটা গ্রামে গানের আসরে। বাপের জন্যে চিন্তা আর উদ্বে[illegible] তাকে-ভারাক্রান্ত ক'রে তুলেছে। তার ওপর নতুন একটা ভাসান গানের কাব্য রচনায় ব্যস্ত। তাই চন্দ্রা একটুও টের পায় না কখন তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে জয়ানন্দ। হঠাৎ জয়ানন্দকে দেখে কেমন যেন একটু চমকে ওঠে। পরক্ষণেই বুকটা ভ'রে ওঠে অজানা আনন্দের আতিশয্যে। ছুটে যায় ঘরে। মালতী ফুলের এমটা মালা এনে পরিয়ে দেয় জয়ানন্দকে। জয়ানন্দ অবাক বিস্ময়ে অপলকে চেয়ে থাকে চন্দ্রার দিকে। চন্দ্রা বলে,—'মনে আছে জয়? একদিন ছড়া কেটে বলেছিলাম—জয়ের আশায় মন উজানে গো টানে। সত্যিই আজ আমার জয় হয়েছে, আজ আমার ভাসান গান বাবা গাইবেন হিঙ্গুল বাড়ীর আসরে। আজ আমি জয়ী, সত্যিকারের জয়াবতী।'

সত্যিই চন্দ্রাবতীর রচিত রামায়ণ গানের জয় হয়েছে। হিঙ্গুল বাড়ীর আসরে শ্রোতারা অজস্র বাহবা দিয়ে চন্দ্রাবতীর জয়গান করেছে। বৃদ্ধ বংশীদাসের বর্ণনায় আর কেনারামের কণ্ঠে অপূর্ব্ব সে রামায়ণের ব্যঞ্জনা। সেদিনের আসরের মূল গায়েন ছিল কেনারাম।

কেনারামকে বংশীদাস পায় পথে। সে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর কাহিনী। হিঙ্গুলবাড়ী যাওয়ার সময় বংশী যখন তার দলবল নিয়ে 'জালিয়া হাউর' নামে মস্ত একটা বন পেরোচ্ছিল তখন সদলে তাদের ওপর কেনারাম চড়াও হয়। কেনারাম পূর্ব্ববঙ্গের নামকরা দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত। তাকে দেখে বংশীদের মুখ ভয়ে পাংশু হয়ে যায়।

হাতের খাঁড়া নাচিয়ে বংশীর কাছে এসে কেনারাম হাঁকে,—'যা আছে দাও, নইলে প্রাণ যাবে।'

'আমরা গরীব ব্রাহ্মণ, আমাদের কিছুই নেই। সংসার চলে গান গেয়ে।'

'তবে তৈরী হও মৃত্যুর জন্যে।'

বংশী তখন শেষ মিনতি করে—'একবার মায়ের নাম ক'রবো, এই ভিক্ষে দাও।'

বংশীর সে-ভিক্ষা মঞ্জুর হয়। জীবনে শেষবারের মতো বংশীদাস তার দল নিয়ে সেই গহন বনেই শুরু করে ভাসানের করুণ গান। চন্দ্রাবতীর রচিত লখিন্দর-বেহুলার সেই মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী ও বংশীর সুললিত কণ্ঠ কেনারামকে

সম্মোহিত করে। পাষাণে ফাটল ধরে। কেনারামের হাত থেকে খাঁড়া হয় ধূলিসাৎ। সে যোগ দেয় বংশীর দলে। হিঙ্গুলবাড়ীর আসরে মূল গায়েন হ'য়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে।

ফিরে এসে এ-কাহিনী বংশী সবিস্তারে বর্ণনা করে চন্দ্রার কাছে। চন্দ্রা বিস্মিত হয়। ভাবে,—'কেনারামের এ-পরিণতির মূলে তার রচনাই দায়ী। বাবারও অনেক কৃতিত্ব আছে।' ঠিক করে নতুন ভাসান রচনার মধ্যে এ-কাহিনীও সে জুড়ে দেবে

এর পর কয়েকমাস কেটে গেছে।

বংশীদাস নিত্য সকালে আপন উপাস্য দেবতা শিবের ধ্যান করেন। চন্দ্রাবতী পাশে বসে বিভোর হয়ে শোনে পিতার গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠের সেই দেবমহিম গান। কিন্তু সে ধ্যানে আজ বিঘ্ন ঘটেছে। দীন দরিদ্র বংশীদাস ভাবেন কি করে তাঁর লক্ষ্মীস্বরূপিনী মাকে তার উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করবেন? ঘটক নানা দেশ থেকে নানা পাত্রের খবর নিয়ে আসছে—কোনটাই বংশীদাসের মনঃপূত হয় না। লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না—লাখ কথার শেষে বিয়ে স্থির হল সেই জয়ানন্দের সঙ্গেই। উৎফুল্ল মনে বংশীদাস চলেছেন ঘরের দিকে চন্দ্রামাকে এ শুভ-সংবাদ দিতে। কিন্তু বিধি বাম!



এদিকে আঘাত আর ওদিকে আনন্দ: প্রথম ধাক্কার আঘাত সামলে বংশী এসে দাঁড়ায় মেয়ের পাশে

চিরদিনের আবেগপ্রবণ জয়ানন্দ। চন্দ্রার হাতের দেওয়া মালা তার সমগ্র সত্ত্বাকে টেনে নিয়ে গেছে চন্দ্রার দিকে। চন্দ্রাকে তার চাই-ই। নির্জ্জন মালতী বনে চন্দ্রা তখন ফুল তুলছে বাবার পূজার জন্য—কাছে এলো জয়ানন্দ—ভীরু কম্পিত হাতে তুলে দিল একখানি চিঠি—সে চিঠি তার বুকের রক্তে লেখা। "চন্দ্রা! আমায় তুমি গ্রহণ করবে?"—চন্দ্রা কি জানাবে সে কথা! সে যে কুমারী—সে যে সংযমী—ঘরে তার পিতা রয়েছেন—স্বাধীন মত তো চন্দ্রার কিছু থাকতে পারে না। চন্দ্রার দ্বিধা জড়তা জয়ানন্দের কাছে রূপ নিল সংশয়, অবিশ্বাস আর ছলনার রূপ নিয়ে। এই তবে চন্দ্রাবতী! এই তার প্রেমের মূল্য! তাই যদি হয় তবে দূরে যাক্ এ পরিচিত বিশ্ব—জয়ানন্দ বরণ করে নেবে নিরুদ্দেশকে ফুলেশ্বরীর তরঙ্গ ভঙ্গের ওপর দিয়ে কালো আকাশের বুকে মিশে গেল জয়ানন্দের চিরদিনের বিশ্বস্ত সঙ্গী—তার ছোট নৌকাখানি। কেউ জানলোনা সে কথা—যারা জানলো তারাও প্রকাশ করলোনা সে কথা।

হাওর ভরা দেশ এই পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ। উন্মুক্ত আকাশের নীচে দিকসীমাহীন জলের প্রসার—ধূ ধূ করা জল—অথৈ অসীম জল—আকাশে একবিন্দু কালো মেঘ দেখা দিল—অমনি জেগে উঠল জলের বুকে শিবের তাণ্ডব নৃত্য—সে নৃত্যে সইল না জয়ানন্দের এ ক্ষুদ্র ডিঙ্গি নৌকা—তলিয়ে গেল জয়ানন্দ কোন্ সাত সাগরের তলায় পাতাল-পুরীর দেশে।

জেগে উঠে দেখে একি অবাক কাণ্ড! এ কোথায় আমি! এ কে সুন্দরী আমার সেবা করছে! এ সুন্দরী জুবেদা—শ্রদ্ধেয় রহমৎ ফকীর সাহেবের কন্যা। ফকীর সাহেব এ অঞ্চলের মালিক—অতুল তাঁর ঐশ্বর্য্য—কিন্তু ঐশ্বর্য্যের আড়ালে চাপা পড়েনি তাঁর ভাবুক উদাসীন মনটি—সেই ঝড়ের রাতে তিনি ফিরছিলেন মহাল থেকে —পথে এক নির্জ্জন চড়ার ধারে কুড়িয়ে পেলেন জয়ানন্দের অচৈতন্য দেহ। জয়ানন্দ পেল স্নেহের আশ্রয়—জুবেদা পেল তার নিঃসঙ্গ জীবনে একজন সাথী! জুবেদা ভাবে কে এই প্রিয়দর্শন তরুণ—তাঁর সর্ব্বদেহে মনে এ কিসের ব্যাকুলতা—তাঁর চোখে এ কি শরাহত দৃষ্টি! কে তাকে আঘাত দিয়েছে—কেন দিয়েছে? আমি কি পারবো না তাঁর সেই দুঃখ ভুলিয়ে দিতে—আমি কি পারবো না ভালবাসার প্রলেপে তার সেই ক্ষত আরাম করতে।

—আর জয়ানন্দ ভাবে—এ কে এল আমায় নতুন আশার আলোকে জাগিয়ে তুলতে! কে এই সর্ব্বস্নেহময়ী, সর্ব্বপ্রীতিময়ী মূর্ত্তিমতী দেবী!

শ্রদ্ধা পরিণত হয় প্রীতিতে, প্রীতি পরিণত হয় প্রেমে। জয়ানন্দের মনের কোণে মেয়েটি বুঝি স্থান পায়।

গ্রাম দেশে খবর রাষ্ট্র হ'তে সময় লাগেনা। দশখানা গ্রাম ডিঙিয়ে খবরটা একদিন হঠাৎ এসে হাজির হয় পাটওয়াড়ীতে,—'জয়ানন্দ বিয়ে করেছে জুবেদাকে। মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে সে।'

বৃদ্ধ বংশীদাস শয্যা নেয়। চন্দ্রার বুকে শেল বেঁধে। তবুও সে সহ্য করে সব। সহ্য করে পাথুরে বুকে নয়, মরমী কবির কোমল বুকে। সান্ত্বনা খোঁজে কাব্য রচনায়। এমন রামায়ণ সে রচনা করবে যা ছাড়িয়ে যাবে কৃত্তিবাসকে। ছাড়িয়ে যাবে অপূর্ব্ব কারুণ্যে, ব্যঞ্জনায় আর মর্ম্মস্পর্শনে। তাই চন্দ্রা যায় পদ্মদিঘির পাড়ে, সন্ধ্যার ধূসর নির্জ্জনতায়। চোখের জল ফেলে আর মনে মনে ছন্দ গাঁথে রামায়ণ রচনার,—সীতার করুণ বনবাস।

বংশী 'পের মন স্থির হয় না। প্রথম ধাক্কার আঘাত আসরে। ংশী [illegible] দাঁড়ায় মেয়ের পাশে। মুখ তুলে চাইতে পারে না। আকাশে চোখ রেখে প্রশ্ন করে—'তোর কি হবে মা?' চন্দ্রা জবাব দেয়। চেষ্টা করে সুরটা স্বাভাবিক করবার—চেষ্টা ক'রে বলে—'হিন্দুর মেয়ের দু'বার বিয়ে হয় না বাবা! আমি যে জয়ানন্দকেই মন দিয়েছি।' তবুও শেষের দিকে গলাটা তার কেমন যেন বুজে আসে।

বংশী তবুও স্থির থাকতে পারে না। চন্দ্রা যদি তার কাছে কাঁদতো বুকফাটা কান্না তাহলে হয়তো সে আশ্বস্ত হতো। কিন্তু তা তো হবার নয়। বংশী তাই আরও অধীর হয়ে ওঠে। নিজের যা কিছু ছিল সব দিয়ে ছোট একটা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেয় চন্দ্রার জন্যে। ভাবে হয়তো পূজা-অর্চনায় ভুলে চন্দ্রামা তার এত বড় আঘাতটা সইতে পারবে।......

এদিকে আঘাত আর ওদিকে আনন্দ।

বহু সমারোহে জয়ানন্দের বিয়ে হয়ে যায় জুবেদার সঙ্গে মুসলমান মতে। জাঁকজমকের রোশনাই,—আলোয়, আতরে, ফুলে ফুলে আবিল হয়ে ওঠে। জুবেদা সার্থক হয় তার স্বপ্নের সফলতায়। জয় করে জয়ানন্দকে।

উৎসব একদিন শেষ হয়। থেমে আসে কলকাকলী। সন্ধ্যা ঘনায়মান। নিস্তব্ধতার আবরণে জুবেদার দেখা হয় জয়ানন্দের সঙ্গে। উঠোনের একটা ঝাঁকরা হিজল গাছের তলে। জুবেদা জয়ানন্দের হাত ধ'রে বলে,—'আজ আমি জয়ী, তোমাকে জয় করেছি।' জয়ানন্দ চমকে ওঠে কথাটা শুনে, স্বপ্নভাঙা মানুষের চমকে ওঠার মতো। মনে হয় কথাটা যেন আসছে অনেকদূর থেকে, অনেক অনেক দিন পেরিয়ে। মনে পড়ে চন্দ্রার মুখ। রাং চিতের বেড়ার ধারের সেই হিজল গাছ। কলমী ফুলের মালা। জয়ানন্দ আর দাঁড়াতে পারে না। তীব্র অনুশোচনার কশাঘাতে বুকটা ফুলে ওঠে।

সেই রাতেই চন্দ্রাকে চিঠি লেখে। লেখে,—'আমায় ভুল বুঝোনা চন্দ্রা। প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ দাও। একবার অনুমতি দাও দেখা করবার।' সে চিঠির কোন জবাব আসে না।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে। নির্জ্জন দেউলে নেই



বাংলার প্রথম মহিলা-কবি 'কবি চন্দ্রাবতী'র কাব্যসঙ্গীতময়
জীবননাট্যের চিত্ররূপে নাম ভূমিকায় অনুভা গুপ্তা



চিত্রভারতীর প্রথম নিবেদন 'ভোর হ'য়ে এলো'র নায়িকারূপে শ্রীমতী প্রণতি ঘোষ

সন্ধ্যারতির সুর। মন্দিরের দরজা বন্ধ। চন্দ্রা তন্ময় হ'য়ে ভুলে আছে শিব-পুজোয়। ফুলের সাজির পাশেই তুলোট কাগজের পুঁথি। অসমাপ্ত রামায়ণের শেষ অধ্যায় আজ তাকে শেষ করতেই হবে।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে ওঠে। আকাশে সুরু হয় বৈশাখী তাণ্ডব। মেঘের মাদল আর বজ্রের হাঁক। বৃষ্টির ধারা নামে কান্নার সুরে। সে-সুর ছাপিয়ে ওঠে শব্দ,—খট্ খট্ খট্।

মন্দিরের রুদ্ধ দরজায় আঘাত করে জয়ানন্দ—চন্দ্রা! চন্দ্রা! চন্দ্রা! সাড়া নেই। শুধু তার ডাক ফিরে আসে মন্দিরের দেওয়ালে আঘাত ক'রে। আকুল আহ্বান মিশে যায় একটানা বৃষ্টির মুখে। তবুও উন্মুক্ত হয় না দেউলের অর্গল। শেষ মিনতি জানায় জয়ানন্দ—চন্দ্রা! চন্দ্রা! চন্দ্রা! আকাশের বুক ওঠে কেঁপে কেঁপে। ঝড়ো হাওয়া যায় সন্‌সনিয়ে। তবুও মন্দির নিস্তব্ধ। নিস্তব্ধ তার অন্তঃপুরচারিণী। নিষ্ফল হতাশায় অন্তর কেঁপে ওঠে জয়ানন্দের। ক্ষণ বিদ্যুতের আভায় নজরে পড়ে দেউল প্রাঙ্গণে সদ্যফোটা একরাশ রক্ত সন্ধ্যামালতী। সমবেদনায় তারা মূক। উন্মুখে চেয়ে আছে তার মুখে। জয়ানন্দ যেন দেখে তাদের ভেতর তার প্রেমের সার্থকতা, নিষ্কলুষতার নিদর্শন রেখে যাবার প্রকৃষ্ট পন্থা। ছুটে গিয়ে উত্তরীয় ভ'রে তুলে আনে সন্ধ্যামালতী। তাদের অলক্ত রসে মন্দিরগাত্রে লেখে তার মর্ম্মবাণী, শেষ অভিজ্ঞান—'চন্দ্রা আমায় ভুল বুঝো না। আমি তোমারই জয়ানন্দ। তুমি জয়াবতী।'

আর দাঁড়াতে পারে না। কানে আসে ফুলেশ্বরীর শীতল আহ্বান। বর্ষণবিক্ষুব্ধ নদীর আকুল গর্জ্জন শেষবারের মতো দেউলের পাষাণ-ফলকে দৃষ্টির মিনতি রেখে জয়ানন্দ ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুলেশ্বরীর বুকে,—ঝুপ্!

মন্দির কেঁপে ওঠে। কেঁপে ওঠে মন্দিরবাসিনীর বুক—ঝুপ্। তারপর সব নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ। ক্লান্তবর্ষণ প্রকৃতি শান্ত, সমাহিত। শুধু চন্দ্রার বুকের শব্দ আরও স্পষ্ট, আরও দ্রুত। উঠে গিয়ে খুলে দেয় মন্দিরের দ্বার। ধীরে ধীরে পেরিয়ে আসে চৌকাঠ। নজরে পড়ে অলক্তরসে লেখা জয়ানন্দের শেষ মিনতি। বুকের ভেতর থেকে কি যেন একটা ঠেলে ওঠে। স্বপ্নভাঙা শিশুর আকুলতায় ভেঙে পড়ে। ভেঙে পড়ে মন্দির সোপানে—লুণ্ঠিতা চন্দ্রা। আর ওঠে না। সব নীরব। শুধু থেকে থেকে ফুলেশ্বরী কেঁপে ওঠে, গর্জ্জে ওঠে—ঝুপ্—ঝুপ্—

'চিত্রা'র আত্মকাহিনী



নরাধম কর্তৃক শ্রুতিলিখিত

নিস্পন্দ নিথর রাত। উদাসী রাতের নিঃসীম অন্ধকারে বোধ হয় সময় বোবা হ'য়ে গেছে! কত রাত হবে? জোনাক্-জ্বলা আকাশচারী তারারা এখন কোথায় মুখ লুকিয়ে আছে? কিন্তু আমিই বা কোথায়?

হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলাম। সত্যিই তো, এই গহন নিঃসঙ্গ রাতে আমি এ কোথায় বসে আছি? আমার চারপাশে হাল্কা পালকের মত কুয়াশা, পরশ আছে—উষ্ণতা নেই, নেই তার অন্তরের শৈত্য, নেই তার কামনা-কুল আলিঙ্গনের মদিরালসতা। বাতাস চলৎশক্তিহীন, নিষ্প্রাণ।

শরীরে রোমাঞ্চ! এ কোথায়? হাত দিয়ে অনুভব করলাম: শক্ত মাটি! পকেটে হাত দিলাম—না, দেশলাই নেই! চোখ মেলে চারিদিকে তাকালাম—একটি প্রশস্ত ঘর ব'লে মনে হ'ল! জ্ঞান, বুদ্ধি সমস্ত যেন এক নিমেষে অবলুপ্ত হ'য়ে গেল। সমস্ত অন্তরাত্মা আর্ত্তনাদ করে উঠতে চাইল—এ কোথায়? এ কোন মৃত্যুপুরীতে একা বাসর জাগিয়ে বসে আছি?

কখন ভোর হবে? কখন দেখা দেবে সূর্য্য-সারথী, কখন এই অন্ধ-নীল কুয়াশার অন্ধকার কেটে আলো ফুটে উঠবে, আর শেষ হবে এই ঘরে একা থাকার দুঃসহ স্বপ্ন!

সামনে আবছা-সাদা কি যেন নড়ে উঠলো! উত্তপ্ত রক্তে নেমে এলো হিমানী-প্রবাহ! বিজ্ঞানী, অনুসন্ধিৎসু মনেও চাঞ্চল্য: সংস্কারাচ্ছন্ন মনের চিরন্তন প্রতিক্রিয়া! ভূত!

'ভয় পেয়েছেন?'

স্পষ্ট শুনতে পেলাম। অগ্রগামী সাদা ছায়ামূর্ত্তির কণ্ঠস্বর সেই নিস্তব্ধ রাতকে আলোড়িত ক'রে তুললো। কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হ'য়ে আসে, মরিয়া হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি কে? এ আমি কোথায়?

অন্তরঙ্গ স্বর শোনা সেই ছায়ামূর্ত্তির: আমি 'চিত্রা' চিত্রগৃহের পর্দ্দা, আদর ক'রে রজত-পটও কেউ কেউ বলেন! আর আপনি 'চিত্রা'র হলে। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, না?

এক নিমেষে সব মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ, আজই রাত ন'টার প্রদর্শনীতে 'মহাপ্রস্থানের পথে' দেখতে এসেছিলাম! কত, কতদিন পরে আবার এই চিত্রগৃহে নিউ থিয়েটার্সেরই এক ছবিতে ফিরে পেয়েছিলাম অতীতকে। নিউ থিয়েটার্সের স্বর্ণযুগের ঐতিহ্য। ফিরে পেয়েছিলাম বারংবার নিরাশ হৃদয়ের সুখ-শান্তির প্রলেপ, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের নিউ থিয়েটার্সের ছবিকে ঘিরে ফেলে-আসা অতীত-রঙীন স্বপ্ন!

ছবি? নিউ থিয়েটার্স! নিখিল ভারত-বন্দিত চণ্ডীদাস, দেবদাস, ভাগ্যচক্র, মীরাবাঈ, মায়া, গৃহদাহ, মুক্তি, বিদ্যাপতি, সাথী, দেশের মাটি, রজত-জয়ন্তী, অধিকার, ডাক্তার, প্রতিশ্রুতি, কাশীনাথ, উদয়ের পথে, রামের সুমতি……

একটির পর একটি ছায়ামূর্ত্তি স'রে যায়: শিশিরকুমার ভাদুড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া, সায়গল, পাহাড়ী সান্যাল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, শৈলেন চৌধুরী, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, পঙ্কজ মল্লিক, শ্যাম লাহা, কৃষ্ণচন্দ্র দে, উমাশশী, চন্দ্রাবতী, কানন, লীলা দেশাই, মলিনা, যমুনা, মেনকা, দেববালা, মনোরমা, রাজলক্ষ্মী, নিভাননী, ছায়া দেবী, ভারতী দেবী, প্রভা আরও, আরও অনেকে! মনে পড়ে গেল দেবকীকুমার বসু, প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া, নীতিন বসু, ফণী মজুমদার, হেমচন্দ্র চন্দ্রের নাম!

নরাধম, কিন্তু নরোত্তমদের তো ভুলি নি! ভুলি নি 'চিত্রা'র সঙ্গে আমার অন্তরের নিবিড়তা! এই ঘরে ব'সে নিউ থিয়েটার্সের ভাল ছবি দেখে সমস্ত দর্শকের সঙ্গে সমানভাবে আনন্দ উপভোগ করেছি, অধীর হ'য়ে উঠেছি, উজাড় ক'রে দিয়েছি প্রাণের সমস্ত আবেগ, উচ্চ-প্রশংসায় রাতের আকাশকেও রোমাঞ্চিত করেছি…আর, আর উত্তরকালে নিউ থিয়েটার্সের একটির পর একটি ব্যর্থ ছবি এই

ঘরে ব'সে দেখে অঝোরে কেঁদেছি, রাতের চোখে এনে দিয়েছি জল, ক্ষুব্ধ হতাশায় বারবার শপথ করেছি—আর নয়, আর এখানে আসব না তোমার সম্পর্ককে অচ্ছেদ্য রাখতে, চাই না তোমাকে···কিন্তু তবু এসেছি, তবু এই ঘরে ব'সে ছবি দেখেছি, ব্যথা পেয়েছি, কেঁদেছি আর শপথ করেছি—আর নয়, আর নয়!

চিত্রার পর্দাটি আমার এই স্বল্প আত্মবিস্মৃতিতে একটু বিস্মিত হয়েছিল, বললো : পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে গেল কি? তা হয়, রাত বারোটার পর যখন সবাই চলে যায়, তখন আমি আর এই ঘরের চেয়ার, কুশনেরা মাঝে মাঝে এসে গল্প করি---অতীত ঐশ্বর্য্যের রোমন্থন। কোনও আসনের কোনোদিন ক্ষোভ ছিল না, ভাল সোয়ারির অভাব হয় নি—মাঝে কয়েক বছরের কি দুঃস্বপ্নই না গেল?

জিজ্ঞাসা করলাম : অতীতের কথা সব মনে আছে?

উত্তর পেলাম : সব কি মনে থাকে? প্রায় বাইশ বছর তো এই বাড়ীতে কাটালাম—কত কান্না-হাসির রঙীন মুহূর্ত্ত এসেছে, চলে গেছে! বনেদী জমিদারের মত আজ আমাদের নাম আছে, আভিজাত্য আছে—কিন্তু ঐশ্বর্য্য নেই। মাঝে মাঝে এক একবার সমারোহ হয়, কিন্তু তার পরেই কম্পিত বুকে দাঁড়াতে হয়—কে জানে আবার কতদিনের দারিদ্র্য আর নিরানন্দ! কত দেখলাম, কত শুনলাম—আমাদের আভিজাত্যকে স্পর্দ্ধা ক'রে কত নতুন মুখ এলো, কিন্তু বনিয়াদ কোথায়, ঐতিহ্য কই? আজ তারা একবার করুণা ক'রে আমাদের মুখের দিকে তাকায়—কিন্তু বিলিতি এসেন্সে কি আতরের অভিজাত সুরভির স্পর্শ পাওয়া যায়?

বললাম : 'চিত্রবাণী'র সম্পাদক শারদীয়া সংখ্যায় আমার একটা লেখা চেয়েছেন। 'নরাধম' বলে আমি পরিচিত, কিন্তু এ নামটি সঙ্গদোষে অর্জ্জিত। সত্যি সত্যিই আমি 'নরাধম' নই। আমি এবারে এমন একটি লেখা দিতে চাই যাতে আমার এই দুঃসহ নামের জ্বালা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি। যদি অতীত দিনের কথা কিছু বলে যাও—

'চিত্রা'র পর্দার মুখে হাসি ফুটে উঠলো, বললে—সব কথা তো আর মনে নেই, থাকা সম্ভবও নয়। হয়ত অনেকের নাম ভুলে যাব, হয়ত অনেকের ওপর অবিচার করবো, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দিনক্ষণও ভুল হতে পারে, তবু শুনুন—

মুখোমুখি বসলাম।

'চিত্রা'র পর্দা বলতে সুরু করলো :

স্যার এন, এন, সরকারের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকারের খেয়াল হ'ল চলচ্চিত্রের ব্যবসা করার। হ'ল ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্র্যাফ্‌টের পত্তন, তোলা হ'ল ছবি কিন্তু—কিন্তু ছবি প্রদর্শনের সুযোগ আর সুবিধা কোথায়? চিন্তিত হয়ে উঠলেন ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত সরকার।

পরিকল্পনা হ'ল আমাদের সৃষ্টির। এমন একটি ছবিঘর করতে হবে যাতে ভারতীয় চিত্রশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। ততদিনে ভারতে সবাক ছবির হিড়িক এসে গেছে। যুগোপযোগী ক'রে আমাদেরও সবাক ছবির জন্য তৈরী করা হ'ল। পত্র-পত্রিকা উল্লসিত হ'য়ে উঠলো, সংবাদ প্রকাশিত হ'ল : বড়দিনের সময় আমাদের শুভমুক্তি!

সেটা ১৯৩০ সাল। কিন্তু আমাদের দেরী আর সইল না। দ্বারোদ্‌ঘাটন হ'ল ৮ই নভেম্বর ১৯৩০ সালে। রাধা ফিল্মসের নির্ব্বাক ছবি শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' দিয়েই আমাদের যাত্রা সুরু হ'ল। সেদিনের কথা ভোলবার নয়, ভোলবার নয় সমস্ত দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা আর অভিনন্দনে উচ্ছ্বসিত সেই পরম লগ্নটি!

তারপরে উল্লেখযোগ্য চিত্রমুক্তি হ'ল ১৯৩১ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী ইন্টারন্যাশনাল ফিল্মক্র্যাফ্‌টের 'চোরকাঁটা'। কিন্তু প্রথম কথা আমরা শুনি আমাদেরই যন্ত্রপাতি দিয়ে একটি ছোট্ট ভাষণের মারফৎ। বোম্বের দি ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানী পরীক্ষার জন্যই এই ভাষণের শব্দ গ্রহণ করেছিলেন। সমস্ত ঘরময় এই কথা শুনে আমাদের প্রত্যেকেরই শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল—কিশোরীর প্রথম যৌবন লাভের মত সে এক বিচিত্র অনুভূতি!

একে একে মুক্তিলাভ করলো একুশে ফেব্রুয়ারী বাষ্টার

কীটন অভিনীত ইংরাজী ছবি 'স্পাইট ম্যারেজ', আঠাশে ফেব্রুয়ারী এম-জি-এম-এর 'নেভি ব্লু জ' ও লরেল হার্ডির 'মেন অব ওয়ার', ৭ই মার্চ্চ 'বিগ্রহ,' ১৪ই মার্চ্চ এম-জি-এম এর 'মাদাম এক্স'। হ্যঁ, ভাল কথা ; ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে এই চিত্রগৃহ থেকে 'চিত্রা' নামে একটি প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশিত হতে সুরু করলো, তাতে থাকতো চিত্রায় মুক্তি-প্রাপ্ত ও আগামী ছবির সম্বন্ধে রসালো সংবাদ আর থাকতো দর্শকসাধারণের ছবির সম্বন্ধে মতামত। বাঙালী দর্শকদের কাছে সে এক নতুন অভিজ্ঞতা।

২১শে মার্চ্চ। ভারতে প্রস্তুত প্রথম পূর্ণাঙ্গ সবাক ছবি 'আলম আরা' এখানে দেখানো সুরু হয়। দর্শকের সে কি উৎসাহ আর উদ্দীপনা। ছবিটি চললো দু'সপ্তাহ। তারপর এলো ৩রা এপ্রিল থেকে 'চোরকাঁটা', সবাক হ'য়ে। ছবিটি এক মুহূর্ত্তে সকলের চিত্ত জয় করে নিল। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এই কাহিনীটি চিত্রায়িত করেন প্রফুল্ল রায়, চিত্রগ্রহণ করেন নীতিন বসু। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না গুপ্তা, প্রেমকুমারী নেহেরু, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রেণু দেবী, বোকেন চট্টোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, চানী দত্ত প্রভৃতি। এক মাসেরও ওপর চলেছিল এই ছবিটি, মেয়েদেরও এত ভিড় হতে সুরু করে যে তৃতীয় সপ্তাহ থেকে মহিলাদের জন্য পৃথক আসনের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

২৮শে এপ্রিল সুরু হ'ল 'রিডেম্পশান', ২রা মে 'মোন্টানা মুন', ৯ই 'হোয়াইট স্যাডোজ ইন দি সাউথ সিজ', ১৬ই 'কল অফ দি ফ্লেশ', ৩০শে প্রভাত-এর 'দি ফাইটিং ব্লেড' বা 'খুনী খাজাহার'। ৬ই জুন লন চ্যানী'র সংলাপ-মুখরিত 'দি আনহোলি থ্রি', ১৩ই 'দি ডেভিল মে কেয়ার' ও 'আন-এ্যাকাষ্টমড ম্যাজ উই আর' এবং ২০শে 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট'। ৪ঠা জুলাই থেকে ফিল্মস অব দি ইষ্ট লিঃ-র শরৎচন্দ্রের 'স্বামী' ছবিটির প্রদর্শনের কথা বিজ্ঞাপিত করা হয়, কিন্তু সম্ভব হ'ল না 'অল কোয়ায়েটে'র অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তার জন্য। অবশেষে ১১ই জুলাই 'স্বামী' ছবিটি মুক্তিলাভ করে, কিন্তু তখন দর্শকদের প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে আবার 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট' ছবিটি দেখানো হবে। 'স্বামী' ছবিটির প্রদর্শনের সময়ও মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা করা হয়। এই ছবিটি চলে দু' সপ্তাহ।

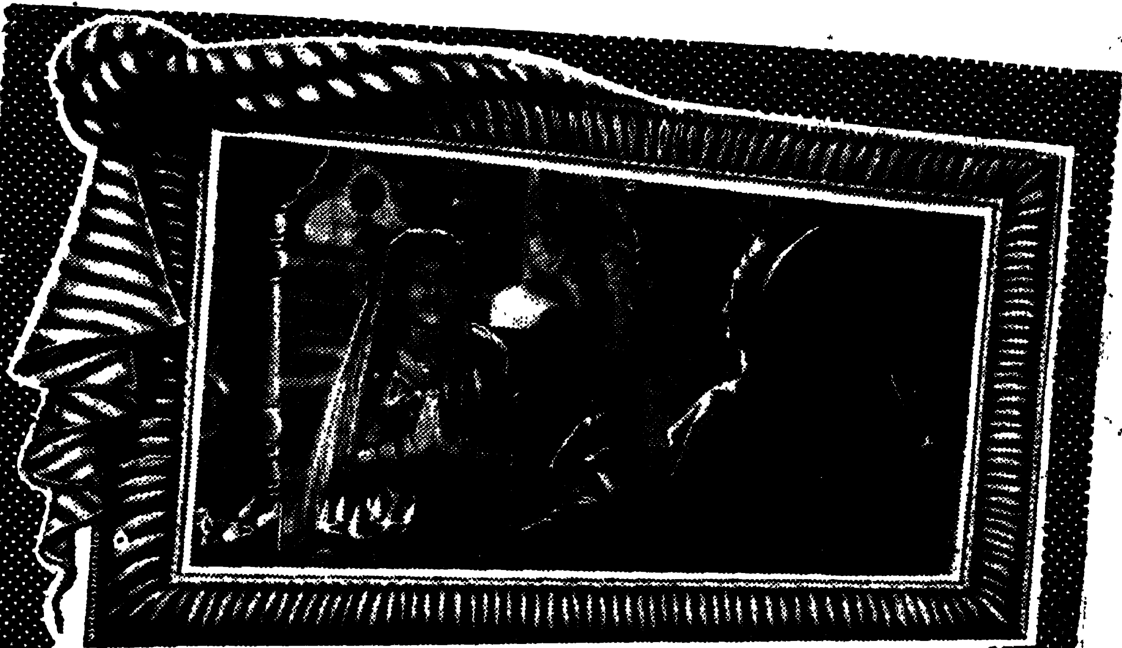
২৫শে জুলাই থেকে 'ফ্রি য়্যাণ্ড ইজি', ৩১শে 'ইন গে-ম্যাড্রিড', ৮ই আগষ্ট থেকে ইউনিক পিকচার্সের 'হাম' বা 'চুপ' নামে বাঙলা ছবি, ১৫ই আগষ্ট নর্ম্মা শিয়ারারের 'দি ডাইভোর্স'। আবার ২২শে আগষ্ট এলো পূর্ব্ব প্রতি-শ্রুতিমত 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট' এবং এবারও দু' সপ্তাহ ছবিটি চললো!

৪ঠা সেপ্টেম্বর। ইন্টারন্যাশানাল ফিল্ম ক্র্যাফ্‌ট্‌-এর 'চাষার মেয়ে' মুক্তিলাভ করে। এর আগে কোনও ছবি আর এরকম জনসম্বর্দ্ধনা লাভ করে নি। চার সপ্তাহ ধ'রে সমানভাবে দর্শকদের আনন্দ বিতরণ ক'রে এসেছে, আর মুহুর্মুহু দর্শকদের আনন্দোল্লাসে আমাদের হৃদয় স্পন্দিত হয়েছে। ছবিটিতে অভিনয় করেছিলেন প্রেমকুমারী নেহেরু, জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, রেণু দেবী।

২রা অক্টোবর 'ট্রেডার হর্ণ,' তারপর 'কল অব দি ফ্লেশ', ৭ই নভেম্বর 'রেজারেক্সন', ১৪ই অরোরার 'পূজারী', ২১শে গ্রেটা গার্ব্বোর 'ইন্সপিরেশান' এবং ২৮শে বড়ুয়া চিত্র প্রতিষ্ঠানের দেবকীকুমার বসু পরিচালিত ও তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া, সবিতা দেবী ও শান্তি গুপ্তা অভিনীত 'অপরাধী' ছবিটি। সে যুগের এত ভাল ছবি আর দেখা যায় নি। চার সপ্তাহ ধ'রে ছবিটি আমাদের এখানে চলে।

এরপর থেকেই এলো নিউ থিয়েটার্সের যুগ। ২৪শে ডিসেম্বর মুক্তিলাভ করে শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা'। পরিচালনা করেছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিভাননী। আগেকার সমস্ত জনপ্রিয়তার রেকর্ড ভেঙে ছবিটি পাঁচ সপ্তাহ ধ'রে চললো।

বছর ঘুরে গেল। ১৯৩২ সাল। ৩০শে জানুয়ারী চার্লি চ্যাপলিনের 'সিটি লাইটস্'—চললো দু'সপ্তাহ, ১৩ই ফেব্রুয়ারী লরেল-হার্ডির 'পার্ডন আস', ২০শে নর্ম্মা শিয়ারারের



সোহ্‌রাব মোদীর মহান চিত্র

ঝাঁসী কী রানী

মাতৃভূমির স্বাধীনতা-
সংগ্রামে একজন
নারীর আত্মোৎসর্গের
কাহিনী

কলার বাই
টেকনী কলার

নির্মাতা ও পরিচালক
সোহ্‌রাব মোদী



একমাত্র পরিবেশক : মুনলাইট ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স
১১, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা

'ট্রেজারস্ যে কিল', ২৭শে 'টেমিং অব দি শ্রু'। ৫ই মার্চ্চ 'আঁখিজল' আর ২১শে মার্চ্চ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর প্রথম সবাক চিত্রায়ণ 'বিচারক'। পরিচালনা করেছিলেন নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী, চিত্রগ্রহণ করেন নীতিন বসু। ২২শে মার্চ্চ রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা'র মুক্তিলাভ, দু' সপ্তাহ চলে এই ছবিটি।

১৬ই এপ্রিল সুরু হ'ল দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত 'ভাগ্যলক্ষ্মী' ছবিটি। দুর্গাদাসের অভিনয়-নৈপুণ্যে ছবিটি বেশ কয়েক সপ্তাহ চললো, তারপর এলো ২৮শে মে নিউ থিয়েটার্সের তোলা রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা', ১লা জুলাই শিশিরকুমার ভাদুড়ী পরিচালিত শরৎ-চন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' এবং ১৭ই সেপ্টেম্বর ভারতে তোলা সর্ব্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ ইংরাজী সবাক ছবি 'নুরজাহান'।

বললাম—ভোর হ'য়ে এলো। প্রথম দিকটা একটু তাড়াতাড়ি শেষ করলে হয় না ?

পর্দ্দা উত্তর দিল—এ কি তাড়াতাড়ি হবার ? কত দিনের স্মৃতি-বিজড়িত ইতিহাস, কত কথা মনে পড়ে যায়, বলতে বলতে কত রাত কেটে যাবে সেই আরব্যোপন্যাসের সহস্র রজনীর গল্পের মত···সব তো মনে পড়ে না, আর বেশীও তো বলি নি। যেখানে শেষ করেছি, সেখানেই শেষ হলো 'চিত্রা'র প্রথম যুগ! বাঙালী দর্শকের কাছে 'চিত্রা'র প্রতিষ্ঠা ও তাদের কাছে নিউ থিয়েটার্সের পরিচিতি! 'অপরাধী' ছবির লাজুক ছেলে প্রমথেশচন্দ্র ভবিষ্যতে কি সুনাম অর্জ্জন ক'রে গেলেন। নির্ব্বাক ছবির জনপ্রিয় নায়ক দুর্গাদাস সবাক যুগে মৃত্যু পর্য্যন্ত আরও জনপ্রিয় হ'য়ে রইলেন। দেখেছি এক একজনকে ভীরু পায়ে আসতে, আমাদেরই ছায়ায় ব'সে তাঁরা উত্তর-জীবনের যশ সঞ্চয় ক'রে গেলেন। যাক্ সে কথা! কে আজকের এই প্রৌঢ়া নিভাননীকে দু' একটি ছবিতে ছোট ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করতে দেখে মনে করবে যে একদা 'চিরকুমার সভা', 'দেনা-পাওনা' প্রভৃতি ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় তিনি হাজার হাজার দর্শককে মুগ্ধ করেছেন? আজকের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী মলিনাকে দেখেই বা কার মনে হয় যে ছোট ছোট হাসির ছবিতে ছোট-খাটো ভূমিকায় তিনি নাচতেন, গাইতেন? আমার হৃদয়ে এঁদের প্রত্যেকের কথা গাঁথা হয়ে আছে। এঁরা যত উন্নতি করছেন, তত আমার বুক ভ'রে ওঠে। শিশুর মত আমার বুকে এঁদের আমি মানুষ করেছি!

কিছুক্ষণের জন্য পর্দ্দাটি থামলো।

তারপর বলতে সুরু করলো: সত্যিই ভোর হ'য়ে আসছে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আকাশে নতুন সূর্য্যোদয়, মহানগরীর বুকে জাগবে কর্ম্ম-চঞ্চলতা। আমাদের এই বিশ্রম্ভালাপ শেষ হয়ে যাবে। এভাবে আর আপনাকে কবে এত কাছে পাবো জানি না—আজই মনের সমস্ত কথা উজাড় ক'রে দিয়ে যাই:

এর পর এলো 'চণ্ডীদাস'। সারা বাঙ্‌লা দেশে সাড়া প'ড়ে গেল। এতদিন চলচ্চিত্র সম্বন্ধে লোকের যে ধারণা ছিল, এই ছবিটি তা সব বদলে দিল। সব দিক দিয়ে জড়িয়ে ভারতের সর্ব্বপ্রথম সার্থক সবাক ছবি হ'ল এইটি। দেবকীকুমার বসুর অদ্ভুত প্রতিভাবলেই সম্ভব হয়েছিল এই আপাত-অসম্ভব কাজ। কি অভিনয়ে, কি গানে, কি কাহিনীর আবেদনে, কি ছবির সামগ্রিক গতিতে—সমস্ত দর্শক পাগল হ'য়ে উঠেছিল। কেউ কল্পনা করতে পারে নি আমাদের দেশে এ ধরণের ছবি সম্ভব হতে পারে! দর্শকের ভিড়ে ভেঙে পড়েছিল এই ছবিঘর, সমস্ত রাস্তায় জনতা আর টিকিটের জন্য আকুতি! টিকিটের ঘর খোলার আগে থেকে হাজার হাজার দর্শক ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতো টিকিট কিনতে, হতো মারামারি, খণ্ডযুদ্ধ, লোকের মাথার ওপর দিয়ে লোকে হেঁটে চলে যেত টিকিট কিনতে!

লোকে ছবি দেখত। উমাশশীর জন্য রোজ চোখের জল ফেলে চলে যেত তারা, আবার আবার আসত ছবি দেখতে, গান শুনতে। প্রত্যেকটি গান কলকাতা সহরের প্রত্যেকের মুখে মুখে ফিরতো। গান দিয়ে যে ছবিকে দর্শকদের মনের মণিকোঠায় তুলে দেওয়া যায়, তাই দেখিয়ে দিয়ে গেল এই ছবিটি। কলকাতা সহরের সমস্ত 'রেকর্ড' ভেঙে দিয়ে ছবিটি অপ্রতিহত গতিতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ এগিয়ে চললো। এই দিন থেকে আমরা হ'য়ে গেলাম অন্য ভাইদের ঈর্ষার বস্তু!

কিন্তু এই তো সবে সুরু। তার পরেই এল আর একটি ছবি 'মীরাবাঈ'! সে-ও এক বিচিত্র অনুভূতি। দুর্গাদাস-চন্দ্রাবতীর জুটি সকলকে অভিভূত করলো, সকলে কাঁদলো চন্দ্রার কণ্ঠে মীরার অপূর্ব্ব ভজন শুনে। এ-ও দেবকী বসুর আর এক সৃষ্টি! এ ছবিরও চলার যেন আর শেষ নেই। 'চণ্ডীদাস' আমাদের যে আভিজাত্য সৃষ্টি করে দিয়ে গেছলো তারই উত্তর-সাধক হ'য়ে দেখা দিল এই ছবিটি। আজ মনে পড়ে, এই ছবিতে পাহাড়ী-মলিনা ছোট ছোট ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এর মধ্যে গেছে 'কপালকুণ্ডলা', 'রূপলেখা'। তারপর সমগ্র ভারত-বর্ষের আজও পর্য্যন্ত সবচেয়ে জনপ্রিয় ছবি 'দেবদাস'। এই ছবিটির কথা কি বলা যায়, না ভোলা যায়! সে কি উত্তেজনা আর উদ্দীপনা! সমস্ত কলকাতা ভেঙে পড়েছে আমাদের ছবিঘরে—দেবদাস-পার্ব্বতীর জন্য সকলে কেঁদে আকুল, সকলের মুখে ঘুরে ফেরে শুধু এদের দুজনেরই কথা, সকলের মুখে সায়গলের কণ্ঠের দুটি গজল গান, অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র অমর সঙ্গীত! আজ সকলে হাসে, কিন্তু 'ও তোর মরণ' গানটিও কি সকলে প্রাণের আবেগে সব জায়গায় গায় নি?

অথচ শুনি শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় নাকি এ ছবি সম্বন্ধে একেবারেই আশা রাখেন নি। তিনি নাকি ভেবেছিলেন, এই ছবিটির মুক্তি হ'লে দর্শকে চেয়ার আস্ত রাখতে আর কিছু রাখবে না। আজ হাসি পায়! শুধু এই একটি ছবি নিউ থিয়েটার্স তুলে গেলেই ভারতের চল-চ্চিত্রেতিহাসে চিরকালের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে যেতে পারতো।

আমরা তাকিয়ে দেখতাম, সে যুগের ছেলেরা বড়ুয়া-সার্ট, বড়ুয়া-কোট পরে বুক ফুলিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে, আর আমরা হাসতাম। গর্ব্বে বুক ভ'রে উঠতো!

তারপর এলো 'ভাগ্যচক্র'। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রশিল্পীর বাঙলা ছবির প্রথম পরিচালনা। এ ছবিটিও জন-সাফল্যে সম্বর্দ্ধিত হয়ে উঠলো। পাহাড়ী সান্যালকে প্রথম নায়কের ভূমিকায় দেখা গেল; ভারতের মধ্যে প্রথম এই ছবিতেই 'প্লে-ব্যাক' পদ্ধতিতে গান গাওয়া হয়। প্রত্যেকটি গানই লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে।

নিউ থিয়েটার্স আর 'চিত্রা'র তখন কি প্রতাপ আর সম্মান। কোনও ছবি বাদ যায় না যা জনপ্রিয় হয় না, এমন গান ছবিতে থাকে না যা লোকে না গেয়ে থাকতে পারে!

'মায়া', 'গৃহদাহ', 'দিদি',—একটির পর একটি ছবি নিউ থিয়েটার্স থেকে বার হয়ে আমাদের এখানে আসছে আর জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে যাচ্ছে। কৃষ্ণচন্দ্র দে'র কণ্ঠ-সম্পদ কমতে লাগলো তো এলেন সায়গল—কণ্ঠ-মাধুর্য্যে আজও যিনি সারা ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আর তাঁর সঙ্গে ভারতের প্রথম গ্ল্যামার-গার্ল লীলা দেশাই। সে যুগের দর্শকের মনে এঁরা দুজন যে কি বিপ্লব এনেছিলেন—তা আজ আর বলা যায় না!

১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস। মুক্তিলাভ করলো বড়ুয়ার 'মুক্তি'। কাননবালাকে দেখা গেল আলট্রা-মডার্ণ একটি গ্ল্যামার-গার্ল হিসাবে। তাঁর অভিনয় ও কণ্ঠ-মাধুর্য্যের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া গেল এ ছবিতে। পঙ্কজ মল্লিককেও দেখা গেল একটি ভূমিকায়, শোনা গেল তাঁর অপূর্ব্ব কণ্ঠের কয়েকটি মধুর গান। গানের এত জনপ্রিয়তা বুঝি আর কোনও ছবিতে হয় নি। এই ছবিটির জন-প্রিয়তার মূল কারণ পঙ্কজ মল্লিক এবং তার পরে কানন ও প্রমথেশ বড়ুয়া। কী অদ্ভুতভাবে অভিনন্দিত হয়েছিল এ ছবিটি!

অথচ এ সম্বন্ধে একটি মজার গল্প চলতি আছে: শুভ-মুক্তির ঠিক আগে বড়ুয়া সাহেব ছবিটি দেখে নাকি এত হতাশ হয়েছিলেন যে, সরকার সাহেবকে একটি চিঠি লিখেছিলেন: I am extremely sorry for the picture. Hope to compensate you in my next. এবং ছবিটির ব্যর্থতার লজ্জার হাত থেকে আত্ম-রক্ষার জন্য বিলেতে চলে গেছিলেন। ছবিটির অসাধারণ জনসমাদরের পর তাঁর সহকারী ফণী মজুমদার কেবল্ করেন এবং তারপর ফিরে আসেন বড়ুয়া সাহেব।

'বিদ্যাপতি' ছবিটি আবার সারা ভারতে অভূতপূর্ব্ব

সাড়া আনলো। কানন দেবী সমগ্র ভারতের জনপ্রিয়া তারকা বলে পরিচিত হলেন। সে কি অভিনয়, আর সে কি গান! দুর্গাদাস, পাহাড়ী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, অমর মল্লিক, কানন, ছায়া দেবী, দেববালা, লীলা দেশাই—কি তারকা-সম্মেলন।

একা সায়গল নয়, এবারে এলেন তাঁর সঙ্গে পঙ্কজ মল্লিক। এঁদের নিয়ে বাঙলার চিত্রশিল্পেতিহাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তারকা-সম্মেলন দেখা গেল নীতিন বসুর 'দেশের মাটি' ছবিতে। উমাশশী, চন্দ্রাবতী, দুর্গাদাস, সায়গল, পঙ্কজ মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক—আর সায়গল, পঙ্কজ মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে ও উমাশশীর কণ্ঠের সঙ্গীত-সম্পদ! ছবিটি মুক্তিলাভ করেছিল ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ সালে। ৩রা ডিসেম্বর এল ফণী মজুমদারের পরিচালনায় তোলা 'সাথী'। একসঙ্গে প্রথম দেখা গেল সায়গল ও কাননকে। গানে গানে ছবিটি ভ'রে উঠলো।

এইভাবে চললো নিউ থিয়েটার্সের অপ্রতিহত জয়যাত্রা। 'অধিকার', 'সাপুড়ে', 'জীবন-মরণ', 'ডাক্তার', 'নর্ত্তকী', 'পরিচয়', 'মীনাক্ষী'!

ভাঙন লাগলো নিউ থিয়েটার্সে। কুশলী পরিচালকের ধীরে ধীরে চলে যেতে সুরু করলেন। গেলেন দেবকীকুমার বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া, ফণী মজুমদার। নীতিন বসুও 'কাশীনাথ' ছবিটি শেষ করে চলে গেলেন। সুরু হ'ল নতুন দলের যাত্রা! হেমচন্দ্র চন্দ্রের 'প্রতিশ্রুতি' ১৯৪১ সালের ১৪ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার মুক্তিলাভ করলো—অসাধারণ জন-সম্বর্দ্ধনা লাভও করলো। কিন্তু তারপর আর কোথায়?

জয়-গৌরবের যে উত্তুঙ্গ শিখরে আমরা উঠেছিলাম, তার ভিত্তিতে ভাঙন ধরেছে। নড়বড় করছে আমাদের আভিজাত্য; শেয়ার মার্কেটে সর্ব্বস্ব-হারা লোকের যে দুর্দ্দশা হয়, আমাদেরও তখন সেই অবস্থা। চাল আছে, চুলো নেই। গায়ে সিল্কের জামা আছে, পেটে ভাত নেই। কোনও ছবির মুক্তির প্রথম দিনে নিউ থিয়েটার্সের ছবি দেখতে লোকে ছুটে আসে—কিন্তু আভিজাত্য দেখে, তাদের প্রাণ আর ভরে না। চেয়ার শূন্য থাকে—কারও উষ্ণ স্পর্শ পায় না।

কিন্তু আভিজাত্যের কি দাম নেই, দাম নেই এত দিনের ঐতিহ্যের, এত শিক্ষা আর ত্যাগের? তাই যখন অবস্থা চরম সীমায় এসে পড়ে, তখন আসে এক একটি যুগান্তকারী ছবি। এইভাবেই এসেছে 'উদয়ের পথে', এসেছে 'রামের সুমতি' আর আজ 'মহাপ্রস্থানের পথে'।

যুগ বদলেছে, মানুষের রুচি বদলেছে—কিন্তু আমাদের আভিজাত্য যায় নি। আমাদের ছবি দর্শকে মনে নেয় না, তবুও তো দর্শকদের মন চুরি করার জন্য 'ষ্টাণ্ট' দিতে পারি না। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তো বাধে। আমাদেরই ছবিতে নূতন নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখা যায়।

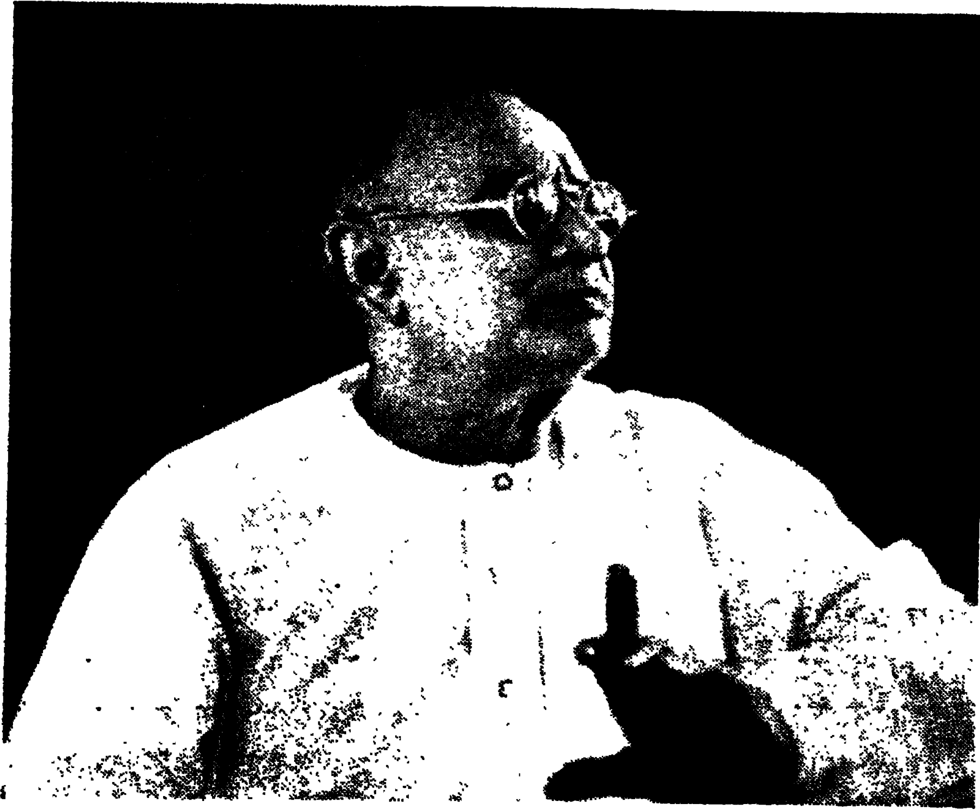
তাই দিনের পর দিনের নিঃসঙ্গতার পরও মাঝে মাঝে যখন আবার দর্শকের ভিড়ে সমস্ত চিত্রগৃহ সচকিত হ'য়ে ওঠে, মনে প'ড়ে যায় অতীতের কথা। কিন্তু কাকেই বা বলবো সে কথা! গভীর রাতে এই ঘরে আমরা সবাই মুখোমুখি বসি আর অতীত রোমন্থন করি!

আবার আসবেন আপনি। আপনার মত দু' একজনের সঙ্গে কথা বলেও আনন্দ হয়! আজ আর বেশী নয়! ভোর হ'য়ে এসেছে!

নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার

অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলের সাহস তো বড় কম নয়! এই এত অল্প বয়সে লুকিয়ে লুকিয়ে থিয়েটার দেখবে। স্কুলে পড়ে, কোথায় মন দিয়ে লেখা-পড়া করবে তা নয়—খালি রোজ রোজ থিয়েটারে যাওয়া। বাড়ীশুদ্ধ লোক অস্থির হয়ে উঠেছে—না, এ বন্ধ করতে হবেই। তাছাড়া আর একটা কথা—ছেলেটি পয়সাই বা পায় কোথা থেকে? আর এমনি মজা যে, ছেলেটি তার ঘরের সামনে এমনভাবে জুতো রেখে যাবে যেন ঘরেই আছে। টেবিলের ওপর বই খোলা, যেন পড়তে পড়তে কোথায় উঠে গেছে। ছেলেটির পিতা খুব বড় জ্যোতিষী। কোষ্ঠী দেখে বলেন, বাধা দিলে হবে কি? ও একজন মস্ত অভিনেতা হবে। ছেলেটির থিয়েটার দেখার সঙ্গী হয় তারই একজন বন্ধু ও ভাই। একদিন হয়েছে কি, থিয়েটার দেখতে গিয়ে ছেলেটির টিকিট-এর দাম কম পড়েছে। ছেলেটি অনুনয়-বিনয় করে "আমায়



রঙ্গভূমি ভালোবাসি হৃদে সাধ রাশি রাশি
আশার নেশায় করি জীবন যাপন

আলোকচিত্র : শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

প্রেক্ষাগৃহে ঢুকিয়ে দিন, পয়সা কাল দিয়ে যাব।" বুকিং অফিসের বাবু কথা শুনলে না, নিয়ে গেল তাকে অধিকারীর কাছে।

একজন ভদ্রলোক ঘরে চেয়ারে বসে, মুখে গড়গড়া। আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন রীতিমত। এতটুকু ছেলে থিয়েটার দেখতে এসেছে।—হ্যাঁ, খোকা, তুমি পয়সা পাও কোথা থেকে ?

ছেলেটি মাথা নীচু করে বলে—স্কুলের টিফিনের পয়সা জমিয়ে থিয়েটার দেখতে আসি।

ভদ্রলোক গড়গড়া থেকে মুখ তুলে বলেন—না খেয়ে, থিয়েটার দেখতে এসেচো। যাও বাড়ী যাও, পয়সা বাড়ীতে গিয়ে ফেরৎ দেবে। এত অল্প বয়সে পড়াশোনা না করে থিয়েটার দেখতে এসেচো। যাও বাড়ী যাও।

ছেলেটি মুখ নীচু করে চলে এল। এখন সেই সঙ্গী ভদ্রলোক বলেন—তখন তো জান না রসরাজ, গোকুলে কে বাড়চে।

এই ছেলেটিই হচ্ছেন—নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

১৯২৯ সালের ১৫ই জানুয়ারী—বর্ত্তমান "শ্রী" তখন কর্ণওয়ালিস থিয়েটার নামে খ্যাত। ম্যাডান কোম্পানী বাড়ীটিকে আমূল সংস্কার করে থিয়েটার খুলছেন। সকাল থেকেই বুকিং অফিসে ভীড়—হ্যাঁ, মশাই, একজন শিক্ষিত অধ্যাপক নাকি আজ বেতনভোগী হয়ে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে যোগদান করছেন, সত্যি নাকি ?

সকাল থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। সকলের মনেই একটা সন্দেহ এবং একটা কিরকম যেন ভাব। একটা অধ্যাপক, শিক্ষিত লোক শেষ পর্য্যন্ত থিয়েটারে যোগ দিলে।

সন্ধ্যায় ভেঙে পড়লো লোক। কি অসংখ্য জনতা। বেশীর ভাগ লোকই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়।

এই সময় (১৯২০-২১) দেশে জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব। হিন্দু-মুসলমানের মিলনকে বিষয়বস্তু করে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 'ভীমসিংহ' নাটক নিয়ে আসেন। এটাকেই বহুলাংশে বদল করে 'আলমগীর' নাটক মঞ্চস্থ করা হয়।

শিশিরকুমার নিজে বলেছেন—এই নাটকের অভিনয় দর্শকদের মনে এক অদ্ভুত সাড়া এনে দেয়। এমনকি অভিনয়ের পরও অগণিত দর্শক উন্মুক্ত মাঠে (শ্রী) সমবেত হয়ে নাটক সম্বন্ধে নানাবিধ আলাপ-আলোচনায় মত্ত হ'ন।

'সেদিন কিন্তু একমাত্র "বিজলী" ছাড়া অন্য কোন পত্রিকাতেই সে-অভিনয়ের উল্লেখ ছিল না।' এটা কিন্তু শিশিরকুমার অভিমান ভরে বলেন।

'আলমগীর' যুগান্তর আনলে হবে কি ? তাঁর সমানে ঝগড়া চলেছে পার্শী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। শিশিরকুমার বলেন—"এ্যারে, তারা এসেছে ব্যবসার খাতিরে, সস্তার জিনিষ আর জাঁকজমক পোষাক দেখিয়ে বাঙালীকে ভোলাতে। তা নাহলে মনে ক'রো 'আলমগীরে' সাধারণ ছোট রাজপুত জমিদার—তার সাধারণ দৃশ্যপট দেখে বলে—ইয়ে কিয়া হুয়া। সোনা ফলাও, লাখ লাখ রূপায়া আমাদের খরচা করনে ইয়ে কিয়া হুয়া। অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ টাকা মূলধন, সেখানে সাধারণ দৃশ্যপট! সেদিনই বুঝেছিলাম এখানে আমার চলবে না।"

সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে এই যে, স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "সীতা" নিয়ে নিজে দল গঠন করে নামতে মনস্থ করলেন। কিন্তু অনিবার্য্য কারণবশতঃ এই নাটক অভিনয় করা সম্ভব হয় না। তখন তিনি স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে দিয়ে "সীতা" নাটক লিখিয়ে অভিনয় করেন। প্রকৃতপক্ষে নাটকটি শিশিরকুমারের। এই নাটকটির সঙ্গে শিশিরকুমারের অন্যতম অন্তরঙ্গ ৺ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুকবি হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রভৃতি যুক্ত ছিলেন।

সত্যি কথা বলতে কি এমন সুন্দর অভিনয় সমস্ত কুশীলবদের, রুচিসম্মত পোষাক, সুলিখিত দৃশ্যপট, অপূর্ব্ব সঙ্গীত প্রভৃতির যোগাযোগ বর্ত্তমানে দেখা যায় না। সঙ্গীতে সুর দেন স্বর্গীয় গুরুদাসবাবু। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ

করেন নৃপেন মজুমদার ও ৺বঙ্কিম দে। কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের গান এমন এক অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করেছিল যা বর্ত্তমানে দুর্লভ।

'সীতা' নাটকের শেষদৃশ্যে প্রথম প্রথম রঙ্গমঞ্চে একশো জন করে লোক নামতেন। প্রসাদ রায় 'বসুমতী'তে লিখেছেন—"যে এঁরা শুধু কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকতেন না, অভিনয় করতেন, কথা বলতেন।" সুনিয়ন্ত্রিত জনতার দৃশ্যে শিশিরকুমারের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। নব-নাট্য আন্দোলনের যুগ-প্রবর্ত্তক ডিউকের মেনিনজেন ও জনতা ও কাটাসৈনিকের ভূমিকাকেও উপেক্ষা করতেন না।

শিশিরকুমারের 'সীতা' নাটক সম্বন্ধে আরও অনেক কল্পনা ছিল। তাঁর মুখে শুনেছি, তিনি কল্পনা করেছিলেন যে শেষ দৃশ্যে সীতা পাতাল প্রবেশ করে প্রেক্ষাগৃহের মাঝখান থেকে বার হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কিন্তু তার জন্য রঙ্গমঞ্চকে (সেইরকম) বিশেষভাবে তৈরী করা প্রয়োজন এবং বাড়ীওয়ালা যদি সাহায্য না করে তো সম্ভব নয়। তাই তো তিনি বলেন—"নিজের রঙ্গমঞ্চ না হলে কিছু সম্ভব নয়। বাড়ীওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করবো, না এইগুলো করবো।"

অধুনা "শ্রী"—'নাট্য মন্দির' নাম গ্রহণ করে বাংলার নাট্যশালার ইতিহাসে এক দান রেখে গেছে। এখানেই শিশিরকুমার সগৌরবে শিক্ষিত নট-নটী নিয়ে একাধিক নাটক মঞ্চস্থ ক'রে দিনের পর দিন বিস্ময়ের সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁর হাত থেকে ভাল ভাল নাটক বেরিয়েছে, ভাল ভাল নাট্যকার সৃষ্টি হয়েছেন, উচ্চশ্রেণীর নট-নটী তৈরী হয়েছেন। এখানে একটা কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে যৌবনে 'আলমগীর' নাটকের নাম-ভূমিকায় শিশিরকুমারের প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে প্রথম অবতরণ আর মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের নাটকে বৃদ্ধ মহর্ষি বাল্মিকীর ভূমিকায় প্রথম

অবতরণ। যৌবনে দুজনের প্রথম অবতরণ যুদ্ধের ভূমিকায় যার ফলে নাট্যজগতে মনোরঞ্জন 'মহর্ষি' নামে খ্যাত।

তখনকার দিনে প্রায় সমস্ত রাত্র ধরে অভিনয় হ'ত। এক একটা নাটক প্রায় ৫।৬ ঘন্টা ধ'রে চলতো। আমার মনে হয় এবং অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যও এ কথা বলেছেন যে 'শঙ্খধ্বনি' নাটক তিনি মঞ্চস্থ করেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে। এটি ছিল দু-ঘন্টার নাটক। বোধ হয় এমন দিন আসবে যে লোকে ধৈর্য্য ধরে আর ৫।৭ ঘন্টা বসে নাটক দেখবে না। এই এক্সপিরিমেন্টটাই বোধ হয় তিনি করেছেন। নাটকটি তাই ছোট হওয়ার দরুন চলে নি। বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের যুগে আলোক এবং দৃশ্যপটের অনেক উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও একথা বলবো যে 'শঙ্খধ্বনি' নাটকের দৃশ্যের মত দৃশ্য বর্ত্তমানে কোথাও দেখিনি। দোল-খেলা হচ্ছে তার বিভিন্ন রং-এর দৃশ্য, রঙ্গমঞ্চে বৃষ্টি হচ্ছে তার দৃশ্য এসব এখন কল্পনাও করা যায় না। হয়তো রঙ্গমঞ্চের অনেক উন্নতি হয়েছে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে কিন্তু একথা আমি জোরের সঙ্গেই বলবো যে দিগ্বিজয়ী, ভীষ্ম, সীতা, নর-নারায়ণ, শঙ্খধ্বনি, তপতী, প্রভৃতি নাটকের মতো দৃশ্যপট ও সাজ-পোষাক বর্ত্তমানে কোথাও দেখি নি।

রঙ্গজগতে শিশিরকুমার এক যুগের সৃষ্টি করেন। কিন্তু 'শরৎ-শিশির' প্রতিভা আর 'রবীন্দ্র-শিশির' প্রতিভার যোগাযোগ যেমন বিস্ময়কর তেমনি উল্লেখযোগ্য।

'দেনা পাওনা' নাটক নাটকায়িত হয়ে 'ষোড়শী'তে দাঁড়ায়। শিশিরকুমার শরৎবাবুকে বলেছিলেন যে 'জীবানন্দ'কে মারতে হবে। অত বড় একটা দুর্দ্দান্ত জমিদার নিষ্কর্মাভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। ষোড়শীর সঙ্গে স্বামীরূপে চলে যাওয়াও যা বেঁচে মরে থাকাও তা। শিশিরকুমারের সঙ্গে তাঁর বন্ধু সুধা মুখোপাধ্যায় দেনা পাওনার রূপ দেন। অথচ কোন জায়গায় এর উল্লেখ নেই।

নাচঘর (৪র্থ বর্ষ—১২শ সংখ্যা)—'ষোড়শী'র জীবানন্দকে দেখলে স্বয়ং জীবানন্দের স্রষ্টাই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়বেন। কারণ শিশিরকুমার হয়তো স্রষ্টার মানস-কল্পনাকে অতিক্রম করেছেন। এঁর শক্তি ও কলাজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান এই জীবানন্দের ভূমিকায় দেখেছি।

'পল্লীসমাজ' নাটকটি প্রথমে স্টারে অভিনীত হয় তবে তা' সাফল্যলাভ করতে পারে নি। শরৎবাবু শিশিরবাবুর শরণাপন্ন হ'ন। শিশিরবাবু নাটকটিকে অদলবদল করে 'রমা' নাম দিয়ে মঞ্চস্থ করেন। এই নাটকে রমেশের ভূমিকায় শিশিরকুমার, গোবিন্দ গাঙ্গুলী-র ভূমিকায় যোগেশচন্দ্র, আকবর সর্দ্দাররূপী জীবন গাঙ্গুলী, রমার ভূমিকায় প্রভা দেবীর আর জ্যাঠাইমার ভূমিকায় কঙ্কাবতীর স্মরণীয় অভিনয় আজও চোখের সামনে ভাসছে।

নবনাট্যমন্দিরে শিশিরকুমার 'বিরাজবৌ' নাটকটির নিজে নাট্যরূপ দিয়ে নবনাট্যমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। নীলাম্বরের ভূমিকায় 'মা—রান্না হয়ে গেছে' আজও কানে বাজে।

শান্তশীল গোস্বামীর "শিবহে" নৃত্যসহযোগ গানটি এখনও স্মরণীয় হয়ে আছে। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন যে, এটা শিশিরকুমারেরই কল্পনা-প্রসূত। 'God makes sport of us when we die'—গ্রীক নাটকে এই রকম দেখা যায়।

তারপর সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে "বিজয়া"। শিশিরকুমার, বিশ্বনাথ, শৈলেন, আর কঙ্কা-র সম্মিলিত অভিনয় খুবই কম দেখা যায়। সেই সময় 'নাচঘর' মন্তব্য করেছিলেন—'শিশিরকুমার যেন একটি জীবন্ত গ্রামের ছেলে ('পরেশ')-কে রঙ্গমঞ্চে ছেড়ে দিয়েছেন।'

শিশিরকুমারের 'শ্রীরঙ্গম' প্রেক্ষাগৃহের ওপরে তাঁর নিজের ঘরে জোর আড্ডা। 'বিপ্রদাস' সম্বন্ধে কথা হচ্ছে। অনেকে বললেন—এ-নাটক চলবে না।

যেখানে বাধা সেইখানেই আগ্রহ শিশিরকুমারের। বিপ্রদাস বইটির ওপর লিখেছিলেন—এ নাটকের অভিনয় আমি করবো এবং এটা চলবে।

এই উপন্যাসটিকে নাটকায়িত করেন প্রথমে তারক মুখোপাধ্যায়। কিন্তু পরে মনোরঞ্জনবাবুর অনুরোধে বিধায়ক ভট্টাচার্য্য নাট্যরূপ দেন এবং মহাসাফল্যের সঙ্গে তা' অভিনীত হয়।

ঠিক এমনিভাবেই কিন্তু চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন

বিদুর ছেলে'কে নাটক করে। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, তিনি নিজে না নেমে, তাঁর হাতের-তৈরী নট-নটীদের দিয়ে অভিনয় করিয়েছেন।

'বিপ্রদাস' অভিনয়ের সময়ে শিশিরকুমার মাঝে মাঝে দেওঘরে যেতেন। একদিন বৃহস্পতিবার অভিনয়ের আয়োজন হয়েছে। সেদিন তিনি রাত্রে রওনা হবেন। উইক-এণ্ডের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে 'বিপ্রদাস'। সেদিনও কি বিক্রী! শিশিরকুমার শিশুর মত সারল্যের হাসি হাসলেন বললেন—প্রলয় ঘটালে দেখছি।

সমস্ত নাটকেই শিশিরকুমারের বিশেষ বিশেষ নিজস্ব নাটকীয় ইঙ্গিত আছে। 'রাসবিহারী'র সর্ব্বশেষ সংলাপ, জীবানন্দের মৃত্যু, "রিজিয়াতে" ঘাতকের মৃত্যু এবং শেষদৃশ্যের সংলাপ শিশিরকুমারের নিজের দেওয়া। ভীমসিংহ—রূপান্বিত হ'ল "আলমগীর"-এ।

এইজন্যই গিরিশযুগে যে যে নাটক অভিনীত হয়েছে শিশিরযুগেও তাঁর হাতে সেই নাটকগুলি নূতনভাবে অভিনীত হয়েছে এবং যুগের সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, জনা, বলিদান, প্রফুল্ল, সাজাহান, পুণ্ডরীক, অশোক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

'প্রফুল্ল' নাটক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন—সবই বুঝি, কিন্তু তাঁর 'হাইটটা' পাবো কোথায়। এই ছ'ফুট লম্বা চেহারা' তার তো একটা দাম আছে।

শিশিরকুমারের ইঙ্গিতে লেখা হয় "মহাপ্রস্থান"। শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রস্থান নয়, একটা যুগের মহাপ্রস্থান। রচনা করেন সত্যেন গুপ্ত। তাই নাট্যকার লিখেছেন—

তোমার মর্মের কথা
লিখিয়াছি আমি
আর কেহ নাহি জানে
জানে অন্তর্যামী

দর্শক ও মঞ্চের মধ্যে একটা যোগাযোগ শিশিরকুমার সব সময়ে উপলব্ধি করেছেন। তাই 'শেষ-রক্ষা'র শেষ-দৃশ্যে দর্শক ও অভিনেতারা এক সঙ্গে মিশে যান। এটাই পূর্ণ রূপ পায় 'রীতিমত নাটকে'। যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন যে এই নাটকে অভিনেতারা যখন দর্শকদের সঙ্গে বসে দর্শক হিসাবে অভিনয় করেন এবং নাট্যাচার্য্য স্বয়ং "বক্স" থেকে অভিনয় দেখেন তখন প্রথম প্রথম সেটা মহাআশ্চর্য্যের ব্যাপার ব'লে মনে হ'তো। একজন অভিনেতার মুখে শুনেছি যে তিনি যখন 'রীতিমত নাটকে' রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের সঙ্গে যোগাযোগের কথাটা বলেন তখন সকলেই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে কি করে সম্ভব হবে। কিন্তু তিনি কিছুমাত্র হতাশ না হয়ে ছক এঁকে সমস্তটা এমনভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে জিনিষটা সোজা হয়ে গেল। তারপর থেকেই শিশিরকুমারের অনুকরণে নাটকাভিনয়ের ধারা অপরাপর রঙ্গমঞ্চও গ্রহণ করেছে।

'রীতিমত নাটকে' 'প্রফেসর দিগম্বর' চরিত্র এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই নাটকে তাঁর পরিচালনা 'সীরাজদৌল্লার' সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

যে কথা বলছিলাম। সমস্ত নাটকেই শিশিরকুমারের একটা ধারা আছে—আভিজাত্য আছে যেটা তাঁর পরিচালনায় চোখে পড়ে। যাঁরা 'বিপ্রদাস' দেখেছেন তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন যে শিশিরকুমার যখন 'বিপ্রদাস' নাটক নিজে অভিনয় করেন, তখন তাঁর বিশেষ বিশেষ নাটকীয় ইঙ্গিত চোখে ধরা পড়ে। "সতী" বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বাড়ীর লক্ষ্মী বিদায় নিচ্ছে। তাই এই দৃশ্যে দেখলাম সিঁদুর, আলতা দিয়ে মঙ্গলকামনা করে তাকে বিদায় দেওয়া হচ্ছে। এইসঙ্গে দেখলাম দ্বিজদাসকে। সতী তার কতখানি ছিল অথচ সতী হঠাৎ চলে গেল। তাই এই দৃশ্যে দ্বিজদাসের সঙ্গে "সতীর" একটা বোঝাপড়া এবং প্রণাম করতে গিয়ে কপালে আলতার দাগ লাগায় নাটকটির সৌন্দর্য্য অনেকখানি বর্দ্ধিত হয়েছিল।

'বসন্তলীলা' সম্বন্ধে হেমন্তকুমার বলেছেন যে 'বসন্তলীলা' খাঁটি গীতিনাট্য এবং শিশিরকুমার এই ধারাটি প্রথম প্রচলিত করেন। শিশিরকুমারের "আলমগীর" তাঁর যৌবনের শ্রেষ্ঠ দান, যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই বুঝবেন যে বর্ত্তমানে বার্দ্ধক্যের 'আলমগীর' কিভাবে রূপ পেয়েছে। একে বলে ছাঁচে-ঢালা। বার্দ্ধক্যের ছাঁচে তিনি 'আলমগীর'কে ঢেলেছেন। তখন ছিলেন অসীম শক্তিসম্পন্ন যুবক, এখন বৃদ্ধ। বার্দ্ধক্যের প্রাণ থেকে বার হওয়া কথা—"আমার দ্বারা সাম্রাজ্য শাসন আর চলে না।" রুগ্ন আলমগীর শয্যা ত্যাগ করে এসে অসুস্থ অবস্থায় দিলিরের সঙ্গে কথা বলছে—বর্ত্তমানে তিনি এই দৃশ্যটিকে কিভাবে বার্দ্ধক্যের রূপ দিয়েছেন তা যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই বুঝবেন।

শিশিরকুমার সেদিন বলেছিলেন—"বাঙ্গালীর রুচিবোধ অনেক বদলে গেছে। সেদিন যে জিনিষকে আদর করে নিতো আজ আর তা নেয় না।"

এটা তিনি 'ষোড়শী'র অভিনয় সম্পর্কে বলেছেন। কারণ 'ষোড়শী'র আর পূর্ব্বের মত জনপ্রিয়তা নেই বলে লোক হয় না। তাই তিনি বললেন—নাট্য-মন্দিরে যখন রুশরা "ষোড়শীর" অভিনয় দেখতে আসে তারা আশ্চর্য্য হয়েছিল যে রাশিয়া যা এখন চিন্তা করছে শরৎচন্দ্র অনেক পূর্ব্বেই তা চিন্তা করে গেছেন। জমিদারী যায়, মহাজন ক্যাপিটালিষ্ট যায়, যাকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্নরূপে লোকেরা গ্রহণ করেছে দেবী ভৈরবী তাকে শাড়ী পড়ে 'স্বামী' বলতে হয় কিন্তু থেকে যায় জমি আর প্রজা। সাগরসর্দ্দার তাই বেঁচে থাকে মরে না।

কিন্তু শিশিরকুমার আজও আশাবাদী। তিনি বলেন—"হ্যাঁ, চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংঘাতের ফলেই মঞ্চের এই অবস্থা অনেকে বলে থাকেন। কিন্তু এটা সাময়িক। ইংলণ্ডেও এক সময় তা' রঙ্গমঞ্চকে আঘাত হেনেছিল কিন্তু বিলীন হয়ে যায় নি। আজ সেখানকার মঞ্চ তার বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে আবার পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে।"

তিনি বলেন—"অভিনেতা কালের সাক্ষী" রঙ্গমঞ্চ একমাত্র স্থান যেখানে সমস্ত কলার সমন্বয় ঘটে।

১৯৪২ সালে শিশিরকুমার "শ্রীরঙ্গম" খোলেন। তখন থেকে তিনি একভাবে অভিনয় করে আসছেন এবং এখনও করছেন। শিশিরকুমার তারাকুমার মুখোপাধ্যায় নামে এক স্কুল মাষ্টারের নাটক "জীবন-রঙ্গ" নিয়ে শ্রীরঙ্গমের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছিলেন। "জীবন-রঙ্গ" নাটকখানি চলে নি। শিশিরকুমার বলেন 'জীবন-রঙ্গ' নাটকখানি 'মাস'-এর জন্য নয় ক্লাস-এর জন্য, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য। তাঁর অভিনীত আর একখানি স্মরণীয় নাটক হলো 'মাইকেল মধুসূদন'। মাইকেল-এর মতো জিনিয়াসের চরিত্র যথাযথ রূপ পেয়েছে জিনিয়াস শিশিরকুমারের হাতে। মাইকেল চরিত্রটির এমন উপলব্ধি এবং নিখুঁত পরিবেশন শিশির-প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। নাটকটির প্রথম অঙ্কে পিতা-পুত্রের মর্ম্মান্তিক সংঘাত যে রূপ পেয়েছে তা বর্ণনাতীত। অভিনয়ের পর ডাঃ সুনীতিকুমার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং এই দৃশ্যটি বাদ দিতে নিষেধ করেন, কারণ অনেকের মত ছিল যে এই দৃশ্যটি মেলোড্রামাটিক এবং এর সার্থকতা নেই। এই নাটকটির বিশেষত্ব হলো শিশিরকুমারের মুখে বিভিন্ন আবৃত্তি। এর পর আরেকখানি উল্লেখযোগ্য নাটক—'দুঃখীর-ইমান'।

তুলসী লাহিড়ী রচিত এই নাটকখানি মঞ্চস্থ ক'রে শিশিরকুমার নাট্যজগতে এক নূতনের ইঙ্গিত করেছেন। যুদ্ধের পটভূমিকায় রংপুরের এক থানার ঘটনাকে কেন্দ্র

ক'রে তুলসীবাবু অনেক পরিশ্রম ক'রে এই নাটক লেখেন। অনেক চেষ্টা করেন নাটকটির অভিনয়ের জন্য। কিন্তু সফল কাম হ'ন না। গ্রাম্য-দৃশ্য, নায়ক-নায়িকা, চাষা-চাষী—কে সাহস করে এই নাটকটি নেবে? শেষে তিনি শিশির-কুমারের দ্বারস্থ হলেন। গতানুগতিক একঘেয়ে থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের এবং নূতন ধরণের রচনার সন্ধান পেলেন শিশিরকুমার। এই নাটকটিতে এক্সপেরিমেন্ট করা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। কারণ তিনি রঙ্গমঞ্চে ব্যবসা করতে আসেন নি। তিনি নাটকটি পড়ে অদল-বদল ক'রে নাম দিলেন 'দুঃখীর-ইমান' এই সময় কলকাতায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য নাটকখানি ভালভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি, কিন্তু অভিনবত্ব ছিল ব'লে এটি জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছিল।

'মায়া', 'উড়ো চিঠি', 'দেশবন্ধু', 'বন্দনার বিয়ে', 'তুলসীদাস', 'উল্কা', 'তাইতো', 'ভিখিরির মেয়ে', 'বিপ্রদাস', বিন্দুর ছেলে' প্রভৃতি নাটকও অভিনীত হয়।

'বিন্দুর ছেলে' শিশির-প্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন একথা পূর্ব্বেই বলেছি। শিশিরকুমার তাঁর এই নাট্য-নৈবেদ্য নিবেদন করেছেন সমস্ত নূতন নাট্যকারদের ভিতর দিয়ে। তাঁর অধিকাংশ নাট্যকারই নূতন।

কিন্তু 'পরিচয়' নাটকে রায়বাহাদুরের ভূমিকায় এক অদ্ভুত নাট্যরসের সঞ্চার করেন। 'পরিচয়' নাটকের নাট্যকার একবারে নূতন, তাঁর নাম জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। নাট্যকার যেমন সাহসী ও বলিষ্ঠ, শিশিরকুমারও তেমনি সাহসের পরিচয় দিলেন সেই নাটক মঞ্চস্থ ক'রে। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার একটা দিক নিয়ে এই নাটকটির মূল উপাদান রচিত। তাই প্রচার-পত্রে ঘোষিত হ'ল--

'পরিচয়'

যুগের	পরিচয়
জাতির	পরিচয়
সমাজের	পরিচয়
ব্যক্তির	পরিচয়

এই নাটকের ব্যর্থতা দেখে ৫০তম রাত্রে শিশিরকুমার বলেন—আমাদের দেশে দর্শকদের মন গেছে চীপ সেন্টিমেন্টের দিকে, তাই নতুন কিছু করতে গেলেই ব্যর্থ হই। এখন আমরা হয়েছি পিক পকেট।

এরপর আসে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'তখৎ-এ-তাউস' বা ময়ূর সিংহাসন।

শিশিরকুমার বলেন—অভিনয় জিনিষটা মানুষের স্বভাবজাত। যা নই তাই হবার চেষ্টা, পরকে অনুকরণ করা এ সমস্ত শিশুকাল থেকেই প্রকাশ পায়।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ১৯৩৩ সালে শিশিরকুমার যখন এলাহাবাদ ভ্রমণে যান তখন সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অভিনন্দন-মানপত্র দেন—সেই সময়ের কথা। শিশিরকুমার বক্তৃতা আরম্ভ করলেন—

Frankly speaking I am feeling nervous because whenever I speak I have a prompter by my side.

প্রেক্ষাগৃহ হাস্যে মুখরিত হ'ল।

বঙ্গরঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারই সর্ব্বপ্রথম অভিনয়ের ওপর প্রাধান্য দেন। নাট্যমন্দিরে তিনি শুধু নবযুগের শঙ্খধ্বনি করেন নি।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, একদিকে ভারতের নাট্য-শাস্ত্র অন্যদিকে পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণে নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমারই গিরিশচন্দ্র প্রবর্ত্তিত অভিনয়ের এই নতুন ধারাকে একেবারে বদলে দিয়েছেন। এ অভিনয় বাস্তব-মুখী। অমিত্রাক্ষর ছন্দ, কবিতা, কথোপকথনের ভিতর দিয়ে সহজ সরলভাবে প্রকাশ করা শিশিরকুমারের অন্যতম অবদান। এইখানেই যাত্রার অভিনয়-কৌশলের সঙ্গে এর মূলগত প্রভেদ।

শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বর অতি সুন্দর, ভাবব্যঞ্জক ভাবা-ভিব্যক্তিতে অসামান্য ক্ষমতাশালী, অঙ্গভঙ্গী অতি শোভনীয়, আবৃত্তিতে অতি নিপুণ। সবচেয়ে বড় কথা, একই নাটকে একাধিক বিভিন্ন ভূমিকায় বৈচিত্র্যময় স্বরচাতুর্য্য দ্বারা আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছেন। উদাহরণ দেওয়া

যেতে পারে—রঘুপতি ও দুর্জয়সিংহ 'বিসর্জনে', রমেশ ও গোবিন্দ গাঙ্গুলী 'রমা'তে, 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশ ও রমেশ, 'বন্দিনী'তে করুণাময় ও দুলালচাঁদ, 'জনা'তে-প্রবীর, বিদূষক ও নীলধ্বজ, 'সাজাহান' নাটকে সাজাহান ও ঔরংজীব, 'আলমগীরে' আলমগীর ও রাজসিংহ প্রভৃতি।

শিশিরকুমারের আর একটি স্মরণীয় অভিনয় হলো 'রিজিয়া' নাটকে 'বক্তিয়ার' ও 'ঘাতকের' ভূমিকায় অভিনয়। অনেক বিখ্যাত সমালোচকের মতে 'বক্তিয়ার' রঙ্গমঞ্চে তাঁর অভিনয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। গত ২রা ও ৩রা আগষ্ট তিনি এই বৃদ্ধ বয়সেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই বার্দ্ধক্যেও তাঁর পূর্ব্বেকার সেই 'বক্তিয়ার' কোন অংশে ক্ষুণ্ণ হয় নি। শুধু তাই নয় এত বৃদ্ধ বয়সেও এত দৈহিক শক্তির প্রকাশ অপর কারও অভিনয়ে দেখেছি বলে মনে হয় না। সেদিন দেখলাম শিশিরকুমার যেন নূতন ক'রে দৈহিক শক্তি ফিরে পেয়েছেন। রিজিয়ার সঙ্গে সংঘাতের দৃশ্যে বক্তিয়ারের কথা—'এই দণ্ডে নিষ্কাসিত অসি মম যদি দ্বিখণ্ডিত করে তব শির, কি করিতে পার তুমি সাহাজাদী'—রিজিয়ার দিকে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি আর মাঝে মাঝে অসিতে হাত দেওয়াএই—দৃশ্যটি অবিস্মরণীয়। একটা ভঙ্গীর দ্বারা হিংস্রতার, প্রতিশোধ গ্রহণের যে রূপ ফোটালেন তার তুলনা মেলে না।

'সাজাহান' নাটকে শিশিরকুমারের 'সাজাহান' শিল্পীর অনুপম সৃষ্টি--শিল্প ও সৌন্দর্য্যবোধের অপূর্ব্ব নিদর্শন। নিজে কিছু সংলাপ জুড়ে তিনি সাজাহানের চরিত্রটির সৌন্দর্য্য অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এখন একটি নাটকের অভিনয় হয় না কিন্তু এক সময়ে এই নাটকটি একটি যুগের সৃষ্টি করেছিল সেটি হচ্ছে—'সধবার একাদশী'।

নাচঘর (৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা)—শিশিরকুমারের মুখ দিয়ে নিমচাঁদের প্রত্যেকটি বচন ফুটে উঠেছিল এক একটি হীরার টুকরার মত! নিমচাঁদের অচেতন মাতলামী ও সচেতন রসনিপুণতা এবং অধঃপতনের মধ্যে ও তার আত্ম-সম্মান-জ্ঞান—এগুলি শিশিরকুমারের অভিনয়গুণে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। (সধবার একাদশী)

'প্রফুল্ল' নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে বলছেন—নবশক্তি (২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা)—শিশিরবাবুর যোগেশ—'প্রফুল্ল' অভিনয়ের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হচ্ছে তাঁর অনাড়ম্বর রিক্ততা। মঞ্চের ওপর কথা বলছেন, অঙ্গভঙ্গী করছেন, মাতাল হয়েছেন, কিন্তু তিনি যে অভিনয় করেছেন একথা আমরা মুহূর্ত্তের জন্যও অনুভব করতে পারি না।

শিশিরকুমারের অভিনয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর বাচন-ভঙ্গী ও স্বর বিক্ষেপ। সেইসঙ্গে তাঁর ইঙ্গিত কথা না বলে ভাবের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা।

অনেকেরই আজ হয়তো মনে নেই, কিন্তু আমাদের আজও মনে আছে। শিশিরকুমার অভিনীত 'বসন্তলীলা' নাটক। প্রথম গীতিনাট্য। নাটকখানির বৈশিষ্ট্য নাচ ও গানের মাধ্যমে অভিনয় করা। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুকবি হেমেন্দ্রকুমার রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রভৃতি এতে যোগ দিয়েছিলেন।

বর্ত্তমানে অনেকের হয়তো স্মরণ নেই শিশিরকুমারের একসঙ্গে দুটি বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় 'পাষাণী'তে 'ইন্দ্র' এবং 'গৌতম'। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের চরিত্র। পাশাপাশি দুটি চরিত্রের রূপদান যে কি শক্ত এবং কঠিন তা দর্শক-মাত্রেই বোঝেন। এই দুটির অপূর্ব্ব অভিনয় আজও চোখে ভাসছে। অবশ্য এখন শিশিরকুমার একই নাটকে দুটি বিভিন্ন ভূমিকায় একসঙ্গে অভিনয় করেন যেমন 'আলমগীর' ও 'রাজসিংহ', 'ঔরংজীব' ও 'সাজাহান'।

শিশিরকুমার বেশ কৌতুক করে বলেন, ট্রামে চড়ে গেলে কেউ ধরতে পারতো না যে এই লোকটিই 'আলমগীর।'

ভারতবর্ষের মধ্যে নাট্যমন্দিরের মত অত বড় রঙ্গমঞ্চ কোথাও নেই। এই এতো বড় রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করা কত কঠিন তা অনেকেই জানেন। শিশিরকুমারের 'রমা' 'দিগ্বি-জয়ী', 'তপতী' প্রভৃতি নাটকে আমরা তাঁর শক্তির পরিচয় পেয়েছি। 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে 'নাদির সার শিবির দৃশ্যে' প্রায় এক ফারলং ধরে লম্বা আর পরপর সৈনিক দাঁড়িয়ে, যাঁরা না দেখেছেন তাঁদের বোঝানো সম্ভব নয়। 'রমা'য় পল্লীগ্রামের দৃশ্য এবং রঙ্গমঞ্চের মধ্য দিয়ে গ্রাম দেখতে

দেখতে শিশিরকুমার 'রমেশে'র ভূমিকায় আসছেন তা ও এক স্মরণীয় দৃশ্য। 'দিগ্বিজয়ী' নাটকের সমালোচনা সম্বন্ধে তখনকার দিনে পত্রিকার মত—

নবশক্তি (তৃতীয় বর্ষ ৩৬শ সংখ্যা) :—"রঙ্গমঞ্চের-ওপর নাদিরের প্রতিপদক্ষেপ তাঁর মুখের একটু হাসি, চোখের সামান্য ভ্রূকুটি, আদরের ক্ষুদ্র চাপড়টি পর্য্যন্ত অর্থপূর্ণ। তার ওপর আছে শিশিরবাবুর অননুকরণীয় কণ্ঠস্বর। এই স্বরের বিচিত্রলীলার মধ্যে নাদির-চরিত্রের বিভিন্ন রূপকে তিনি যে ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তার তুলনা আমাদের অনতিসামান্য অভিজ্ঞতার মধ্যে খুঁজে পাই না।"

প্রসিদ্ধ নাট্য-সমালোচক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কাছে শুনেছি এবং তিনি বহুস্থানে বলেছেন—'পাণ্ডবের অজ্ঞাত-বাসে'র মত এমন সুন্দর টিম-ওয়ার্ক নাটকে তিনি কখনও দেখেন নি। তিনি 'আলমগীরে'র চেয়েও 'পাণ্ডবের অজ্ঞাত-বাস'কে প্রশংসা করেন বেশী। এই নাটকে শিশিরকুমার চার-চারটি ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছেন। ভীম, ব্রাহ্মণ, বৃহন্নলা ও শ্রীকৃষ্ণ।

নবশক্তি (১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা):—'পাণ্ডবের অজ্ঞাত-বাসে' মহাবলী ভীমের অসংযত শক্তিমত্ততা, লাঞ্ছিত পাণ্ডবের প্রতিহিংসাতৃষ্ণা, বীর অন্তরের সমরবাঞ্ছা, ছদ্মবেশের নিরুপায়তায় নিষ্ফল আক্রোশ শিশিরকুমার যে সূক্ষ্ম নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। ভীমের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় অন্যান্য ভূমিকা থেকে এত বিভিন্ন ও নূতন যে এই মায়াবী-নটের অভিনয়-প্রতিভার বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সন্দেহের আর লেশমাত্র অবকাশ থাকে না।

এই নাটকেই 'শ্রীকৃষ্ণ'-র ভূমিকায় কিছুমাত্র নূতনত্ব না থাকলেও ভীমাভিনয়ের অসংযমের পর পাণ্ডবসখার শান্ত সমাহিত ভাব অত্যন্ত আরামদায়ক। ব্রাহ্মণের ভূমিকায় শিশিরকুমারের সুন্দর অভিনয়ের বর্ণনা করা যায় না। এ যেন শিল্পীর এক ভয়ঙ্কর সৃষ্টি। প্রকৃতির

প্রলয়লীলায় এক অনৈসর্গিক সৃষ্টি। অঙ্গসজ্জা, ভাবাভিব্যক্তি ও অভিনয়ের দিক দিয়ে এই ক্ষুদ্র ভূমিকায় তিনি যে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তাতে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ব্রাহ্মণের 'কা-কা-আ-হা' আমরা শীগ্‌গিরই ভুলতে পারব বলে মনে হয় না।'

১৯২৮ সাল। এক সাহেব ভদ্রলোক 'সীতা' নাটক দেখতে এসেছেন। তখনকার দিনে বাঙালী পাড়ায় সাহেব এলে রীতিমত হৈ চৈ পড়ে যেতো। সাহেব হলেন মার্কিনদেশীয়, নাম ইলিয়ট। 'সীতা' দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। বাঙালীরা এত ভাল অভিনয় করতে পারে! শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন! তারপর শোনা গেল যে তিনি শিশির-সম্প্রদায়ের সঙ্গে এক চুক্তি করেছেন, তাঁদের আমেরিকাতে নিয়ে যাবেন।

নাট্যমন্দিরের দ্বার বন্ধ হয়েছে। শিশিরকুমার নিজে ষ্টারে যোগদান করেছেন। এখানে 'চিরকুমার সভায়' রসিক, 'কর্ণার্জুন' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেছেন। সদলবলে গেলেন আমেরিকায়। তাঁর দলের প্রায় সকলেই গেলেন। নট-নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শৈলেন চৌধুরী, অমলেন্দু, শীতল পাল, তারাকুমার ভাদুড়ী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, রবি রায়, প্রভা, কঙ্কাবতী, শেফালিকা প্রভৃতি। সেখানে গিয়ে ইলিয়ট সাহেব তাঁর চুক্তি ভঙ্গ করেন। এমন সব প্রস্তাব করেন যা যে কোন সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান এবং জাতির পক্ষে অপমানকর। ফলে শিশিরকুমার, বিদেশে ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হ'ন। শিশিরকুমার কথা প্রসঙ্গে তাই প্রায়ই বলেন—"ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, তখন বিলেতে রাউণ্ড টেব্‌ল কনফারেন্স। এরা জগতের কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে ভারত এমনি বর্ব্বর যে তাদের কোন নাটক নেই, নট নেই, রঙ্গমঞ্চ নেই। 'A nation is known by its theatre'। কিন্তু কোথা থেকে যে কি হয়, কেউ বলতে পারে না। মা[illegible] বড়াই করুক, নিজে কিছু করতে পারে না। ভাবছি কি করি, অসহায় অবস্থা, তখন কাণ্ডারীরূপে একজন উপস্থিত হলেন এবং তিনিই 'ভাণ্ডারভোল্ট থিয়েটারে' অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন।"

আমেরিকা থেকে ফেরবার পথে শিশিরকুমার চিন্তা করছেন কিভাবে কলকাতায় যাবেন। কারণ সত্য ঘটনা অনেকেই জানেন না। ফলে কলকাতায় তাঁদের অসাফল্যের খবর পৌঁচেছে।

...চিন্তা করছেন—ব্যস্ মাথায় প্ল্যান এসে গেছে। "চলো দিল্লী", ভারতবর্ষের রাজধানী নয়াদিল্লীতে এলেন। রঙ্গমঞ্চের 'আলমগীর,' 'নাদির-সাহ' পৌঁচলেন নয়াদিল্লীতে। তাঁর বন্ধু-বান্ধব বড় বড় সরকারী অফিসারদের বললেন—একবার বড়লাটের মিলিটারী সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পার?

কেউ-ই সাহস করে না।

শিশিরকুমার তাই বলেন—গোলামী করে করে এমনই মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে যে সাহেবের সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করিয়ে দিতে কেউ-ই নেই।

হাতে কতকগুলি ইংরাজী পত্রিকা নিয়ে ধুতি-পাঞ্জাবী-চাদর-পরিহিত খাঁটি স্বদেশী শিশিরকুমার চলেছেন টাঙ্গা করে মিলিটারী সেক্রেটারীর অফিসে। "বহুবিধ বাধা অতিক্রম করে দেখা করলাম। সাহেব প্রথমে আমলই দিতে চায় নি। তখন বার করলাম 'দি নিউ ইয়র্ক সান' পত্রিকার সমালোচনা, লিখেছেন ষ্টিফেন র‍্যাথবোন আর 'দি ইভনিং ওয়ার্ল্ড'।"

মিলিটারী সেক্রেটারী কর্ণেল আগ্রহভরে পড়েন আর শিশিরকুমারেব মুখের দিকে তাকাতে থাকেন। বাবা! 'দি নিউ ইয়র্ক সান' বলছেন—"bell-like voice" শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বরকে।

তাই শিশিরকুমার বলেন—"ওদেশের বিখ্যাত পত্রিকার ওপর জনসাধারণের কত উঁচু ধারণা আর বিশ্বাস।"

মিলিটারী সেক্রেটারী ছুটলেন শিশিরকুমারকে নিয়ে বড়লাটের কাছে। বড়লাট লর্ড আরউইন। shake-hand হ'ল। পরিচয় হ'ল। বিশেষ সংবাদ হিসেবে "সীতা" নাটকের অভিনয়ের কথা প্রচার করার হুকুম হ'ল

এক বিশেষ অনুষ্ঠান হিসেবে।

বড়লাট-ভবনের রঙ্গমঞ্চে 'সীতা' অভিনীত হ'ল। সাহেবে সাহেবে লোকারণ্য, পুলিসে পুলিস, মায় মেয়েদের গ্রীণরুমে।

শিশিরকুমার হুঙ্কার দিলেন—তাহলে কি অভিনয় হবে না? মানে আর কিছুই নয় মেয়েদের গ্রীণরুমে পুলিশ!

পুলিস তৎক্ষণাৎ সরে গেল।

সাহেবদের বোঝবার সুবিধার জন্য শিশিরকুমার ইংরাজীতে নাটকের ঘটনা ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন, প্রোগ্রামে তাই ছাপা হয়।

বড়লাট পিঠ্ চাপড়ালেন, তৎকালীন ভারত সরকারের তরফ থেকে সার্টিফিকেট্ দিলেন।

শিশিরকুমার বলেন—আরে, সে কি কাণ্ড! যখন যা চাইছি তাই হাজির হচ্ছে। গভর্ণমেণ্টের "সে বেটা" আমরা সাজ-পোষাক যা চাইছি তাই এনে উপস্থিত করছে।

শিশিরকুমার এখন প্রায়ই বলেন—ভাবো দেখি, লক্ষ টাকার ওপর দেনা করে দেশে ফিরেছি। ফিরে দিব্যি নিদ্রা দিচ্ছি আর আমেরিকা-ভ্রমণের গল্প করে রাজা-উজীর মারছি।

সৌখীন নাট্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অত্যন্ত উঁচু। তিনি বলেন,—"সমুদ্রের ওপারে সৌখীন নাট্য সম্প্রদায় নাট্য ধারার ইঙ্গিত দেয়, নাট্যকার সৃষ্টি করে, নট-নটী আবিষ্কার করে এবং তাদের দ্বারা অভিনয়-পদ্ধতি প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ গ্রহণ করে। কিন্তু আমাদের দেশে ঠিক উল্টো। সৌখীন সম্প্রদায় পেশাদার রঙ্গমঞ্চকেই অনুসরণ করেন। কিন্তু এর কোন সার্থকতা নেই। অথচ আমাদের দেশে সৌখীন সম্প্রদায় থেকেই বড় বড় অভিনেতা বেরিয়েছে। সৌখীন সম্প্রদায় এগিয়ে এসে রঙ্গমঞ্চকে ইঙ্গিত দিক, নতুন পথ দেখাক।"



'রঙমহলে' অভিনীত 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকে শিশিরকুমার ও প্রভা

শিশিরকুমারেরও প্রথম নাট্যাবতরণ সৌখীন সম্প্রদায়ে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদান করেও তিনি সৌখীন সম্প্রদায়ে বহুবার অভিনয় করেছেন।

"জেনারেল এসেম্বলিস্ ইন্‌ষ্টিটিউসন" থেকে বি, এ পাশ করার সময় তাঁর প্রথম নাট্যাভিনয় 'মার্চেণ্ট্ অফ্ ভেনিস'-এ স্ত্রী-ভূমিকায় "পোরশিয়া" বেশ উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। তখন থেকেই শিশিরকুমার নাটক এবং অভিনয় সম্বন্ধে এত সচেতন যে তিনি স্বর্গীয় হরিনাথ দে'র কাছে গিয়ে পোষাক-পরিচ্ছদ কিরকম হবে জেনে আসেন।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদানের পূর্ব্বে নাট্যাচার্য্য সৌখীন থিয়েটার, যেমন কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্‌টিটিউট এবং ওল্ড ক্লাব থেকেই অভিনয়ে খ্যাতি লাভ করেন।

সৌখীন থিয়েটারে তিনি 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে 'চাণক্য'র ভূমিকায় অভিনয় করে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দৃষ্টি

আকর্ষণ করেন। শিশিরকুমার নুতন রূপ দিলেন। তিনি 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের দোষ-ত্রুটি সেই সময় থেকেই ধরতে পেরেছিলেন তাই আমরা তাঁর 'চন্দ্রগুপ্তে' গ্রীস পাত্র-পাত্রীর নাম-গন্ধ দেখি না। এই নাটকের ভিতর একসঙ্গে চারটি নাটক আছে। তিনি নাটকটিকে "চাণক্য"তে দাঁড় করাবার চেষ্টায় ছিলেন গোড়া থেকেই। তখন তাঁর বয়স ১৮ বৎসর।

দ্বিজেন্দ্রলাল বললেন—"আমি লিখলাম 'চন্দ্রগুপ্ত' আর তুমি করলে 'চাণক্য'।" দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মুখ গম্ভীর।

শিশিরকুমার 'বৈঠকী আড্ডায়' বৈঠক জমাতে অদ্বিতীয়। তাঁর "টেবল-টক্" আর উইটের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরাই জানেন।

দেওঘরে শিশিরকুমার অবস্থান করছেন। ক'দিন নাপিত আসে নি। অসম্ভব দাড়ি গজিয়েছে। অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন আর বলছেন—হ্যাঁ হে, একবার নয় সুন্দরের খবর নাও। তাকে বুঝিয়ে বল ব্যাটা জানে না তো যে এ নটু তায় আবার ব্রাহ্মণ আর যে ব্রাহ্মণ চাণক্য সেজেছে।

তাঁর এক আত্মীয় বেশ বলেন যে বড়বাবু যেদিন 'মুড-এ' থাকেন বৈঠকটি হয় স্বর্গ আর যেদিন 'মুড-এ' থাকেন না সেদিন বৈঠকটি যেন শ্মশান।

রূপসজ্জার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন—দ্যাখো আমাদের দেশে, রূপসজ্জার জন্য সবরকম সরঞ্জামের কোন অবকাশ নেই। গরমে রং, পাউডার, তুলি সব একসঙ্গে গলে ঝরে ঝরে পড়ছে। এতে কি আর রূপসজ্জা চলে?

সেক্সপীয়রের নাটকের বাংলা অভিনয়ের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন—'ঠিক ইংরাজীর বাংলা' করা চলে না এবং ঠিক সে গুরুত্বও পায় না। এই জন্য নাটকগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয় নি।'

নট-নটী সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে শিশিরকুমার বলেন—'বাংলা দেশে কখনও [illegible]র অভাব হয় নি। একাধিক শক্তিশালী নটের অভাব কোনদিন হয় নি। অভাব হয়েছে নাট্যকারের।'

তাঁকে ঘিরে তাঁর বন্ধুরা, শিল্পীরা যখন গল্প করেন তখন সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগে যে নানা বিষয়ে নানা ধরণের প্রশ্ন করে চলেন অথচ উত্তর দেবার জন্য তাঁকে একটুও ভাবতে হয় না। অনর্গল উত্তর দিয়ে যান। যেন সব আগাগোড়া তৈরী করে আসা।

একদিন এক জমিদার এসে তাঁকে বলেন—'আচ্ছা থিয়েটারের দরকার কি?'

তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—'স্কুলের দরকার কি?' জমিদার ভদ্রলোক স্তম্ভিত হলেন।

তাই শিশিরকুমার বলেন—'আমি বলি থিয়েটারের দরকার আছে। খালি রাজনীতির দ্বারা একটা জাতি বড় হতে পারে না। তার শিল্প, সাহিত্য, কলা—এর ফলেই সে শ্রেষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়। ছোট্ট দেশ গ্রীস—সে জাতিকে দিয়েছে 'ইমাজিনেশন'। রোম দিয়েছে 'কনষ্টিটিউশন' আর ভারতবর্ষ জগৎকে দিয়েছে 'দর্শন'। সেক্সপীয়র, কালিদাস আজও চির নুতন। টিটিয়ান র‍্যাফেল এঁরা অবিস্মরণীয়।

তাইতো সেদিন বললেন—'একা যতটুকু সম্ভব ততটুকুর চেষ্টার ত্রুটি করি নি কিন্তু একার দ্বারা সমস্ত সম্ভব নয়। তাই সফলকাম হতে পারি নি। বাড়ীওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ক'রে কতবার বাড়ী পরিবর্ত্তন করতে হয়েচে, পথে পথে ঘুরতে হয়েচে সেইজন্য সরকারের সাহায্য দরকার, স্থায়ী রঙ্গশালা দরকার।'

এই সেদিন বললেন—'আরে বাপু, এখন নাটক পুলিশের হাতে। দারোগার কাছে গিয়ে নাটক পেশ করতে হবে। তবু বলতে হবে দেশ স্বাধীন হয়েচে।'

আর একটা কথা তিনি প্রায়ই বলেন—'দ্যাখো, অভিনয়ের জন্য যারা আসে তারা জিজ্ঞেস করলেই বলে ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত, নয়তো স্কুলে কিছুদূর পর্য্যন্ত পড়েচে। কেরাণীগিরি করতে হলে বি, এ পাশ করতে হবে, কিন্তু অভিনয়টা যেন রাস্তার জিনিষ। কোন জ্ঞানের দরকার নেই।'

তাঁর কাছে একখানা বই আছে। তা পড়ে তিনি

বলেন—'প্রত্যেক রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা ও পরিচালকদের জ্ঞান থাকা দরকার কোন্ দিক থেকে প্রবেশ করবে, প্রস্থান করবে, কোথায় দাঁড়াবে, কি ভাবে কথা বলবে।'

একদিন একজন সাংবাদিককে বললেন—'সমালোচনা তোমরা যা করবে তা গঠনমূলক হওয়া দরকার। নাটকে কি বলতে চেয়েছে এবং নাটকের চরিত্রানুযায়ী নট্-নটী কতটা তার মর্য্যাদা দিতে পেরেছে। তা নয়—নাটক কিছুই হয় নি, অভিনয় কিছুই হয় নি। আরে, আমি বলি যে আমি মাসের পর মাস ধরে শেখালাম, পড়ালাম, বোঝালাম, আর আমি বুঝি না কি হয়েছে বা না হয়েছে! ভারী বয়ে গেল তোমার বলাতে। তোমার মতামতের কি মূল্য হে?' বলে হাসতে লাগলেন।

বালকদের জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন আছে এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে বালকদের নাটক একান্ত প্রয়োজন তার প্রথম ধারণা তাঁরই মনে আসে এবং 'স্কুলের আয়না' মঞ্চস্থ করেন।

রঙ্গালয়কে লোকশিক্ষার আকাররূপে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য যে সাহস ও ধীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন বাঙ্গালার রঙ্গালয়ে সেটাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা। দৈব তাঁর সহায় ছিল সন্দেহ নেই; দুর্লভ প্রতিভা অনন্যসাধারণ প্রয়োগ-শক্তি, উদাত্ত মধুর কণ্ঠ অনবদ্য শিক্ষকতা, প্রখর ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রভৃতি বিশিষ্ট গুণগুলি একাধারে একটি শিল্পীর মধ্যে পাওয়া শক্ত। নট হিসাবে শিক্ষক হিসাবে অসীম হলেও নাট্য-প্রযোজক হিসাবে পাষাণে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ক'রে তিনি বাঙ্গলার রঙ্গালয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

তিনি বলেছেন—'যৌবনে শক্তি ছিল অসীম, সাহস ছিল যথেষ্ট, তাই নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস রেখে যতটুকু সম্ভব করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পূর্ণতা লাভ করতে পারি নি, কারণ একার দ্বারা সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। তাই পারি নি।'

তিনি অবসর মুহূর্ত্তে পায়চারী করেন আর আবৃত্তি করেন—

"রঙ্গভূমি ভালোবাসি
হৃদে সাধ রাশি রাশি —
আশার নেশায় করি জীবন যাপন'

শিশিরকুমার পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এ কথা আজ সকলেই জানেন। শিশিরকুমার নিজে গর্বভরে বলেন—আমেরিকাতে আমরা অভিনয় করে এসেছি। এ কথা জোর করে বলতে পারি যে, ভারত তথা বাংলার অভিনেতারা অপর দেশের অভিনেতাদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

'চাইনীজ-কালচারাল-মিশন' যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন তাঁর বিশেষ করে শিশিরকুমারের অভিনয় দেখবার বাসনা প্রকাশ করেন যার ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধ ক্রমে শ্রীরঙ্গমে 'তখৎ-এ-তাউস' অভিনীত হয়।

১৯৫১ সালের ১৭ই জানুয়ারী বুধবার সন্ধ্যায় পুডভ্‌কিন ও চেরকাশভ এসেছিলেন 'ষোড়শী' নাটকের অভিনয় দেখতে। শিশিরকুমারের সহজ সরল অভিনয় তাঁদের এতই মুগ্ধ করে যে তাঁরা অভিনয়ের মাঝে সাজঘরে ছুটে আসেন অভিনন্দন জানাতে। সবচেয়ে বড় কথা তাঁরা বলেন—"মস্কো আর্ট থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেতা ষ্ট্যানিশ্লাভস্কীর সমতুল্য আপনি। আপনি যখন কথা বলছেন, তখন আমরা বশীভূত হই। আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন। আরো একবার বলি আপনি একজন বিরাট অভিনেতা।"

আর একটি স্মরণীয় দিন। গত ৫ই ডিসেম্বর মার্কিন নাট্যকার পল এলিয়ট গ্রীণ নাট্যাচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই মিলনকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাংস্কৃতিক মিলন বললেও কিছুমাত্র ভুল হবে না।

এলিয়ট গ্রীণ শিশিরকুমারের প্রখর ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করেন এবং বলেন—'শিশিরকুমার ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতীক।'

শিশিরকুমার বেশ জোরের সঙ্গে বলেন—'চলচ্চিত্রের আবির্ভাব ও সংঘাতের ফলে গত ২০ বছর ধ'রে ভারতীয় নাট্যমঞ্চের অগ্রগতি যদিও স্তিমিত হয়ে এসেছে, তবুও তা' পুনরুজ্জীবিত হবেই।'

আর একটি কথা তিনি বলেন যা' সবিশেষ প্রণিধান যোগ্য তা হলো :—'ভারতে নাট্য-কলার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা এখনও [illegible] এখানকার লোক

বিশ্ববিদ্যালয় কিম্বা শিক্ষায়তনে ছাত্রদের নাট্যরচনা শিক্ষা দেওয়া হয় না। নাট্যকলার ভিতর দিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থায় একটা আন্দোলন এদেশে আরম্ভ হয়েছিল ৪২ বৎসর আগে যখন আমি ছাত্র। কিন্তু তাদের অর্থাৎ সে কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিবাগীশ মনোবৃত্তির জন্য সেটা চাপা পড়ে যায়। তিনি তাই প্রায়ই বলেন—'বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কিন্তু জ্ঞানলাভের অবকাশ নেই। প্রশ্ন-উত্তর, এই প্রশ্ন—এই উত্তর এই নিয়ম বাঁধা। এতে জ্ঞান-লাভ হয় না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। শিশির 'যুগ' কথাটাকে অনেকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। তাঁদের মতে নাট্যজগতে শিশিরকুমার একম্ এবং অদ্বিতীয়ম্ সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি একা নন, তিনি বহু। এ-যুগের শ্রেষ্ঠত্ব বলতে যদি কেবলমাত্র শিশিরকুমারের একক কৃতিত্বকেই ধরে নিই তবে যুগের প্রতি যেমন অবিচার করা হয়, শিশিরকুমারের প্রতিও তেমনি অবিচার করা হয়। কারণ শিশিরকুমার পৃথিবীর সেইসব অনন্যসাধারণ নাট্য-প্রতিভার অন্যতম যাঁরা শুধু নট-নটী, নাট্যকার সৃষ্টি করেন না, নাট্যজগতের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করেন। শিশিরকুমারের প্রেরণা এবং প্রভাবে বহু সৃজনী-প্রতিভার সৃষ্টি হয়েছে এবং নিজে নট-নটী সৃষ্টি করেছেন বলেই 'শিশির-যুগ' নামটি সার্থক হয়েছে। একের গৌরবে যেমন বহুবচন, বহুর গৌরবে তেমনি একবচন বিধেয়। শিশির-যুগের অঙ্গনে বহু শক্তিমান নটের আবির্ভাব হয়েছে এবং এঁরাই 'শিশির-যুগ'কে সার্থক করেছেন।

সেদিন 'আলমগীরে'র ত্রিশ বছরব্যাপী অভিনয় উপলক্ষ্যে অভিনয়ের পূর্ব্বে শিশিরকুমার পুরো একঘণ্টা ধরে তাঁর অভিনয়-জীবনের সমস্ত ইতিহাস শোনালেন। মানস্বিতার ও বাগ্মিতার মধুর যোগাযোগে সেই একঘণ্টা যেন মুহূর্ত্তে কেটে গেল। উদ্দীপনাময়ী ভাষায় তিনি এই ব'লে শেষ করেন—সকল সভ্যদেশে সরকারী সাহায্যে থিয়েটার গড়ে উঠেছে। এখানেও তা দরকার হবে। বাঙালী জাতি আবার জাগবে—এই কথাটি তিনি বারবার বললেন।

শিশিরকুমার ত্রিশবছর ধ'রে একান্তভাবে নাট্যসেবা ক'রে আসছেন। শিশিরকুমারের নাট্যসেবার ইতিহাস ব্যক্তির ইতিহাস নয়, একটা জাতির ইতিহাস, একটা যুগের ইতিহাস। পরাধীন দেশে, অনগ্রসর দেশে, প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে তাঁকে একা সংগ্রাম করতে হয়েছে। যে কোন স্বাধীন দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করলে তাঁর অসাধারণ শিল্প-প্রতিভার সমাদর যে বহুগুণ বেশী হ'ত একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

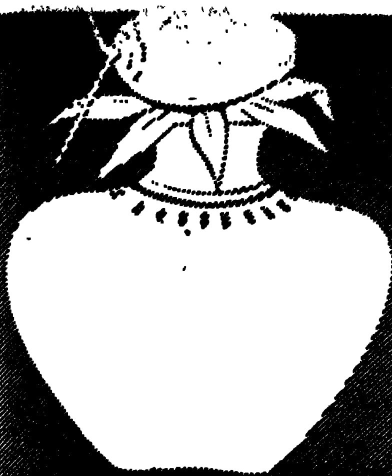
আমাদের সৌভাগ্য যে তাঁর প্রতিভা আজও অটুট। ২রা অক্টোবর মহাষ্টমীর পুণ্য শুভ এবং মহান তিথিতে তাঁর আবির্ভাব। স্মরণীয় দিনে এই আবির্ভাব যুগের ঘোষণা করেছে।

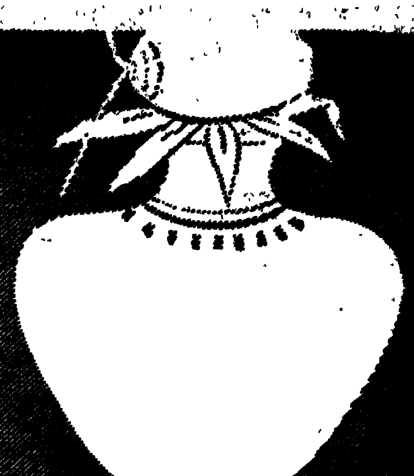
একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় রবীন্দ্র-শরৎ-শিশির প্রতিভার এরূপ যোগাযোগ কখনই ঘটে না। যাঁরা তার ভাষণ শুনেছেন, বক্তৃতা শুনেছেন তাঁরাই জানেন, যে তাঁর মতো এমন বক্তা বর্ত্তমানে দুর্লভ।

তিনি শতায়ু হ'ন। সুস্থ থাকুন। নাট্যকারকে তিনি বলেছেন—'সবল, নির্ভীক, সাহসী, বলিষ্ঠ চরিত্র সৃষ্টি করতে যাতে অভিনেতা সম্পূর্ণরূপে দর্শকদের সামনে রূপদান করতে পারেন। 'যোগেশের' মতো বা 'করুণাময়ের' মতো মেরুদণ্ডহীন চরিত্রের বর্ত্তমানে কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। সকলকে এ কথা স্মরণ করতে বলি।'

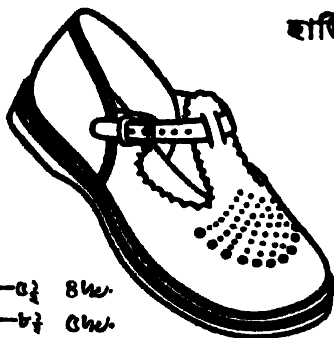
শিশিরকুমার ভাদুড়ী অভিনীত ভূমিকাগুলি যথাসম্ভব এখানে দিলাম।

আলমগীরে—আলমগীর ও রাজসিংহ; রঘুবীরে—রঘুবীর; চন্দ্রগুপ্তে—চাণক্য; সীতায়—রাম ও শম্বুক; পাষাণীতে—ইন্দ্র ও গৌতম; ভীষ্মে—ভীষ্ম; বিসর্জ্জনে—রঘুপতি ও জয়সিংহ; শেষরক্ষায়—চন্দ্র ও ললিত; জনায়—প্রবীর, নীলধ্বজ, বিদূষক; পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে—ভীম, ব্রাহ্মণ, শ্রীকৃষ্ণ, বৃহন্নলা; সধবার একাদশীতে—নিমচাঁদ; ষোড়শীতে—জীবানন্দ; প্রফুল্লতে—যোগেশ, রমেশ; নর-নারায়ণে—কর্ণ; প্রতাপাদিত্যে—প্রতাপ ও রডা; বিল্বমঙ্গলে—বিল্বমঙ্গল; সাজাহানে—সাজাহান

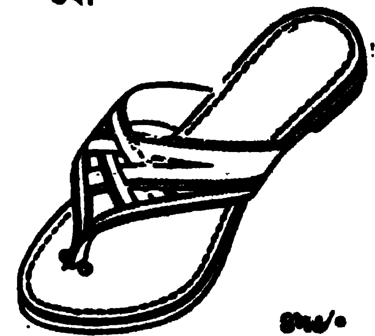




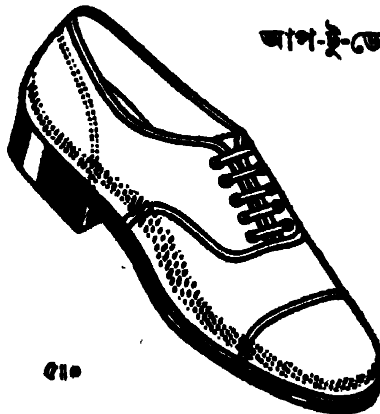
পূজায় আনন্দে













Bata

ঔরঙ্গজেব ; বলিদানে—করুণাময়, দুলালচাঁদ ; হাজেহাদায় —রুদ্রগিরি ; শংখধ্বনিতে—কেত্তনলাল ; দিগ্বিজয়ীতে—নাদিরশাহ ; তপতীতে—রাজা ; রমাতে—রমেশ ও গোবিন্দ গাঙ্গুলী, ভ্রমর-এ—গোবিন্দলাল ; বিবাহ বিভ্রাটে—মিঃ সিং ; মুক্তার মুক্তিতে—রতনচাঁদ ; খাসদখলে—নিতাই ; মন্ত্রশক্তিতে—মৃগাঙ্ক ; চিরকুমার সভায়—চন্দ্র, রসিক ; কর্ণার্জ্জুনে—কর্ণ ; শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায়—নিমাই ; অশোক-এ—অশোক ; রিজিয়াতে—বক্তিয়ার ও ঘাতক ; পুণ্ডরীক-এ—পুণ্ডরীক, মহাপ্রস্থানে—শ্রীকৃষ্ণ ; বিরাজ বৌ-এ—নীলাম্বর ; সরমা-তে—রাবণ ; রীতিমত নাটক-এ—দিগম্বর ; শ্যামাতে—চন্দনক ; যোগাযোগে—মধুসূদন ; অচলায়—কেদার ; বিজয়া-তে—রাসবিহারী, নরেন ; দক্ষযজ্ঞে—দক্ষ ; বৈকুণ্ঠের খাতায়—কেদার ; অভিমানিনীতে—রাজা বীরেন্দ্র সিংহ ; জীবনরঙ্গে—নাট্যাচার্য্য অমরেশ ; উড়ো চিঠিতে—সুনীল ; মায়াতে—দাদামহাশয় ; মাইকেল মধুসূদনে—মাইকেল ; দেশবন্ধুতে—কল্লোল ; বিপ্রদাসে—বিপ্রদাস ; বিন্দুর ছেলে-তে—যাদব ; পরিচয়ে—রায় বাহাদুর ; তখৎ-এ-তাউসে—জাহান্দারশাহ ; মিশর-কুমারীতে—সামন্দেশ।

'সীতা' নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনীর পাত্র-পাত্রী

রাম—শিশিরকুমার
লক্ষ্মণ—৺বিশ্বনাথ
ভরত—তারাকুমার
শত্রুঘ্ন—৺তুলসী বন্দ্যোঃ
বাল্মিকী—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
বশিষ্ঠ—৺ললিত লাহিড়ী
লব—জীবনকুমার গাঙ্গুলী
কুশ—ননীগোপাল সান্ন্যাল পরে রবীন্দ্রমোহন রায়
শম্বুক—৺যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
দুর্ম্মুখ—৺অমলেন্দু লাহিড়ী
সীতা—প্রভা
শূদ্রাণী—নিরুপমা পরে চারুশীলা

'আলমগীর' যেদিন অভিনীত হয় সেদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস গ্রেপ্তার হ'ন। কিন্তু সংবাদ আসে—অভিনয় চালিয়ে যেতে।

'রঘুবীর' যেদিন অভিনীত হয় মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হ'ন। গান্ধীজীর অহিংস-নীতি তখন প্রবল আর 'রঘুবীরে' দেখানো হয়েছে অহিংসার দ্বারা দেশকে স্বাধীন করা যায় না।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, দিঘাপাতিয়ার মহারাজা শিশিরকুমারকে রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণের আভাস দেন কিন্তু দেশবন্ধু বা দিঘাপতিয়ার মহারাজার সে-বাসনা পূর্ণ হয় নি তাঁদের আকস্মিক মৃত্যুতে।

আমেরিকাতে 'সীতা' নাটক অভিনীত হচ্ছে সেখানকার বিরাট রঙ্গমঞ্চে যেখানে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। প্রেক্ষাগৃহে মার্কিনদেশীয় দর্শকে পরিপূর্ণ তাই দেখে 'দুর্ম্মুখ' রূপী শীতল পাল ভীত হয়ে পড়েন। "মহারাজ"—বলে তাঁর মুখে আর কথা সরে না। শিশিরকুমার 'রাম' সেজে সীতাকে বাতাস করছেন। ব্যাপারটা বুঝলেন। বললেন—'রে, দুর্ম্মুখ ভয় নাই, শেতাঙ্গ যবনের দেশে কেহ বুঝিবে না মোদের ভাষা, মোর নিকটে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়া যাও।'

শিশিরকুমারকে চলচ্চিত্র সম্পর্কে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা হ'লে পরিষ্কারভাবে বলেন যে, তিনি ষ্টেজের লোক, সিনেমার জন্য তিনি ন'ন।

[এই রচনায় উপাদান সংগ্রহে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন অশোক ভাদুড়ী]

ফুটবল রীলে

শ্রীবিরূপাক্ষ

বছর বিশেক কি তারও দু'এক বছর আগেকার কথা বলছি। কলকাতা বেতার কোম্পানীর খেয়াল হ'ল ফুটবল খেলার ধারা-বিবরণী প্রচার করতে হবে। বেতারের প্রোগ্রাম পরিচালক নেপেন মজুমদার মহাশয় ফুটবল খেলা দেখতে গেলে ষ্টেশনে থাকবে কে—অতএব তাঁর দুই সহকারী রাইচাঁদ বড়াল ও বীরেন ভদ্র মহাশয়ের ওপর ভার পড়লো ফুটবল মাঠে গিয়ে সব ব্যবস্থা করবার।

রাইচাঁদ সঙ্গীতজ্ঞ হলেও খেলা বোঝেন ভাল কিন্তু ব'কতে একেবারেই নারাজ আর ভদ্র মহাশয় ব'কতে দড় হলেও খেলা সম্বন্ধে বলতে গেলেই একেবারে দন্ত কড়মড়—কিচ্ছু বোঝেন না। কিন্তু রীলের আয়োজন হয়ে গেছে, তখন ত আর পেছনো চলে না, দুই মহাপ্রাণীকেই যেতে হল।

সেই প্রথম কলকাতা ষ্টেশন থেকে ফুটবল রীলে।

মোহনবাগান বনাম ক্যালকাটা ক্লাবের খেলা—মাঠে লোক ধরেনা। চতুর্দিকে শুধু অগণিত কাল মাথা। ক্যালকাটা ক্লাবের ইউরোপীয় দর্শকদের ঠিক মাথার ওপরের গ্যালারীতে বেতার কোম্পানীর লোকদের বসবার জায়গা হয়েছে—আলাদা কোন কেবিন তখন ছিল না এবং পরিকল্পনাও হয়নি। সেই প্রথম পরীক্ষা কিনা?

যাই হ'ক শ্রোতাদের খেলা বোঝবার সুবিধের জন্যে 'বেতার জগতে' মাঠের একটা নক্সা এঁকে সেটাকে আটটা লাইন দিয়ে ভাগ ক'রে নম্বর দিয়ে দেওয়া হল। বল কোন্ জায়গায় আছে সেটা সেই চৌকো ঘরের নম্বর দেখে বলে যাওয়ার ব্যবস্থা হল। কোন দিকে ত্রুটী কিছুই নেই।

ফুটবল মাঠে মাইক্রোফোন বসিয়ে তার সামনে বলে যাবার ব্যবস্থা সে সময় কিছু ছিল না। টেলিফোনের যন্ত্রের মত একটা যন্ত্র মুখের সামনে থাকতো—যন্ত্রটি মুখের সামনে ঝুলিয়ে মাথা আর গালের সঙ্গে বেঁধে দেবার ব্যবস্থা কর্ত্তৃপক্ষ করে দিয়ে গেলেন। সে এক কিম্ভুত-কিমাকার ব্যবস্থা!

বেতারের সে সময়কার বড় সাহেব ছিলেন বদরাগী ষ্টেপলটন্ সাহেব। ভদ্রলোক তাঁর সহকারীদের যেমনি ভালবাসতেন তেমনি খিঁচুতেন। তিনি এসে ভদ্র মহাশয়কে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, যে খবরদার বেশি চেঁচিও না যেন, চতুর্দিকে সাহেব মেমরা রয়েছেন, ওঁরা বিরক্ত হতে পারেন।

ভদ্র মহাশয় মাথা নেড়ে বললেন, সে বিষয়ে ভেবনা সাহেব আমি চুপি চুপিই বলবো। মনে মনে ভাবলেন, চেঁচামেচি করবার জন্যই ত আসা হ'ল, এ আবার কি হুকুম! যাই হ'ক প্রতিবাদ করে লাভ নেই···এখন মুখের সামনে যন্ত্র আঁটা হয়ে গেছে। সাহেব মেমেরা বারবার ওপর দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন, আর মুচকে মুচকে হাসি। সঙ্কোচ জিনিসটি ভদ্র মহাশয়ের কিঞ্চিৎ কম হলেও সাহেবদের সেই অবিরত চাউনি আর মেম সাহেবদের হাসি অসহ্য হয়ে উঠতে লাগলো। তখনো খেলা আরম্ভ হয়নি। সংয়ের মত পট্টি বেঁধে বীরেনবাবু বসে আছেন।

রাইচাঁদবাবু পাশে বিরাট বপুখানি নিয়ে অস্বাভাবিক একটা গাম্ভীর্য্য নিয়ে বসে আছেন।

বীরেনবাবু বললেন, ভাই রাই, তুমি খেলোয়াড়দের নামগুলো বলে যাও ভাই, আমি ত' কাউকে চিনি না। ততক্ষণ যন্ত্রটা তোমার কানে দিই।

রাইবাবু সিল্কের রুমালে গোঁফটা মুছে স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন, ঘাবড়াচ্ছ কেন, আমি নামগুলো বলছি, তুমি বলতে সুরু কর।

বীরেনবাবুর উদ্দেশ্য—একবার রাইচাঁদ মুখের সামনে সেই ঘোড়ার ঘাসের থলির মত যন্ত্রটা এঁটে বসেন। তাই গম্ভীরভাবে কান থেকে যন্ত্রটি খোলবার আয়োজন করতে করতে বলে উঠলেন, আহা ততক্ষণ চালাও না, খেলা চললে বল কোথায় যাচ্ছে, [illegible]রে আমি ঠিক বলবো খন।

পাশেই বেতারের কন্ট্রোল বিভাগের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইবার জন্য ফোন। সব সেই গ্যালারির ওপরে।

ক্রীং ক্রীং ক্রীং!

ষ্টার্ট!

বীরেনবাবুর মাইক্রোফোন সজীব হয়ে উঠলো। তিনি সুরু করলেন, নমস্কার! এখন আমরা কলকাতা ফুটবল খেলার মাঠ থেকে রীলে আরম্ভ কচ্ছি। আজ মোহনবাগানের সঙ্গে ক্যালকাটা ক্লাবের সেমিফাইনাল রীলে—থুড়ি—খেলা হচ্ছে। মাঠে দু দিক থেকে দু দল এসে দাঁড়িয়েছেন। ও রাই, নামগুলো বলুন ভাই!

রাইচাঁদ তন্ত্রধারকের মত নাম বলতে সুরু করলেন, বীরেনবাবু পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন। সাহেব মেমেদের মধ্যে ঈষৎ বিরক্তির সঞ্চার হতে লাগলো। পাশে বসে ভ্যাজর ভ্যাজর করলে এ সময় কার আর পুলক জাগে বলুন না? যাই হ'ক, এ পর্য্যন্ত বেশ নির্ব্বিবাদে চললো। তার পরই হ'ল বিপদ্!

বীরেনবাবু রামের ঘাড়ে শ্যাম এবং শ্যামের ঘাড়ে রামকে চাপিয়ে প্রাণভরে বেভুল ব'কে যেতে লাগলেন। আর রাইবাবু মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে উঠলে গুঁতো দিয়ে বলতে সুরু করলেন, দূর, কি সব ভুল বল্‌ছিস।

গুঁতো দিতেই বীরেনবাবু যন্ত্রে হাতটা চাপা দিয়ে রাইবাবুকে বলতে থাকেন, বেশ বাবা তোমার মুখে এটা এঁটে দিচ্ছি, তুমিই কারেক্ট করে বল।

রাইবাবু শান্ত হয়ে যান একেবারে। পাছে বীরেন মুস্কিলে ফেলে ভেবে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলে ওঠেন, থাক্ থাক্ এইবার ঠিক করে বল।

বীরেনবাবু পুনরায় আরম্ভ করেন, মাঠে খেলা দেখা

রাইচাঁদ চটে গেলেন, খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, দেখ্ বীরেন ও রকম করলে মাইরি আমি এখান থেকে উঠে যাব বলছি।

বীরেনবাবুও তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, আরে বাবু রীলের জন্যে কি শুধু একা আমিই দায়ী। তবে তুমি এলে কেন?

রাইচাঁদ তাঁর মুখের দিকে কটমট করে চেয়ে বললেন, আমি পাশে থেকে বলছি ত'!

বীরেনবাবু বললেন, পাশে থেকে বলা আর মুখের সামনে যন্ত্র বসিয়ে বলা এক হ'ল? শ্রোতাদের সুবিধের দিকে একটু লক্ষ্য রাখা চাই ত!

রাইচাঁদের বিরক্তি আর উষ্মা আরও বেড়ে গেল। দপ্ করে বাক্সে [illegible] দোরে খাক্ খুলিয়ে [illegible] মোড় [illegible] লোয়াড়রা বেরিয়ে [illegible]।

জন্যে আজ অসম্ভব ভীড় হয়েছে। বল দ্রুতগতিতে এক-নম্বর এর পায়ে লেগে ওর পায়ে গিয়ে লাথি খাচ্ছে! ঐ বল চলেছে ছ'নম্বর ঘর, ছ নম্বর, ক্যালকাটার গোলকীপার ছ'নম্বর থেকে বল শুট করে ন'নম্বরে পাঠিয়ে দিলে।

রাইবাবু এই সময় বীরেনবাবুর জামার হাতা ধরে টেনে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, দূর ও বুঝি ক্যালকাটার গোলকীপার? ও সেণ্টার ফরওয়ার্ড!

বীরেনবাবু তৎক্ষণাৎ ভ্রম সংশোধন করে বলে উঠলেন, মশাই মাফ করবেন ইতিপূর্ব্বে ঐ যে ছ'নম্বর থেকে ন'নম্বর ঘরে বল গেল সেটা শুট করেছিলেন ক্যালকাটার সেণ্টার ফরোয়ার্ড।

ইতিমধ্যে চার পাঁচজন বল শুট করতে করতে এগিয়ে গেছেন হঠাৎ মোহনবাগানের এক খেলোয়াড়ের সঙ্গে বল নিয়ে ঠোকাঠুকি করতে করতে কি রকম ফাউল হয়ে গেল।

বীরেনবাবু বলে যেতে লাগলেন, সাত নম্বর ঘরে একটা ধাক্কাধাক্কি হয়ে গেল। রেফারী হুইসিল দিতেই খেলা বন্ধ। এইবার একজন বল মারছে—বোধ হয় সেণ্টার ফরোয়ার্ড।

—ধ্যেৎ! হাফ ব্যাক!—রাইবাবু ভুল শুধরে দেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ—হাফ ব্যাক! শুট করেছে, বল তিন নম্বর চার নম্বর পেরিয়ে একেবারে ছ'নম্বর ঘরে—দিলে দিলে দিলে। ঐ যাঃ—এঃ একেবারে রগ ঘেঁসে বেরিয়ে গেল। নাঃ মোহনবাগানের আজ খুব বরাত খারাপ দেখছি। মাঠে যাচ্ছেতাই করে সবাই চেঁচাচ্ছে। যাক্ আবার সুরু হল।

খেলা দেখতে দেখতে ও বলতে বলতে কখন যে গলার স্বর পঞ্চমে চড়েছে তা বীরেনবাবুও টের পান নি। ওদিকে সাহেব মেমেরা ক্ষেপে আগুন। নিজেদের ভাষায় বক্তার উদ্দেশ্যে তাঁরা যে ভাল ভাল বিশেষণ প্রয়োগ করছেন তা তাঁদের মুখভঙ্গী দেখেই বেশ বোঝা গেল। একটি মেম শেষ পর্য্যন্ত আর থাকতে না পেরে বলেই ফেললেন

Would you speak softly, Babu ? বাবু একটু আস্তে কথা বলবেন কি ?

বীরেনবাবু বিরক্ত হয়ে সে দিকে চাইলেনও না জবাবও দিলেন না। রীলে করা হচ্ছে—আস্তে কি বলা হবে ?

হাফ-টাইমের সময় বড় কর্ত্তা ষ্টেপলটন্ ছুটে এসে বললেন, Mr. Bhadra,Don't shout please ! দয়া করে চেঁচিও না। সাহেব মেমেরা বলছে ভবিষ্যতে এখানে আর আমাদের বসতেই দেবেনা।

বীরেনবাবু বললেন, সাহেব আস্তে বললেও যে বিপদ ওদিকে কণ্ট্রোলের লোকেরা যে পঞ্চাশবার বলছে গলা তুলুন মশাই, নইলে, কিছু শুনতে পাচ্ছি না—গাঁজা খেয়ে ঝিমুচ্ছেন নাকি ?

সাহেব নিজেই তখন ফোন ধরলেন। কণ্ট্রোল রুমের সঙ্গে কথা বলে বোধ হয় বীরেনবাবুর কথার সত্যতা যাচাই করে নিলেন। শেষ পর্য্যন্ত রফা হলো—মিডিয়ম আওয়াজ দাও।

পুনরায় খেলা সুরু হল।

এবার বীরেনবাবু সকলকে সন্তুষ্ট রাখতে লাগলেন। গোল হব হব সময়ে চেঁচান আর বাকী সময় প্রায় বিড় বিড় করতে থাকেন। রাইচাঁদের আর সাড়াশব্দ নেই খেলা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে এই এই···হায় হায় হায় ···চু···চু করে চলেছেন।

বীরেনবাবু ধাক্কা দিয়ে যদি সে সময় বলে ওঠেন, ও রাই কি হচ্ছে, একটু বলে দাও।

রাইবাবু খেলোয়াড়দের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে থাকতে বীরেনবাবুকে হাতের কনুয়ের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বিরক্তভাবে বলে ওঠেন, আঃ চুপ কর না—এ সময়···

কথাটা আর শেষ হয় না। যেন বীরেনবাবু চুপ না করাতেই মোহনবাগানের খেলোয়াড় বলটা প্রতিদ্বন্দ্বীর গোলে ঢোকাতে পাচ্ছে না।

'চুপ কর,' শুনে বীরেনবাবু [illegible] উঠলেন, চুপ করবো কি ? [illegible] করে বসে আছে যে [illegible] ছে ? [illegible] শুনবে কি।

ঠিক এমনি সময় ক্যালকাটার গোলের মুখে দড়াম করে মোহনবাগানের কে একজন বল মারলে আর বীরেন-বাবু চীৎকার করে বলে উঠলেন—হ্যাণ্ডবল্ !

যেমনি হ্যাণ্ডবল্ বলা আর অমনি রাইচাঁদ থেকে আরম্ভ করে গ্যালারীশুদ্ধ সাহেব মেম হেসে লুটোপুটি।

বীরেনবাবু ভাবলেন, তাইত এতে হাসির কথাটা কি হল ? রাইচাঁদকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল বল দেখি রাই !

রাইবাবু হেসে বলে উঠলেন, হ'ল তোমার মুণ্ডু ! গোলকীপার বল হাতে ধরলে সেটা কি হ্যাণ্ডবল হয়রে গাধা ?

বীরেনবাবু বললেন, তাই নাকি ! কিন্তু এর আগে যে কতকক্ষেত্রে······

তাঁর আলোচনা শেষ হবার আগেই বাঁশি বেজে উঠলো···ফুরর্ !

খেলা শেষ হয়ে গেল সেদিনের মত। দু পক্ষই নির্গোল। কিন্তু গোল বাধলো অফিসে গিয়ে। রাইচাঁদ রেগে নেপেনবাবুর ঘরে গিয়ে অভিযোগ পেশ করে বল-লেন, নেপেন দা, দেখুন সত্যি যদি ফুটবল, ক্রিকেট রীলে করাতে চান তাহলে একজন ভাল লোককে দিন। বীরেনের মত এরকম আহাম্মুখকে আমার সঙ্গে পাঠাবেন না। যা খুশী বলে যায়—খেলার 'ক' 'খ'-ও জানে না—ছিঃ ছিঃ, একেবারে অপ্রস্তুতের একশেষ !

বীরেনবাবুও বলে উঠলেন, মশাই, রাইয়ের মত ভ্যাবাচাকা-মার্কা লোককে নিয়ে রীলে করতে পাঠাবেন না কখনও আমার সঙ্গে। বাবু একেবারে সাহেব মেম-দের মুখ দেখে লজ্জায় মরে গেলেন। একটা জিনিষ ত' আমায় বললেই না উপরন্তু কেবল বলে, চুপ কর্, চুপ কর্ ! সিম্পলি ডিস্‌গাষ্টিং !

দুটি আঙ্গুলের অগ্রভাগে সিগারেটটি চেপে ধরে টানতে টানতে সহাস্যমুখে নেপেনবাবু বলে উঠলেন, তাই নাকি ! আচ্ছা, আজ ত' তাহলে রীলেটা শুনলে হ'ত হে !

ইতিমধ্যে ষ্টেপলটন সাহেব চুরুট-মুখে বেতার অফিসে ঢুকেই সরাসরি নেপেনবাবুর ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, Mr. Mazoomder, Did you listen to our foot-ball relay ? (মিঃ মজুমদার, আমাদের ফুটবল রীলে শুনেছিলে ?)

একগাল হেসে স্বচ্ছন্দচিত্তে মজুমদার মশাই বলে উঠলেন, ওঃ ! সিম্পলি চার্মিং ! (সত্যি, চমৎকার !)

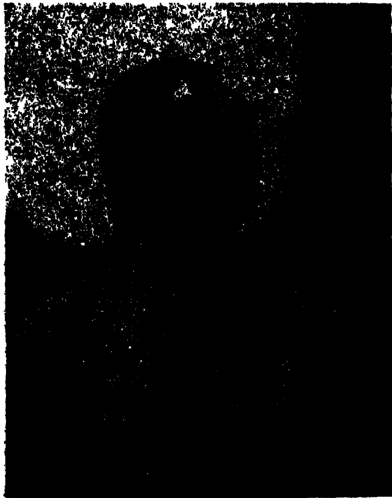
মণিপুরী নৃত্যের ইতিহাস



গুরু আতম্বা সিং

[বর্ত্তমানকালের মণিপুরী নৃত্যকলায় গুরু আতম্বা সিং হলেন প্রবীণতম ও শ্রেষ্ঠ ধারক এবং বাহক। রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্যশিক্ষার প্রবর্ত্তন সুরু করেন তখন গুরুজীই ছিলেন তাঁর প্রধান সহযোগী এবং উৎসাহী উদ্যোগী। বর্ত্তমানে তাঁর বয়স একাত্তর বছর। বহু তথ্যপূর্ণ এই রচনাটিতে মণিপুরী নৃত্যের ইতিহাস ও তার বিভিন্ন ধারা নিয়ে সরস আলোচনা করেছেন।]

মণিপুররাজ ভাগ্যচন্দ্রের রাজত্বকালে তদীয় মাতুল খেলেই খুংলা তেলহেইবা—মৈরাং নামক স্থানের রাজা ছিলেন—মৈরাং অতি ক্ষুদ্র রাজ্য। মাতুল একদিন মহারাজের কাছে আরও কিছু জায়গা চাইলেন—মহারাজ বিনা আপত্তিতে কিছু জায়গা ছেড়ে দিলেন। কিছুদিন পর পর আবার কিছু জায়গা চাইলেন সেবারও মহারাজ কোন আপত্তি করলেন না—কিন্তু তৃতীয়বার মহারাজ দিতে আপত্তি করলেন—তখন মাতুল ব্রহ্মদেশের রাজার সাহায্য নিয়ে মণিপুর আক্রমণ করলেন—মহারাজ যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে আসাম রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলেন রাণীদের সংগে নিয়ে। দুই পুত্র মধুচন্দ্র ও লাবণ্যচন্দ্র বন্দী



গুরু আতম্বা সিং

হলো শত্রুর হাতে। মণিপুরবাসী মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রকে জানতো ঈশ্বর বলে—রাজার অভাবে সারা মণিপুর হলো ম্রিয়মান।

আসামের রাজা স্বর্গদেব আশ্রয় দিলেন মহারাজকে, কিন্তু মাতুলের কাছ থেকে এলো চিঠি—মহারাজকে তাড়িয়ে দিতে নতুবা মেরে ফেলতে। কারণ, ভাগ্যচন্দ্র অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোক, তাকে আশ্রয় দিলে আসাম রাজ্যের অকল্যাণ হবে। আসামরাজ মন্ত্রীদের সংগে বসলেন পরামর্শ করতে। মন্ত্রীদের একজন বললেন—আমরা শুনেছি মণিপুররাজ ঈশ্বরতুল্য—যদি তাই হয় তবে আমাদের যে পাগলা হাতী আছে, তার কাছে মহারাজকে পাঠানো হোক, উনি যদি সত্যি ঈশ্বরতুল্য হন তবে পাগলা হাতী ধরতে পারবেন, অন্যথায় হাতীর পায়ে প্রাণ দেবেন। মহারাজকে জানানো হলো হাতী ধরবার কথা এবং সময় দেওয়া হলো তিন দিন—মহারাজ মহারাণী মনের দুঃখে এই অগ্নি-পরীক্ষার কথা জানালেন অন্তরের দেবতা গোবিন্দজীকে। ভক্তের আহ্বান পৌছলো ভক্তের ভগবানের কাছে। আগের দিন রাত্রে স্বপ্নযোগে মহারাজকে দেখা দেন গোবিন্দজী এবং অভয় দিয়ে বলেন—'রাজা তোমার কোন ভয় নেই তুমি দক্ষিণ হস্তে মালা জপ করবে এবং বাম হস্তে [illegible] হাতীর কাছে যাবে, তাহলে [illegible] তোমার বশ [illegible] তারপর তুমি আসামের রাজার সাহায্য নিয়ে [illegible]রে যাবে এবং মাতুলকে



মণিপুরী 'বসন্ত-রাস' নৃত্যে বৃন্দার ভূমিকায় একটি বিশেষ নৃত্য-ভঙ্গীমায় রেবা দত্ত

পরাস্ত ক'রে নিজ রাজ্য পাবে—কিন্তু আমার বিগ্রহ তৈরী ক'রে তুমি রাস-উৎসব করবে শ্রীবৃন্দাবনের মতো। তুমি ভাল করে আমার রূপ দ্যাখো, মণিপুরের কাছে 'নোমাই-জিন' পাহাড়ে 'কাইনা' নামক স্থানে একটি কাঁঠাল গাছ দেখতে পাবে, সেই কাঁঠাল গাছ কেটে আমার এই মূর্তি তৈরী ক'রে প্রতিষ্ঠা ক'রবে।' পরের দিন সর্ব্বসমক্ষে যখন মহারাজ পাগলা হাতীর সামনে গেলেন—তখন হাতী শুঁড় মাটিতে লাগিয়ে এবং সামনের দুই পা নত ক'রে মহারাজকে প্রণাম জানালো এবং মহারাজ তার পিঠে উঠে ব'সে চামর ব্যজন করতে লাগলেন এবং চারিদিক থেকে জয়ধ্বনি উঠলো—ভগবান—মহারাজ ভগবান।'

আসামের রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করলেন তাঁর সেই ব্যবহারের জন্যে। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র কিছুদিন পর ফিরে গেলেন মণিপুরে এবং নাগাবেশে বাস করতে লাগলেন রাজা-রাণীর কাছে—একদিন নাগাবেশে মাতুল রাজার সংগে দেখা করতে গেলেন—প্রহরীরা বাধা দিলো। [illegible] বললেন, যে, [illegible] করতে যাবেন এবং রাজাকে উপঢৌকন [illegible] প্রহরীরা দিলো। ভাগ্যচন্দ্র একেবারে মাতুল-রাজার সম্মুখীন হ'য়ে এক আঘাতেই তাকে করলেন দ্বিখণ্ডিত এবং নিজের পরিচয় দিলেন সবার কাছে। প্রজারা তাদের রাজাকে ফিরে পেয়ে খুবই আনন্দিত হলো। ভোগবিলাসের ভিতর দিয়ে দিন কেটে যায়—মহারাজ ভুলে গেলেন গোবিন্দজীর কথা। আবার একদিন স্বপ্ন-যোগে গোবিন্দজী দেখা দিলেন মহারাজকে এবং স্মরণ করিয়ে দিলেন পূর্ব কথা। পরদিন প্রভাতে মহারাজ লোকজন-সহ গেলেন নোমাইজীন পাহাড়ে—কিন্তু সারাদিন তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেলনা কাঁঠাল গাছের সন্ধান। মহারাজ মনের দুঃখে লোকজনদের বললেন—'যদি কাঁঠাল গাছের সন্ধান না পাই তবে আমি রাজধানীতে ফিরে যাবো না।' কাতর প্রার্থনা জানালেন গোবিন্দজীকে—আবার রাত্রে স্বপ্নে দেখতে পেলেন গোবিন্দজীকে। 'কাল প্রভাতে "কাইনা" নামক স্থানে কাঁঠাল গাছ দেখতে পাবে'—গোবিন্দজী বললেন মহা-রাজকে এবং সেই সঙ্গে রাস-নৃত্যের ভংগী-ও দেখালেন



গুরু ম্যাম্বী সিং—মৃদঙ্গ-বিশারদ—মণিপুরী নৃত্যে তাঁর মৃদঙ্গ সঙ্গৎ প্রাণ-প্রতিষ্ঠার সহায়ক

তাঁকে। তার পরের দিন প্রভাতে মহারাজ কাইনা-য় গিয়ে কাঁঠাল গাছ দেখলেন এবং তিনখণ্ড ক'রে সেখান থেকে নিয়ে এলেন। এর এক খণ্ড কেটে গোবিন্দজীর মূর্তি তৈরী করে প্রতিষ্ঠা করা হলো এবং শহরে যারা বিখ্যাত গায়ক, বাদক ও পণ্ডিত লোক ছিলেন তাঁদের ডেকে বলা হলো রাসলীলার কথা।

ভাগ্যচন্দ্র মহারাজের মাতা মাইচলা কুমুদিনী—মহারাজ যার কাছে ভংগী কথা বলেছিলেন—উনি ওস্তাদদের সাহায্যে প্রথম ভংগীর ও ছেলেদের ভংগী তৈরী করেন এবং রাজবাড়ীর মেয়েদের শিখিয়ে দেন। সবই হলো, কিন্তু গোবিন্দজী একা, রাসেশ্বরী শ্রীরাধিকা

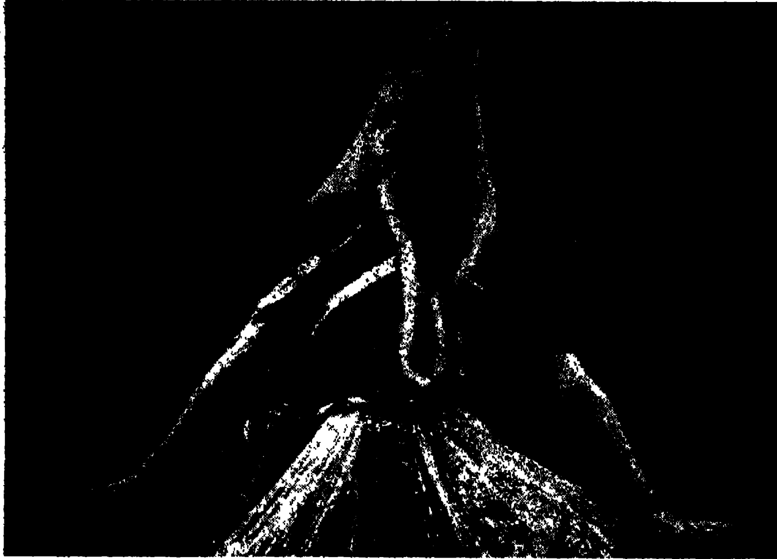


'বসন্ত-রাস' নৃত্যে শ্রীরাধার ভূমিকায় মাধুরী ঘোষ



'বসন্ত রাস' নৃত্যে শ্রীকৃষ্ণ-রূপে নীলিমা দাস

না হ'লে রাস হবে কি ক'রে—সেই সময় মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রের কন্যা—অপূর্ব সুন্দরী ভক্তিমতী "সিজালায়রেবী"কে রাধা ক'রে গোবিন্দজীর পার্শ্বে দাঁড় করানো হয় এবং রাস-উৎসব সম্পন্ন হয়। সেই থেকে গোবিন্দজীর পূজা-অর্চনার ভার পড়লো রাজকন্যার হাতে। রাজকন্যাও গোবিন্দজীকে স্বামী জেনে নিজেকে বিলিয়ে দেয় তার পায়ে। মণিপুরে প্রবাদ আছে যে—রাজকন্যার বিছানায় নাকি কোন কোন দিন গোবিন্দজীর চূড়া-ধরা-বাঁশী ইত্যাদি পাওয়া যেতো। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত মণিপুরে "মহারাস" প্রধান উৎসবরূপে চলে আসছে। মণিপুরের বিখ্যাত নৃত্য গুরুদের মধ্যে গুরু মুক্তার সিং ছিলেন সর্বগুণে গুণী। তাঁর পুত্র "থোক্ চোং আংগাহাল" এবং ঐ সময় আরও কয়েকজন গুরু ছিলেন—"গুরু হুই দুম্ ঝুল মচা", "হুই দ্রুম রুদ্র সিং", "থুমুলম্বা"—এঁরা বর্ত্তমানে ইহ-জগতে নেই তবে এঁদের ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন এখনও জীবিত আছেন। গুরু আমু[illegible] সিং উদয়শঙ্করের সংগে [illegible] ৭২ বছর বয়[illegible]। আমি খুব ছোট বেলায় [illegible] করেছি [illegible] চোং আংগাহাল-এর



মণিপুরী রাস নৃত্যের আর একটি ভঙ্গিমায় গীতা ঘোষ

কাছে। তারপর বড় হ'য়ে উপরোক্ত আরও তিনজন গুরুর কাছে নাচ, গান ও মৃদঙ্গ শিক্ষা করেছি। আমার বয়স বর্ত্তমানে ৭১ বছর—আমার জীবনের ১৫ বছর কবিগুরুর সংগে কাটিয়েছি শান্তিনিকেতনে। যাক্ বর্ত্তমানে মণিপুরে আরও ২।৩ জন বয়োবৃদ্ধ গুরু আছেন—আমার গুরুভাই এবং সঙ্গী য়্যামুবী সিং বিখ্যাত "গুরু ওয়াহেম্বম্ চোওবা খোংমা"-এর কাছে মৃদঙ্গ শিক্ষা করেছে ও গুরু আংগাহাল ও গুরু লেম্ ডাং আংগুতোর ও আমার কাছে নৃত্য শিক্ষা করেছে—বর্ত্তমানে সে মণিপুরের বিখ্যাত মৃদঙ্গ-বাদকদের মধ্যে অন্যতম।

মণিপুরী নাচের মধ্যে ভংগী দুই প্রকার—ছেলেদের ও মেয়েদের। বৃন্দামপারেংও দুই প্রকার। খুরুং পারেং শুধু মেয়েদের নাচ—এই পাঁচ রকম নাচই আসল এবং প্রথম রাস থেকে আজ পর্য্যন্ত চলে আসছে—ভংগী-নাচের বোল বা নাচের টেকনিক সকল ওস্তাদেরই এক। অন্যান্য নাচের কিছু কিছু তফাৎ আছে। প্রবাদ আছে, ভংগী-নাচ ভুল শেখালে বা ভুল নাচলে পাপ হয়। এ ছাড়া লায় হার ওবা, খুবাক ইসে, পুং চালন, থাম্বাল চোংবা নানা ধরণের নাচ আছে। মণিপুরী নাচ-গানও বোলের সংগে হয়। [illegible] আসল ৫টি নাচ জানলে বোল তৈরী করে অন্য নাচ তৈরী করা যায় এবং গুরুরা তাই করেন। মণিপুরী নাচে তাণ্ডব ও লাস্য আছে—ছেলেদের নাচ তাণ্ডব উচ্ছল ক'রে অর্থাৎ লাফিয়ে করতে হয়—কিন্তু মেয়েদের নাচ লাস্য —তাদের নাচে বেশী লাফানো উচিত নয়।

বর্ত্তমানে মণিপুরীর নামে নানা রকম মেশানো নাচ চলছে—আমার মতে যাঁরা শিক্ষক তাঁদের এসব করা উচিত নয়—তাতে মণিপুরী নাচের সুনাম নষ্ট হয়ে যাবে এবং ধীরে ধীরে আসল নাচ লুপ্ত হয়ে যাবে।

[আমার প্রিয় ছাত্রী ও ছাত্র 'নৃত্যভারতী'র প্রতিষ্ঠাত্রী ও পরিচালক নীলিমা দাস ও প্রহ্লাদ দাস আমার কথাকে বাংলায় সাজিয়ে দিয়েছে—তাদের আমি জানাচ্ছি আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।—লেখক।]



এম পি প্রোডাকসন্সের হাস্যকৌতুকোজ্জ্বল চিত্র
'সাড়ে চুয়াত্তর'-এর নায়িকা নবাগতা
সুচিত্রা সেন ঃ ছবিখানি বর্ত্তমানে দ্রুত সমাপ্তিমুখে



ছায়ামুক্ত 'ঊষাকিরণ' ছবিতে নিম্মি

উপন্যাসের রূপান্তর

বিপিনবিহারী রায়

আমি একজন সাধারণ "দর্শক", মাঝে মাঝে একটু আনন্দ পাবার জন্যে ঘণ্টা ২।৩ সময় কাটাতে যাই ছবি দেখে। কিন্তু নতুন ছবি দেখতে যাবার আগে, অর্থাৎ টিকিটের দামটা খরচ করে ফেলবার আগে, একবার পত্র-পত্রিকাগুলি পড়ে দেখি, তাঁরা ছবিখানা সম্বন্ধে কিরকম মন্তব্য করেছেন—উদ্দেশ্য যে, আমার নগদ পাঁচ সিকে বাজে ছবি দেখে অপব্যয় না হয় (অবশ্য এ প্রবন্ধে আমি কেবল-মাত্র বাংলা ছবির কথাই বলছি)। কিন্তু এখানেই হয় মুস্কিল, যতই কাগজ পড়তে থাকি ততই মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত হতে থাকে। কারণ, দেখি যে একই ছবির সাতখানা কাগজে সাত রকম সমালোচনা বেরিয়েছে, এমনকি, যে ছবিকে একটা কাগজ উচ্চ প্রশংসা করেছে, অপর একটা কাগজ তার যথেষ্ট নিন্দা করেছে। অবশ্য এর ব্যতিক্রম আছে, যদি সত্যিকার উৎকৃষ্ট ছবি হয় (দুর্ভাগ্য বাংলা দেশে বাংলা ছবি সে পর্য্যায়ে পড়ে হয়ত বছরে দু'বছরে একটা) তাকে সকল কাগজই প্রশংসা করে। সাধারণতঃ কিন্তু দেখতে পাই সমালোচনা-বৈচিত্র্য, যাতে আগেই বলেছি আমার মত লোকের ধাঁধা লেগে যায়। অবশ্য নতুন ছবির উৎকর্ষের মান নির্দ্ধারণ করবার আর একটা উপায় আছে, সমালোচকেরা যাই বলুক, যে ছবি এক, দুই বা বড় জোর তিন সপ্তাহ দেখানোর পর উঠে যায়, তাকে বাজে ছবি বলেই ধরে নেওয়া চলে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে এ-উপায়ের ওপর নির্ভর করে থাকা চলেনা, কারণ তাহলে নতুন ছবি দেখতে অন্ততঃ একমাস অপেক্ষা করে থাকতে হয়।

ব্যাপারটা কেন এমন হয়? চিন্তা করে দেখে এইটুকু বুঝেছি যে, এদেশে চিত্র-সমালোচনার বা চিত্র-সমালোচকের কোন নির্দ্ধারিত মানদণ্ড নেই, সমালোচনাটা হয় একেবারে subjective অর্থাৎ ব্যক্তিগত, objective অর্থাৎ বস্তুগত সমালোচনার কোন মানদণ্ড নেই। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে বলি। চিত্র-বিষয়ক প্রত্যেকটি পত্রিকার একজন বা ততোধিক লোক আছেন, তাঁরা নতুন ছবি প্রদর্শিত হলেই দেখে এসে একটা সমালোচনা লিখে ফেলেন। সেটা সেই ব্যক্তির শিক্ষা-দীক্ষা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি অনুযায়ী হয়, এই শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদিরও কোন নির্দ্দিষ্ট মান নেই, কাজেই কারো দৃষ্টিভঙ্গী অন্যের সঙ্গে মিলবে না। আগেই বলেছি, যদি ছবি খুব ভালো হয় তার বেলা অন্য কথা, রাম, শ্যাম, যদু সকল সমালোচকই প্রায় এক ধরণের সমালোচনা লেখেন। কিন্তু "সাধারণ" পর্য্যায়ে যেসব ছবিকে ফেলা যায়,—এবং সেই রকম ছবিই প্রতি মাসে গড়পড়তা তিনটে ক'রে "মুক্তি" পায়—তার সমালোচনা নানা ধরণের হয়ে থাকে, কেউ বা বলে ভাল, কেউ বা বলে মন্দ, কেউ বলে মাঝারি, আবার কেউ বা ভাল, মন্দ বা মাঝারি স্পষ্ট করে কোনটাই না বলে এমন বাক্যজাল সৃষ্টি ক'রে সমালোচনা লেখেন, যার অর্থ আমার মত সাধারণ দর্শকের পক্ষেও বুঝতে পারা দুঃসাধ্য। কতকগুলি বড় বড় সাধারণের দুর্ব্বোধ্য টেক্‌নিক্যাল কথা দিয়ে এইসব সমালোচনা এমন ধোঁয়াটে করে লেখা হয়, যার অর্থ এ-ও হয়, ও-ও হয়। যদি কোন সমালোচক লেখেন যে "অমুক এই ছবিতে উৎকৃষ্ট অভিনয় করেছেন, কিন্তু তাঁর কথা আগাগোড়াই এত অস্পষ্ট যে প্রায় কিছুই বোঝা যায় না" তাহলে, পাঠক, আপনি কি বুঝবেন? আমি সে ছবিটি দেখেছিলাম এবং এই বুঝেছিলাম যে, যেহেতু উক্ত অভিনেতা একজন "নামকরা" ব্যক্তি, তাঁর "অভিনয়" খারাপ হয়েছে এ কথা বলবার সাহস সমালোচকের ছিল না, তাই ওই রকম পরস্পর বিরোধী কথা লিখেছেন, যার কোন মানে হয় না। "অপারেশন সাকসেসফুল কিন্তু রোগী বাঁচলো না—এ সেই রকম কথা নয় কি?

সকল রকম চলচ্চিত্র সমালোচনার ধারা একটি প্রবন্ধে

বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা সম্ভব নয়, সেজন্য আমি এর একটিমাত্র দিক নিয়ে আলোচনা করবো। প্রায়ই দেখতে পাই সমালোচক বলছেন, যে মূল উপন্যাসের কাহিনী নিয়ে চিত্র সৃষ্টি হয়েছে, চিত্রে অনেক স্থলে মূল কাহিনীর ঘটনা বা চরিত্রের অদল-বদল করা হয়েছে, "বইতে তো এ ঘটনা নেই, অথবা, এ চরিত্রের রূপ যা ফোটানো হয়েছে তার সঙ্গে বই-এর সৃষ্ট চরিত্রের ঠিক মিল হচ্ছে না" এই ধরণের বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রায়ই দেখতে পাই। এর দু-একটি দৃষ্টান্ত পরে দিচ্ছি, আগে সাধারণভাবে জিনিসটা বিচার করা যাক। এ রকম সমালোচনা প্রযুক্ত হয় সাধারণতঃ যেসব বিখ্যাত ও জনপ্রিয় উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্র প্রস্তুত হয়ে থাকে, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বা কোন আধুনিক জনপ্রিয় লেখকের রচনা সম্বন্ধে অর্থাৎ যেসব বই সাধারণ পাঠকের কাছে সুপরিচিত। কথাটা এই দাঁড়ায়, মূল উপন্যাসে যা যা চরিত্র বা ঘটনার সমাবেশ আছে, সবটা হুবহু ছবিতে তুলতে হবে? তা হতে পারে না, কিছু কিছু পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন অবশ্যম্ভাবী, কারণ উপন্যাস, তার নাট্যরূপ (রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য) ও তার চিত্ররূপ (ফিল্মে তোলার জন্য) একবারে হুবহু এক হতে পারে না। তবে এটা অবশ্য দেখতে হবে পরিবর্ত্তনের দ্বারা কোন চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ করা না হয়, অথবা ঘটনা সমাবেশে মূল কাহিনীর ক্ষতি না হয়, অর্থাৎ মোটের ওপর উৎকর্ষসাধনই হবে পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য। উপন্যাস আমরা শুধু পাঠ করে তার ভাব ও রস গ্রহণ করি, সেই বই-এর নাট্যরূপ দিতে হলে আবশ্যক অনুযায়ী বদল, ছাঁটাই বা কিছু জোড়াতালি না দিলে তাকে রঙ্গমঞ্চে ঠিক ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। আবার চিত্ররূপ ঠিক নাট্যরূপ মিলেও চলবে না, এই মাধ্যমের উপযোগী করে তোলবার জন্য আরো কাট-ছাঁট জোড়াতালি ইত্যাদির প্রয়োজন। উপন্যাসে কোন লোমহর্ষণ বা মর্ম্মস্পর্শী ঘটনার বর্ণনা থাকতে পারে, যেটা পাঠকের মনে যথেষ্ট [illegible] করে। এই ঘটনা রঙ্গমঞ্চে কেবল-[illegible] মুখে বর্ণিত করা [illegible] হয়ত উপায় [illegible] রিবি খুব [illegible] তার ওপর ক্রিয়া-কলাপ (action) খুব বেশী দেখানো চলে না, মুখে বর্ণনা দিয়েই সারতে হয়। যদিও, তরবারী ক্রীড়া, পিস্তলের গুলীতে হত্যা ইত্যাদি ছোট-খাটো action, এমনকি, কামানের গোলায় দুর্গ-প্রাকার ধ্বংস এ ধরণের দৃশ্যও সীমাবদ্ধভাবে দেখানো চলে এবং দেখানোও হয়েছে, কিন্তু action দেখাবার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র যে চলচ্চিত্র সে-বিষয়ে সন্দেহই নেই। সেইজন্য কোন উপন্যাসের নাট্যরূপ হবে বাক্যবহুল, তার চিত্ররূপ হবে কার্য্যবহুল। এ-প্রসঙ্গে ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়ে গেল। অমরেন্দ্র দত্ত প্রতিষ্ঠিত "ক্লাসিক থিয়েটারে" বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণকান্তের উইল" নাটকাকারে রূপান্তরিত হয়ে "ভ্রমর" নামে অভিনীত হচ্ছে (আমি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের কথা বলছি)। কলকাতার পথে পথে প্রাচীরপত্রে বড় বড় অক্ষরে দেখা গেলো—"রঙ্গমঞ্চে অশ্বপৃষ্ঠে গোবিন্দলাল" (তখন অমরেন্দ্র দত্ত গোবিন্দলালের ভূমিকায় অভিনয় করতেন)। অর্থাৎ একট আস্ত, জ্যান্ত ঘোড়ায় চড়ে গোবিন্দলালের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাবটা এতই চমকপ্রদ যে সেটা একটা বিশেষ আকর্ষণ ব'লে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মনে রেখাপাত করতে তিনটি যে বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে—পুস্তক, তার নাট্যরূপ ও তার চিত্ররূপ—এই তিনটির মধ্যে মূলগত প্রভেদ যথেষ্ট রয়েছে। এখন দেখা যাক, মূল বই থেকে অদল-বদলের কথা। এর প্রথম উদাহরণ একটি বহু পুরাতন যুগের উপন্যাসের নাট্যরূপ থেকে দেবো। বঙ্কিমচন্দ্রের সুবিখ্যাত উপন্যাস "চন্দ্রশেখর"কে প্রথম নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করেন অমৃতলাল বসু, যিনি একাধারে ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ, নাট্যকার ও অভিনেতারূপে খ্যাত ছিলেন। এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ষ্টার থিয়েটারে সম্ভবতঃ ১৮৯৬ কি ১৮৯৭ সালে, এবং তার পর থেকে আজও পর্য্যন্ত পঞ্চাশ বছরের ওপর এই নাটকের অভিনয় হয়ে আসছে। এই নাটককে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত গল্পাংশের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন বা ক্ষতিসাধন না করেও অমৃতলাল একটি সম্পূর্ণ নূতন চরিত্রের সমাবেশ করেন, তার নাম "গন্ধগোকুল বিশ্বাস"। অষ্টাদশ

শতাব্দীতে যখন ইংরাজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকগণ এদেশে ব্যবসার নামে শোষণ ও নানা অত্যাচার-অনাচার চালাতে থাকেন, তখন অনেক কুলাঙ্গার বাঙ্গালী তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ও তাদের নানা কুকার্য্যে সহায়তা ক'রে প্রভুত লাভবান হয়েছিল, সেইরূপ একটি ইংরাজের পদ-লেহী চাটুকার বাঙ্গালী এই গন্ধগোকুল বিশ্বাস। এর ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী বুলি ও তৎসহ ভঙ্গীমার জন্য যদিও চরিত্রটি "কমিক" বা হাস্যোদ্রেককারী রূপেই চিত্রিত হয়েছিল, তথাপি এর কুকার্য্যের জন্য দর্শকমনে যথেষ্ট বিরাগভাবেরও উদ্রেক হতো। নিপুণ হস্তের অঙ্কিত এই চরিত্রটি অদ্ভুতভাবে মূল কাহিনীর সঙ্গে খাপ খেয়ে গিয়েছিল। এই পঞ্চাশ বছরেরও বেশী কাল হাজার হাজার দর্শক (ও সমালোচক) "চন্দ্রশেখর" নাটকের অভিনয় দেখেছেন ও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন কিন্তু কই—কখনো ত' কারো মুখে এমন কথা শোনা যায়নি যে নাট্যকার (অমৃতলাল) বঙ্কিমের ওপর কলম চালিয়েছেন ও সেজন্য তিনি নিন্দার্হ। তবে এ হলো একদিকের কথা, অর্থাৎ মূল পুস্তকে নেই এমন চরিত্র সৃষ্টি করার কথা। আবার তেমনি অনেক ইংরাজী ছবিতে দেখা যায় যে মূল পুস্তকে নেই এমন ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে সেই পুস্তকের চিত্ররূপে। এটাও যেখানে করা হয়েছে সেখানে সাধারণতঃ বলা যায় যে দর্শকের প্রশংসাই লাভ করেছে, তাতে চিত্রের কোন ক্ষতি বা রসভঙ্গ তো হয়ই নি, বরং তা ছবির উৎকর্ষ বৃদ্ধি করেছে। এ বিষয়ে সাধারণভাবে বলতে গেলে, প্রথমেই যে কথা বলেছি তার পুনরাবৃত্তি করতে হয়, যথা, বই-এ যা আছে হুবহু সব ঠিক রাখলেই যে ভাল ও হৃদয়গ্রাহী চিত্র হবে এমন কোন কথা নেই। সেটা নির্ভর করে অভিজ্ঞ চিত্রনাট্য-রচয়িতার নৈপুণ্যের ওপর। এরও একটা উদাহরণ দেবো, তবে আধুনিক কোন ছবির কথা না বলে, ১৭ বছর আগেকার একখানি উৎকৃষ্ট ইংরাজী ছবির দৃষ্টান্ত দেবো। ১৯৩৫ সালে কলকাতায় "লষ্ট্ পেট্রোল" (Lost Patrol) নামে একখানি ছবি দেখানো হয় (পরেও অনেকবার হয়েছিল)। ছবি দেখবার আগে মূল বইখানি আমি পড়েছিলাম, ছবি দেখবার সময় দেখলাম এক স্থানে একটি চমকপ্রদ ছোট ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে, যার কোন উল্লেখ মূল বইতে নেই এবং ঘটনাটি জুড়ে দেওয়াতে ছবিখানির আরো উৎকর্ষ তো হয়েছেই এমনকি ছবির পরিণতি (Climax) আরো মর্ম্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। যদি একালের পাঠকেরা এ ছবির সঙ্গে পরিচিত না থাকেন, সেজন্য খুব সংক্ষেপে কাহিনীটি বলছি। একটি সৈনিকদের 'পেট্রোল' বা পাহারাদারী দল, সংখ্যায় ১০।১৫ জন, ঘটনাচক্রে মরুভূমির মধ্যে মূল দলের থেকে বিচ্ছিন্ন ও পথভ্রান্ত হয়ে পড়ে। চারিদিকে কেবল ধূ ধূ করছে বালি এবং (আরব) শত্রুদলের বিভীষিকা। এই অবস্থায় অতি কষ্টে তারা একটি oasis বা মরূদ্যানে আশ্রয় নেয়। চারিদিকে উঁচু নীচু বালিয়াড়ি, তার আড়াল থেকে আরবেরা সুবিধা পেলেই গুলী করে। একজন সার্জেণ্ট এই সৈনিকদের দলপতি। মরূদ্যানটি যাতে অবরোধ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে ও সৈনিকরা ভগ্নোদ্যম না হয়ে পড়ে, সেই চেষ্টাই সে অনবরত দিনের পর দিন করে যেতে থাকে। শীঘ্রই একদিন তাদের তল্লাসকারী বড় দলটি এসে পড়ে তাদের উদ্ধার করবে, এই আশাই তাদের বাঁচতে ও যুদ্ধ করে যেতে উৎসাহিত করছে, যদিও

আরবদের গুলীতে রোজই ২।৩ জন হতাহত হচ্ছে। এমন অবস্থায় হঠাৎ একদিন একখানি এরোপ্লেন এসে তাদের সামনে নামলো, অবরুদ্ধ সৈনিকদের আনন্দ হলো যে এই এরোপ্লেন-চালক নিশ্চয়ই তাদের সন্ধানে বেরিয়েছে, কিন্তু চালক যখন এরোপ্লেন থেকে নেমে মরূদ্যানের দিকে আসছে, এরা যতই তাকে হাত নেড়ে, চেঁচিয়ে সাবধান করে দিচ্ছে যে চারিদিকে শত্রু লুকিয়ে আছে, চালক কিন্তু হাসিমুখে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। দুম্ করে শব্দ হলো, চালক পেটে হাত দিয়ে, বিস্মিত ও হতভম্বভাবে আস্তে আস্তে ধরাশায়ী হলো, তার মুখ থেকে কেবল "I say, you fellows—" এ কথা উচ্চারিত হলো, অর্থাৎ "এ কী করলে তোমরা? আমি যে তোমাদের বন্ধু, আমাকেই মারলে?"—এই ভাব। বেচারী জানলো না যে লুক্কায়িত আরবের গুলীতে তার প্রাণ নাশ হলো। এই ছোট দৃশ্যটি যে কি লোমহর্ষক ও হৃদয়বিদারক, যাঁরা না দেখেছেন তাঁদের বোঝানো শক্ত। অথচ এ ঘটনাটি মূল পুস্তকে নেই, এটি সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য-রচয়িতার মস্তিষ্কপ্রসূত! তারপর গল্পের পরিণতি আরো হৃদয়গ্রাহী করতে এই ঘটনা কিরকম সাহায্য করেছিল, সে কথা বলি। সার্জ্জেণ্ট অতি সন্তর্পণে রাত্রে গিয়ে এরোপ্লেন থেকে মেশিন-গানটি (Machine gun) খুলে নিয়ে এলো। শেষ দৃশ্যে, যখন সকলে মৃত, একমাত্র সার্জ্জেণ্ট বেঁচে আছে, আরবেরা দল বেঁধে এগিয়ে আসছে, এইবার তাকেও শেষ করবে বলে, তখন সার্জ্জেণ্ট আরবদের গুলী উপেক্ষা করে মেশিন্-গান্ চালাতে আরম্ভ করলে, পিঁপড়ের সারের মত আরবেরা গুলী খেয়ে পড়ছে আর সার্জ্জেণ্টের ততো উল্লাস আর হাঃ—হাঃ—হাঃ গগনভেদী অট্টহাসি। সে হাসির ধ্বনি আর কামানের কড় কড় কড় কড় শব্দ মিলিয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, তা আজো ভুলি নি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মূল বইয়েতে নেই এমন নূতন চরিত্র সৃষ্টি, বা নূতন ঘটনার অবতারণা করলেই, অথবা ঘটনার কিছু পরিবর্তন করলেই যে দোষ [illegible] এমন কথা ঠিক নয়। যদি চিত্রনাট্য-রচয়িতার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, মানবচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও কল্পনা-শক্তি থাকে তাহলে পরিবর্ত্তন করা চলে, যদি তাতে চিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হবে বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গ আর না বাড়িয়ে কলকাতায় সম্প্রতি প্রদর্শিত একটি চিত্রের কথা বলে শেষ করবো। "মহাপ্রস্থানের পথে" ছবিটির নানারূপ সমালোচনা প্রকাশিত হলেও, মোটের ওপর সকলেই সুখ্যাতি করেছেন। কোন এক সমালোচক এর একটি বিশেষ দৃশ্য নিয়ে সেই পুরানো কথা বলে দোষ ধরেছেন যে "মূল বই-এর সঙ্গে এ ঘটনা মেলে না।" ঘটনাটি এই—পরিব্রাজকের সঙ্গে ভণ্ড ব্রহ্ম[illegible] ঝগড়া ও ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, তারপর অনেকদিন পরে, ফেরবার পথে পরিব্রাজকের সঙ্গে আবার ব্রহ্মচারীর দেখা হলো। তখন ব্রহ্মচারীর অবস্থা খুব খারাপ, জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা, ছেঁড়া কাপড়, মাছির কামড়ে সর্ব্বাঙ্গে ঘা, সে আকুলভাবে পরিব্রাজকের কাছে সাহায্য ভিক্ষা চাইলো। পরিব্রাজক ঘৃণাভরে তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। ব্রহ্মচারী যখন আগেকার ভালবাসার দোহাই দিলো তখন পরিব্রাজক "সে ভালবাসাকে তুমি নিজ হাতে হত্যা করেছো" বলে ছিট্‌কে চলে গেলেন। কিন্তু দূর থেকে নিজের গাত্র-বস্ত্রখানা ছুঁড়ে ব্রহ্মচারীর কাছে ফেলে দিয়ে গেলেন। এক ধুরন্ধর সমালোচক লিখেছেন যে "বইতে এই গাত্র-বস্ত্র দেবার কথা নেই।" বইখানি আমি বহুকাল আগে পড়েছি, গাত্র-বস্ত্র দেওয়ার কথা আছে কি নেই, সে কথা আমার মনে নেই, মনে রাখার প্রয়োজন আছে বলেও মনে করি না। ছবি হিসাবে বিচার করে আমি বলবো যে, এই গাত্রবস্ত্র দান করাতে পরিব্রাজকের চরিত্র আরো উজ্জ্বলতর হয়ে ফুটেছে। সে কঠোর হতে পারে, নাস্তিক হতে পারে, ব্রহ্মচারীর পূর্ব্বের ব্যবহারে তার মনে রাগ ও অভিমান থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে আর্ত্ত-আতুর ব্রহ্মচারীকে দেখে তার মনে দয়ার লেশও উদয় হয় নি এমন হতে পারে না। তাই সে রাগ দেখিয়ে চলে গেলেও, যাবার সময় গাত্র-বস্ত্র দিয়ে গেল। এতে দর্শকের হৃদয় স্পর্শ করেছে।

তাই এখন এই বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি যে, পরিবর্ত্তন করলেই যে ফল মন্দ হবে এমন কথাও যেমন সত্যি নয়, তেমনই না বুঝে পরিবর্ত্তন করলেও আবার ফল খুব মন্দ হতে পারে।

চলচ্চিত্রশিল্পে মাদ্রাজ

★



বীরেন নাগ

যদিও চিত্রশিল্প বাঙালীর একার নিজস্ব কীর্ত্তি নয়, তবুও ভারতবর্ষের চিত্রশিল্পের ইতিহাসে বাংলাই একনিষ্ঠ সাধক ও সাফল্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অগ্রদূত। 'চণ্ডীদাস' ও 'মীরাবাঈ'-এ'র যুগে বোম্বাইতে তোলা 'হাণ্টারওয়ালী' বা 'রিক্সাওয়ালী' বাংলা দেশ থেকেও প্রচুর পয়সা নিয়ে গেছে—কিন্তু ইজ্জৎ বিক্রী ক'রে। 'খিড়কী', 'শানাইয়ের' কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি,—'আন' ও 'আওয়ারার' যুগেও 'রত্নদীপ' ও 'যাত্রিক' শুধুমাত্র বাংলারই প্রতিনিধিত্ব করেনি—সারা ভারতকে নূতন করে সজাগ করে দিয়েছে। তবুও বোম্বাই-এর সঙ্গে বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পের চিরদিনই একটা যোগসূত্র ছিল বা আছে। কিন্তু—

পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা খরচের হিসাব দেখিয়ে যখন সারা ভারতে মাদ্রাজের 'চন্দ্রলেখা' মুক্তিলাভ করে বসলো—তখন বোম্বাই বা বাংলাতে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল বৈকি? দেখা দিল তারপর 'নিশান' বা 'বাহার'। কিন্তু 'চন্দ্রলেখা' বা 'বাহার' তো মাদ্রাজ নয়, মাদ্রাজ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—তবে কি?

যাত্রা বা থিয়েটার দেখা যেমন কোন একদিন আমাদের দেশেও ছিল একটা হুজুগ, সে হুজুগের নেশাতেই আজও মেতে রয়েছে মাদ্রাজের দর্শক-সম্প্রদায়—এরা Technique-এর বিচার করে না—চিত্র-পরিচালনার মার-প্যাঁচ পছন্দ করে না,—Speed বা Tempo-র বীজ আজও এদের অন্দর মহলে প্রবেশ করে নি। এরা চায় পরিষ্কার স্বচ্ছ ঝকঝকে ছবি, দিন-রাত্রের বালাই নেই, সম্ভব-অসম্ভবের হদিশ নেই,—নাচে গানে ভরপুর সাড়ে তিন ঘণ্টার অফুরন্ত আনন্দের উৎস। পয়সা খরচ করে কেউ কাঁদতে রাজী নয়,—[illegible] এ দেশে [illegible] না, হলেও কি[illegible] বিয়োগান্ত নাটক এদে[illegible]

সারা ভারতের প্রায় তিন ভাগের দু'ভাগ চিত্রগৃহ রয়েছে মাদ্রাজে, কিন্তু আভিজাত্যের কোন গন্ধই নেই,—চাকচিক্যের কোনো রেষারেষি নেই—মাদুর বিছিয়ে ছবি দেখালেও সাধারণ দর্শকের কোন অভিযোগ নেই,—এখানকার বেশীর ভাগ দর্শকই অশিক্ষিত এবং ধর্ম্ম-ভীরু। তাই ধর্ম্মের নামেই ব্যবসা চলেছে এতদিন,—কিন্তু নূতন ক'রে ধর্ম্মগ্রন্থ লিখে নিয়ে ছবি তৈরী করতে হয়ত প্রযোজকেরাও নারাজ, অতএব বর্ত্তমানে সামাজিক গল্পের হিড়িক চলেছে তাও ছকে বাঁধা।

সাহিত্যের বালাই বিশেষ কিছু নেই, থাকলেও ব্যবহার করতে ভরসা পায় না, সুতরাং ধার করতে হয়। ধার করা অপরাধ নয়, এরা করে চুরি। অবশ্য ডাকাতি বললেও বেশী বলা হবে না। যে কোন হিন্দী ছবির বিশেষ কোন ভাল অংশ একমাত্র ভাষা বদল করে ছবিতে ব্যবহার করতে এরা ভয় পায় না বরং চুরি করার বাহাদুরীটা এদের স্বভাব-ধর্ম্ম। বলতে গেলে মাদ্রাজের চিত্রশিল্পের কাছে বোম্বাই-ই হলো একমাত্র আদর্শ। অবশ্য বাংলাকেও এরা শ্রদ্ধা করে, কিন্তু কাছে ঘেঁসতে ভরসা পায় না।

দেড় লাখ টাকার Production-এর কথা শুনলে হাঁ ক'রে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, ছ'মাসেও কোন ভাল ছবি তোলা যায় বলতে গেলে নিশ্চয়ই Return-ticket কাটতে বলবে। বছরের পর বছর ধ'রে এদেশে ছবির স্যুটিং চলে, পরিচালক বদল হয়, ষ্টুডিও পাল্টে যায়, 'হনুমানের লঙ্কা-দহন' গল্প সুরু ক'রে 'দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ' নামে ছবি বাজারে বেরোলেও আশ্চর্য্য হবার কোন কারণ থাকে না, এ প্রথাই এদেশে প্রচলিত।

মাদ্রাজের অলিতে-গলিতে হিন্দী ছবির গানের ছড়াছড়ি, সাধারণ পরিচালক বা প্রযোজকরা পছন্দমতো হিন্দী গানের রেকর্ড কেনেন। সঙ্গীত-পরিচালককে এই সুরে সুর বাঁধতে বলেন, সুরের ইজ্জৎ বজায় রাখতে কাহিনীকারকেও কাহিনীর মোড় ঘুরিয়ে দিতে হয়। নূতনত্বের কোন প্রেরণা এদেশের মাটিতে নেই, experiment এদেশের চিত্রশিল্পে নীতিবিরুদ্ধ।

ব্যবসায়-কেন্দ্রটি অত্যন্ত সুপ্রশস্ত, লাখ লাখ টাকা খরচ করে সুদীর্ঘ তিন, চার বা ততোধিক বছরে গৃহীত ছবি খারাপ হলেও ছবির পিছনে যা খরচ হয় সেই মূলধনের টাকাটা ঘরে ফিরে আসে,—আর ছবি ভাল হলে লাভের অংশ চারগুণ হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্যে এদেশের প্রযোজনা ক্ষেত্রে যে কোন ছবিতেই পরিবেশকদের কাছ থেকে অন্ততঃ তিন লাখ টাকা জোগাড় করতে কোন প্রযোজককেই ভাবতে হয় না; আর ভাবতে হয় না বলেই মাদ্রাজের অলিতে-গলিতে চিত্র-প্রতিষ্ঠানের ছড়াছড়ি।

আনুষ্ঠানিক কেতাদুরস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা এদের অত্যন্ত বেশী কিন্তু চিত্র-প্রযোজনার ব্যাপারে সুষ্ঠু পরিকল্পনা বলে কিছু নেই। ছবির স্যুটিং হচ্ছে, ছবির প্রোজেকশানও দেখা হচ্ছে, ভাল না লাগলে আবার রি-টেক হচ্ছে। শোনা যায়, 'চন্দ্রলেখা'র এক 'drum dance'-এর ছবি তুলতে ষাট হাজার ফিটেরও ওপর নেগেটিভ্ ফিল্ম এক্সপোজ্ করতে হয়েছিল।

একদিকে যেমন জনকতক প্রযোজক বা পরিচালক বর্ত্তমান চিত্রশিল্পের উন্নতির জন্য সত্যি ভয়ানকভাবে ভাবছেন, অন্যদিকে আবার এমন প্রযোজকও দুর্লভ নন যিনি বা যাঁরা বাজারে নামকরা ছবির সবক'টি সংস্করণের স্বত্ব কেনেন মোটা টাকার বিনিময়ে নিজে বা নিজেদের নামে, নূতন কর্ম্মী ও শিল্পীদের নিয়ে নূতন ব্যবসার ফন্দিতে প্রতিটি শট moviola অর্থাৎ চিত্র-সম্পাদনার যন্ত্রের সাহায্যে নিখুঁতভাবে অনুকরণ ক'রে আবার অন্য ভাষার ছবিতে তা চালিয়ে দেন—জেমিনীর 'সংসার' তার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

ছায়াছবির ব্যবসার হিসেবে তামিল ছবির বাজার অনেক বড়, কিন্তু রুচি বা সংস্কৃতির দিক থেকে তেলেগুরা অনেক বেশী প্রগতিশীল, আচার-ব্যবহারেও বাংলার সঙ্গে অনেকটা সামঞ্জস্য আছে। বাংলা দেশের বেশ কিছু সাহিত্য তেলেগু ভাষায় লেখা হয়েছে, কিন্তু শরৎ-সাহিত্যের আদর এখানে সবচেয়ে বেশী। গত ক'মাসে

কিছু কিছু বাংলা ছবি (পরিবর্ত্তন, জিঘাংসা, সমাপিকা) এখানে দেখানো হয়েছে, পছন্দও হয়েছে বেশ, কিন্তু এদেশে এ ধরণের ছবি চলবে কিনা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর আসে,—'আমাদের দর্শক আজও এতটা তৈরী হয় নি।'

কাজের ভীড় থাকা সত্ত্বেও এখানকার ষ্টুডিওর আবহাওয়া খুব শান্ত, কারণে অকারণে ক'লকাতার মতো এত discussion-এর হাট বসে যায় না, এমনকি অভিনেতা বা অভিনেত্রীরাও কাজে এসে কেউ কারো সঙ্গে বিশেষ কথা বলেন না, চিত্রগ্রহণের সময় 'সেট'-এ এসে দাঁড়ান বাকি সময়টা 'ফ্লোর'-এ চুপচাপ বসে কাটিয়ে দেন। ডাব বা সোডার প্রচলন এদেশে থাকলেও এদের ডাব খেয়েই সোডা খাওয়ার প্রয়োজন হয় না। ভোর ছ'টায় স্যুটিং আরম্ভ হওয়ার কথা থাকলে যেমন রাত তিনটের সময় চিত্রের নায়িকা রূপসজ্জা করতে আসার পাঁয়তারা কষেন না, তেমনি 'জনতা'-দৃশ্যের 'এক্সট্রা'রাও রাত বারোটা থেকে মেক-আপ সেরে নিয়ে ষ্টুডিওতে পড়ে পড়েই ঘুমোতে কোনো আপত্তি জানায় না। প্রায় সব ক্ষেত্রেই স্যুটিং-এর একদিন আগে. Properties দিয়ে 'সেট' সাজিয়ে রাখা হয়, কেননা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সময়ের এক মিনিট সময়ও এরা বাজে নষ্ট হতে দেয় না। অবশ্য চিত্রগ্রহণ করার সময় একই দৃশ্য বিভিন্ন কোণ (angle) থেকে এরা ক্যামেরা ব্যবহার করে, একই শটের বহু 'O. K.' Shot ছাড়াও 'Safety Take'-এরও কোন হদিশ থাকে না।

সমগ্র দক্ষিণ ভারতে মোট তেইশটি ষ্টুডিও আছে, এক মাদ্রাজ সহরেই পনেরোটি উন্নতধরণের যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত ষ্টুডিও বর্ত্তমান। প্রত্তিটি ষ্টুডিওতেই তিনটি Shift-এ কাজ করার খুব ভাল ব্যবস্থা রয়েছে,—ভোর ছ'টা থেকে একটা, ছুটো থেকে ন'টা এবং রাত সাড়ে ন'টা থেকে পাঁচটা। 'বাহিনী' অবশ্য এখানকার সবচেয়ে well-equipped, well-planned এবং well-organised ষ্টুডিও,—তারপরেই এ ভি এম ষ্টুডিও। জেমিনী ষ্টুডিও হিসেবে মন্দ নয়, তবে উপরোক্ত দুটির তুলনায় এত well-planned নয় এবং একটু সেকেলে ধরণের। নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম ও সুন্দর সাজানো-গোছানো ষ্টুডিও এদেশের লোকের একটা বিলাসিতা কিংবা ব্যবসায়ের একটা বিরাট চাল।

কিন্তু যে-দেশের ষ্টুডিওগুলি এত সুন্দর, এত উন্নত সে-দেশের চিত্রগৃহগুলি দেখলে কিন্তু সত্যই হতাশ হতে হয়। ষ্টুডিওর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহেরও যথেষ্ট উন্নতি হওয়াও বাঞ্ছনীয়। নয়তো চলচ্চিত্রের উন্নতির অনেকটা অবমাননা করা হবে। শুনতে হয়তো খারাপ লাগবে, এত বড় একটা শহরে একটিমাত্র শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত চিত্রগৃহ রয়েছে, তার ওপর সেখানে আবার মোট বসবার আসনের সংখ্যা মাত্র আড়াই-শো'। অবশ্য কলকাতার মতো এত আভিজাত্যপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ শুধু মাদ্রাজ কেন সারা ভারতে আর কোথাও নেই।

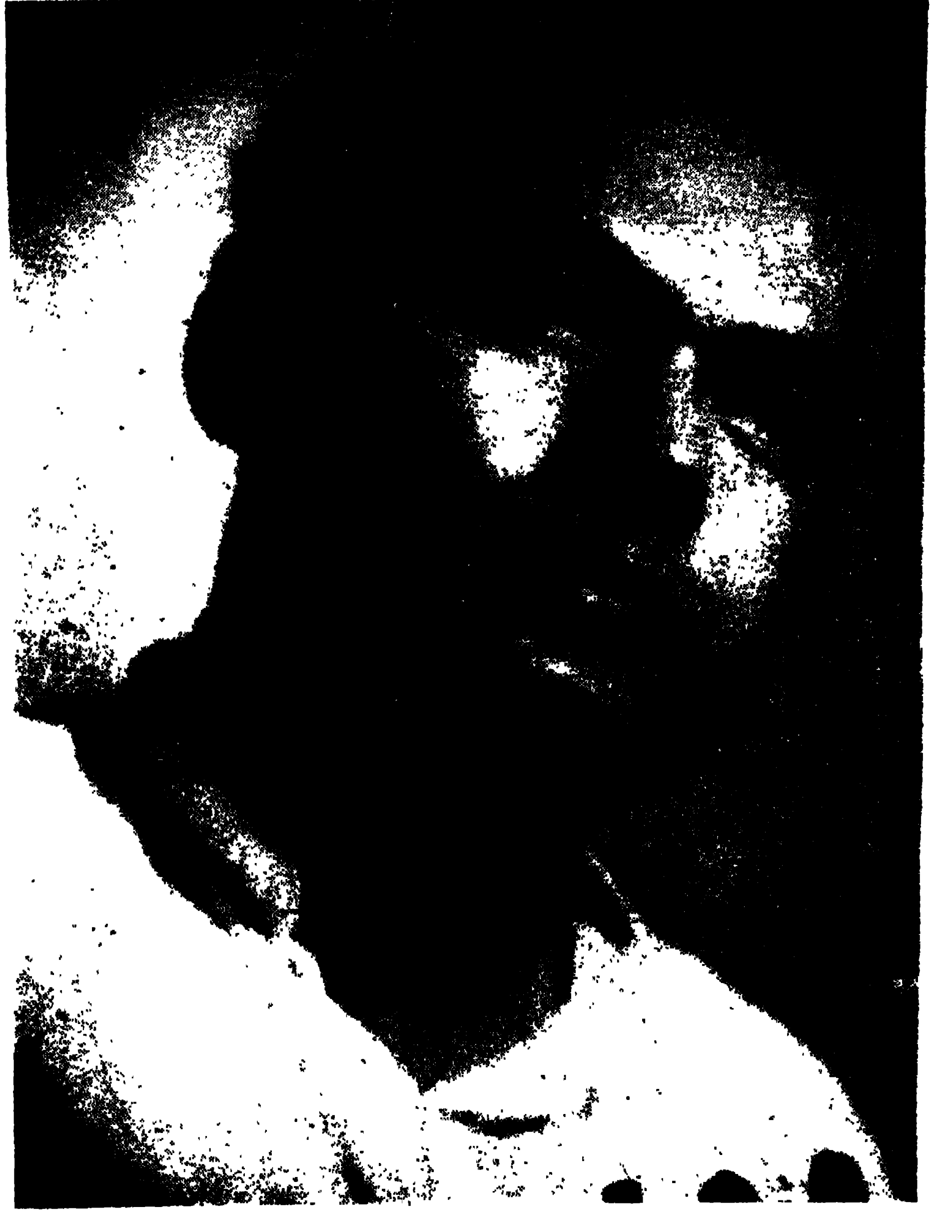
এখানে ষ্টুডিও প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক নিজস্ব চিত্র-প্রযোজনা ছাড়াও দিনের পর দিন ষ্টুডিওগুলিতে বাইরের প্রযোজকের ভীড়ও বাড়ছে। এমন বহু ষ্টুডিও এখানে রয়েছে যারা দৈনিক হাজার টাকা ভাড়া ও 'সেট'-এর ভাড়া বাবদ পৃথকভাবে টাকা নিয়েও প্রযোজকদের চাহিদামতো তাঁদের পরিকল্পিত দিনগুলিতে ষ্টুডিওকে প্রস্তুত রাখতে পারছেন না। তাইতো ভাবছি,—এত অর্থ, এত সুন্দর যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম, এত নিখুঁতভাবে সুসজ্জিত ষ্টুডিও এবং এত বড় ব্যবসাকেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও মাদ্রাজের চিত্রশিল্প আজও কেন চাতক পাখীর মত হাঁ করে বোম্বাই-এর দিকে তাকিয়ে আছে? অথচ এই স্বাচ্ছন্দ্যের বা সামর্থ্যের কিছুটা অংশও যদি বাংলা দেশের ভাগ্যে জুটতো, তাহলে বাংলার পরিচালক, প্রযোজক বা কর্ম্মীবৃন্দ শুধু ভারতবর্ষ কেন আন্তর্জ্জাতিক ছবির বাজারে ভারতের মর্য্যাদা, শিল্পানুভূতি ও সংস্কৃতিকে সুন্দরভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারতো।

সঙ্গীত-শিল্পী পরিচিতি

আলি আকবর খাঁ

কানপুর শহরে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন চলেছে। সন্ধ্যাবেলার কর্ম্মসূচীতে আছে—সঙ্গীত-অনুষ্ঠান। বলা বাহুল্য সে-অনুষ্ঠানে ভীড়ের অন্ত নেই। সম্মেলনের প্রতিনিধিরা তো আছেনই; উপরন্তু আছেন কানপুরের অগণিত নরনারী। কার জন্য এতো আগ্রহ, তা বুঝতে পারলাম স্বরোদ-এর সঙ্গীতচর্চার সময়।

তরুণ এক শিল্পী স্বরোদ বাজিয়ে চলেছেন; আর, তার সঙ্গে তবলা সঙ্গৎ করছেন স্থানীয় এক ভদ্রলোক। স্বরোদের সুরে আর তবলার সঙ্গতে সে এক অনির্বচনীয় সঙ্গীতের নির্ঝর বয়ে চলেছে সন্ধ্যাবেলাকার আনন্দ অনুষ্ঠানে। সমস্ত হল-ঘর নিস্তব্ধ। স্বরোদ-বাজিয়ের সঙ্গে তবলচী যেন আর শেষ পর্য্যন্ত পেরে ওঠেন না। উভয়ের মুখেই মৃদু হাসি। স্বরোদের তারে তারে চলে সুরের ঝংকার; তবলার তালে তালে সঙ্গতের সঙ্গতি। তেমন বাজনার পরিচয় পেয়েছিলাম আর একজনের কাছে। তিনি—স্বরোদের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। আশ্চর্য্য হলাম—কে, এই তরুণ শিল্পী, যিনি সেই গুণীর প্রায় সমস্ত কারুকার্য ও কলা-কৌশল অদ্ভুতভাবে আয়ত্ত করেছেন? বাজনা থামলে ঘোষকের কণ্ঠে উচ্চারিত হলো—'লক্ষ্ণৌ বেতার কেন্দ্রের স্বরোদ-শিল্পী আলি আকবর খাঁ সবশেষে আপনাদের আর একটি রাগ বাজিয়ে শোনাবেন।' আলি আকবর? অর্থাৎ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর পুত্র! হ্যাঁ, উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্রই বটে।



আলি আকবর খাঁ   ফটো : ভাইচু সান্যাল

ওস্তাদ আলাউদ্দিনের যে পঞ্চশিষ্য স্বরোদ-বাজনায় সারা ভারতে খ্যাতি [illegible] করেছেন, [illegible] দুজনের একজন হলেন—[illegible] আলি আকবর।

তাল ও ছন্দে আলি আকবর অসামান্য দক্ষতা লাভ করেছেন। সতেরোটি তারের সন্নিবেশে স্বরোদের সৃষ্টি। এই কঠিনতম বাদ্যযন্ত্রে দক্ষতা লাভ করা সহজ নয়। কিন্তু সাধকের কাছে কঠিন বস্তুও হয় সহজ, কাঠিন্যেও জাগে সারল্য, মাধুর্য। আলি আকবর শুধু স্বরোদ-শিল্পী ন'ন, স্বরোদ-সাধকও বটে। স্বরোদে পিলু-রাগ বাজিয়ে একবার বোম্বাই বেতার-কেন্দ্রের শ্রোতাদের তিনি যেভাবে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিলেন, আজও তা সঙ্গীত-অনুরাগীদের মানসপটে গভীরভাবে অঙ্কিত হয়ে আছে।

পূর্ব বাংলার ত্রিপুরা জেলার অধিবাসী হলেও, আলি আকবর বেশীর ভাগ সময়ই কাটিয়েছেন ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে।

১৯২০ সালে আলি আকবর যেদিন জন্মগ্রহণ করলেন, সেদিন মাইহার রাজ্যের দরবারে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-কে সকলেই শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন এই ব'লে যে, পুত্র যেন পিতার মতই যশের অধিকারী হয়। ওস্তাদ আলা-উদ্দিন তখন মাইহার দরবারের প্রধান-শিল্পী।

অতি শৈশবেই আলি আকবর পিতার কাছে বাদ্য-যন্ত্রের দীক্ষা নেন। প্রথম প্রথম তবলা ও পাখোয়াজ বাজাতেই তাঁর ভালো লাগতো। পাঁচ-বছরের ছেলের সঙ্গীতের প্রতি অদম্য উৎসাহ আর অসীম আগ্রহ দেখে গুণী পিতা পুত্রকে গ'ড়ে তোলবার সমস্ত দায়িত্বই গ্রহণ করেন। কৈশরের দিনগুলি আলি আকবরের কেটেছে গান শিখে। খেয়াল, ধ্রুপদ ও ধামারের পাঠ তিনি ভালোভাবেই গ্রহণ করেছিলেন সে-সময়। আজও তিনি চমৎকার গান গাইতে পারেন ; কিন্তু, গানের চেয়ে এখন বাজনার দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশী। স্বরোদ-ই তাঁর প্রিয় বাদ্যযন্ত্র।

ন'বছর বয়স থেকে কুড়ি বছর বয়স পর্য্যন্ত আলি আকবর তাঁর পিতার কাছে স্বরোদ শিক্ষা করেন। সুদীর্ঘ বারোটি বছর যে-সাধনায় তিনি লিপ্ত ছিলেন, তা কি কখনও ব্যর্থ হ'তে পারে? বারো ঘণ্টা থেকে আঠারো ঘণ্টা পর্য্যন্ত তিনি রোজ কেবল তান শিক্ষা করতেন। শিক্ষা-দানের সময় ওস্তাদ আলাউদ্দিন অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ। তাই দরকার বুঝলে সময় সময় পুত্রকে তিনি ঘরের বাইরে যেতে দিতেন না। ফলে, কঠিন শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে আলি আকবরের দিন কেটেছে।

আলি আকবর সঙ্গীত-যন্ত্রের একজন নিষ্ঠাবান গবেষক। উত্তর-ভারতের সঙ্গীত-যন্ত্রের সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গীত-যন্ত্রের সুরের সমন্বয় কিভাবে ঘটানো যায়, তার গবেষণা ক'রে আলি আকবর নতুন এক সুরের সৃষ্টি করেছেন। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রচলিত 'ঘরানা'য় যে-সব বিরোধ আছে, তা দূর করে তিনি একটি ঐক্যবদ্ধ সঙ্গীতকলার সৃষ্টি করতে চান। আলি আকবরের মতে সিনেমার সঙ্গীত ভারতীয় সঙ্গীতকলার প্রাচীন ঐতিহ্য ও মর্যাদাকে পদে পদেই ক্ষুণ্ণ করছে। তিনি বলেন যে, সিনেমার মাধ্যমেই ভারতীয় সঙ্গীতকলার প্রচার ও প্রসার হ'তে পারে যদি সেদিকে সঙ্গীত-পরিচালকরা দৃষ্টি দেন। অবিরাম চটুল সঙ্গীতের পরিবেশনা শুধু ক্ষতিকর-ই নয়, অমর্যাদাকর।

ভারতীয় বেতার-কেন্দ্রের সঙ্গীতানুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ ক'রে এক জায়গায় বলা হয়েছে—"বেতারকে কেন্দ্র ক'রে কোনো সঙ্গীতশিল্পী জীবিকা অর্জ্জন করতে পারেন না। কারণ, এদেশে শিল্পীদের

উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না এবং প্রতিভাধর শিল্পীর যোগ্য মর্যাদা দিতেও বেতার কর্তৃপক্ষ কুণ্ঠিত।...সঙ্গীত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ব্যক্তিরাই বেতারে সঙ্গীত কর্তৃপক্ষের পদ গ্রহণ করাতে শিল্পীরা তাঁদের কাছে মর্যাদালাভ করতে পারেন না।"

ভারতের সঙ্গীতশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলি আকবর অত্যন্ত আশা পোষণ করেন। কারণ, সঙ্গীতের সূক্ষ্ম স্বরবিন্যাসের দিক থেকে এদেশের সঙ্গীত-শিল্পীরা যে নতুন নতুন উন্মেষের পরিচয় দিয়েছেন ও দিচ্ছেন, তা এক বিরাট ঐতিহ্য রচনা ক'রে চলেছে। আলি আকবর বলেন যে, আন্তরিক নিষ্ঠা ও আগ্রহ থাকলে সাধারণ সঙ্গীতশিল্পীও একদিন তাঁর সাধনাবলে অসাধারণত্বের পরিচয় দিতে পারেন। সঙ্গীত-বিদ্যায়তনের প্রসারে সঙ্গীতের প্রসার হয় ঠিকই; কিন্তু, উচ্চাংগ-সংগীতের পারদর্শিতা লাভ ক'রতে হ'লে কোনো গুরুর কাছে কঠিন শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দীর্ঘকাল সাধনার প্রয়োজন—যেমন ক'রে স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীরা কোনো অধ্যাপকের অধীনে কোনো একটি বিষয়ে গবেষণার কার্যে নিযুক্ত থাকেন।

মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে ভারতীয় সঙ্গীত-যন্ত্রের ওপর আলি আকবর খাঁর যে দখল জন্মেছে তা সত্যই দুর্লভ। স্বরোদে তাঁর আলাপ ও খেয়াল, ঠুংরী, ধ্রুপদী প্রভৃতি রাগ-রাগিনীর কারুকার্য সম্বন্ধে তাঁর দক্ষতা একদিকে যেমন বিস্ময়কর, অন্যদিকে তেমনি বৈচিত্র্যময়। সম্প্রতি তিনি চিত্রজগতেও যোগ দিয়েছেন এবং 'আঁধিয়া' ছবিতে আবহসঙ্গীতে অপূর্ব্ব মাধুর্য সঞ্চার করেছেন।

তিমিরবরণ

স্বরোদ-সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-র কাছে স্বরোদ শিক্ষা ক'রে যে কয়েকজন গুণী সঙ্গীত-যন্ত্রশিল্পী সারা ভারতবর্ষে খ্যাতিলাভ করেছেন—তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হ'লেন—তিমিরবরণ। তিমিরবরণের খ্যাতি শুধু ভারতের মাটিতেই সীমাবদ্ধ নয়; ভারত ছাড়িয়ে তা ছড়িয়ে পড়েছে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যের দেশে দেশে। তিমিরবরণ শুধু স্বরোদ-শিল্পীই ন'ন। তিনি একজন বিখ্যাত ঐক্যতান পরিচালক। নানা কারণে আজ উদয়শঙ্কর ও

তিমিরবরণের নাম একসঙ্গে জড়িয়ে আছে। এক সময় এই দুই প্রতিভাধর শিল্পীর মিলন সংঘটিত হয়েছিল বলেই বোধ হয় উভয়ের ললাটেই পড়েছে বিশ্ববিজয়টীকা। উদয়শঙ্করের নৃত্য পাশ্চাত্য-দেশবাসীর কাছে যে সমাদর লাভ করেছে, তার কৃতিত্বের অনেকাংশের জন্য দায়ী তিমিরবরণের অর্কেষ্ট্রা পার্টি। আর, উদয়শঙ্করের সম্প্রদায়ে থাকার জন্যই তিমিরবরণেরও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়া



তিমিরবরণ

ফটো: কালীশ মুখোপাধ্যায়

সম্ভব হয়েছিল ইউরোপের দেশগুলিতে। উদয়শঙ্করের নৃত্যের ছন্দ আর তিমিরবরণের সঙ্গীত-যন্ত্রের ঝঙ্কার—একসঙ্গে যে সঙ্গীতের সৃষ্টি করে, তা শুধু বিস্ময়করই নয়, তা অভূতপূর্ব্ব, তা অনির্ব্বচনীয়।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে কলকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তিমিরবরণের জন্ম। তাঁর পদবী—ভট্টাচার্য্য। ছেলেবেলা থেকেই তিমিরবরণ সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্ত। তাঁর মায়ের মুখে সেকালের উচ্চাংগ সংগীতগুলি শুনে শুনে—তাঁর মনেও জাগে সঙ্গীত সাধনার আকাঙ্ক্ষা। তাঁর এক মাতামহ ছিলেন বিষ্ণুপুরের একজন প্রসিদ্ধ গায়ক। তাঁর কাছ থেকেও তিমিরবরণ সঙ্গীতশিক্ষার অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে যখন তিনি পড়াশোনা করছেন, তখনই তাঁর গানের কথা ছাত্রমহলে ছড়িয়ে পড়ে। মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রমশঃ সঙ্গীত-যন্ত্রের ওপর তাঁর নজর পড়ে। বারো বছর বয়সে তিনি বিখ্যাত বংশীবাদক রাজেন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ক্ল্যারিওনেট বাজাতে শেখেন। দীর্ঘ ছয় বছর ধরে ক্ল্যারিওনেট বাজনার সূক্ষ্ম কারুকার্য্যগুলি আয়ত্ত করেন।

এরপর তাঁর শিক্ষা শুরু হয় ওস্তাদ আমীর খাঁর কাছে। স্বরোদ-এর প্রথম পাঠ তিনি তাঁর কাছেই নিয়েছিলেন। তারপর ১৯২৫ সালে যান মাইহারে—, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর কাছে। এই তরুণশিল্পীর মধ্যে প্রতিভার পরিচয় পেয়ে আলাউদ্দিন তাঁর সমস্ত স্নেহ উজাড় ক'রে দিয়েছিলেন। তিমিরবরণ আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন তাঁর এই গুরুকে। তিনি বলেন—'তাঁর শিষ্যত্বলাভের সুযোগ পেয়েছিলাম বলেই জীবনে, কিছু শিখতে পেরেছি। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর কাছে আমি যে শিক্ষা পেয়েছি, তা-ই আমার শিল্পী-জীবনের পরম সঞ্চয়। স্বরোদ-বাজনার মধ্যে যে অনন্ত সৌন্দর্য্য লুকিয়ে থাকতে পারে, তা জেনেছি তাঁরই কাছে।'

তিমিরবরণ আজ স্বরোদ বাদ্যের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। ভারতীয় রাগ-রাগিনীর অপূর্ব্ব কলাকৌশল আয়ত্ত ক'রে তাকে স্বরোদের সতেরোটি তারের মধ্য দিয়ে তিনি যখন প্রকাশ করেন, তখন পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের প্রতিটি শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো ব'সে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দেশীয় সুরের সঙ্গে বিদেশী সুরের সমন্বয়-সাধনও তাঁর অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচায়ক। তাঁর স্বরোদ বাজনায়

সঙ্গীত লহরীতে মুগ্ধ হয়ে একদিন ইউরোপের বিখ্যাত গীটার-বাদক সিগোভিয়া বলেছিলেন—'তিমিরবরণের একক স্বরোদ-বাজনা যেন একটি পূর্ণাঙ্গ অর্কেস্ট্রা'। এর চেয়ে বড় অভিনন্দন আর কি হ'তে পারে!

উদয়শঙ্করের সম্প্রদায়ের সঙ্গে তিমিরবরণ যেবার ইউরোপের দেশগুলি পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন, সেবার একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল। হল্যাণ্ডে যাবার সময় উদয়শঙ্কর সম্প্রদায়ের মোট-ঘাটের বহর দেখে সেখানকার শুল্কবিভাগীয় কর্ম্মচারীরা মোটা শুল্ক দাবী করে বসলেন। তাঁদের সন্দেহ হয়েছিল, সব জিনিষপত্র তাঁদের ব্যবহার্য্য নয়, কিছু হয়তো বিক্রী করবার জিনিষও আছে। যত তাঁদের বোঝানো যায়, তত তাঁদের সন্দেহ বাড়ে। সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। হঠাৎ তিমিরবরণের মাথায় এক ফন্দী খেলে গেল। তিনি তাঁর স্বরোদের বাক্সটা খুলে স্বরোদটা তুলে নিলেন। তারপর তারে তারে সুরু হলো অপূর্ব্ব ঝংকার। ঘন্টাখানেক মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই বাজনা শুনে ওলন্দাজ শুল্ক-কর্ম্মচারীরা খুশিমনে তাঁদের অব্যাহতি দিলেন; যাবার সময় হাত নেড়ে জানালেন আন্তরিক অভিনন্দন।

আর একটি ঘটনা।

প্রাগ শহরের এক বিশিষ্ট দর্শকসমাবেশে উদয়শঙ্করের নৃত্য প্রদর্শন ঠিক হয়েছে কোনো এক সন্ধ্যায়। উদয়শঙ্করের নেতৃত্বে শিল্পী-সম্প্রদায় অনুষ্ঠানের আগেই এসে পৌছবেন লুক্সেমবুর্গ থেকে। স্বরোদশিল্পী তিমিরবরণ বহু আগেই প্রাগে পৌচেছেন এবং ব্যবস্থা ঠিক আছে কি না তা দেখছেন। সন্ধ্যা হয়ে এলো, তবু শিল্পীদের দেখা নেই। নির্দিষ্ট সময়ে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ দর্শকবৃন্দে ভ'রে গেল। তবু শিল্পীরা এসে পৌছলেন না দেখে তিমিরবরণ চিন্তিত, উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। দর্শকবৃন্দের মধ্যেও ঔৎসুক্য ও অধীরতা জাগলো।

তিমিরবরণ তখন স্বরোদখানি হাতে তুলে নিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করলেন। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে নিশীথ-রাত্রির নিস্তব্ধতা। তিমিরবরণের হাতে স্বরোদের তারে তারে তখন শুরু হয়েছে অপূর্ব্ব সঙ্গীত। পাষাণের বুক চিরে যেন কলশব্দে উচ্ছল তটিনী-ধারা বয়ে চলেছে তীরবাসীদের চমকিত ক'রে। দু'ঘণ্টা ধ'রে এইভাবে অগণিত দর্শকবৃন্দকে সুরের সুরা পান করিয়ে শান্ত ও তৃপ্ত রাখলেন—তিমিরবরণ। সেই সময় উদয়শঙ্কর তাঁর দলবল নিয়ে পৌঁছলেন। তাঁদের সাজ-পোষাক ক'রে নেবার জন্য আরও পনেরো মিনিট স্বরোদ বাজিয়ে শোনালেন তিমিরবরণ। অজস্র পুষ্প-স্তবকে অভিনন্দিত হলেন বাংলার এই তরুণ শিল্পী। পাশ্চাত্য দর্শকবৃন্দের মুখে একবাক্যে সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল—হ্যাঁ, বাজিয়ে বটে!

১৯৩০ সালে উদয়শঙ্করের সম্প্রদায়ে তিনি যোগ দেন বিখ্যাত ইম্প্রেসারিও স্বর্গতঃ হরেন ঘোষের মধ্যস্থতায়। তিমিরবরণ উদয়শঙ্করের নাচ দেখেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল এই নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে বাজাতে পারলে তাঁর সঙ্গীতযন্ত্রশিল্পের সাধনা সার্থক হবে। এতদিন ধ'রে তিনি যা শিখেছেন—তার প্রকাশের এই তো সুযোগ। তিমিরবরণ নিজের বাড়ীতেই তখন একটি চমৎকার অর্কেস্ট্রা-পার্টি গ'ড়ে তুলেছিলেন। সেই পার্টির বাজনা শুনে উদয়শঙ্করও বিস্মিত হ'য়েছিলেন।

উদয়শঙ্করের দলের সঙ্গীত-পরিচালকরূপে তিমিরবরণ বহুবার ভারতের বাইরে গেছেন। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক অনুষ্ঠানে তিমিরবরণ উদয়শঙ্করের মতই প্রশংসা পেয়েছেন—গুণী, জ্ঞানী ও মনীষীবৃন্দের কাছ থেকে। জেনেভাতে তিনি মহামনীষী রোমাঁ রোলাঁকে তাঁর স্বরোদ-বাজনা শুনিয়ে বিশেষভাবে আনন্দ দান করেন। হাইফেৎস, কুবেলিক, ক্রাইসলার প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পীদের সঙ্গে আলাপের সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন।

১৯৩৪ সালে উদয়শঙ্করের দল পরিত্যাগ ক'রে তিমিরবরণ স্বাধীনভাবে সঙ্গীতচর্চার কাজে মন দেন। সে-বছর তিনি যবদ্বীপে যান—রবীন্দ্রনাথের পরিচয়পত্র নিয়ে। সেখানকার প্রত্যেক অনুষ্ঠানে তিনি পেয়েছেন স্বতস্ফূর্ত অভিনন্দন। যবদ্বীপের সুলতান তাঁর সঙ্গীতবাদ্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এরপর তিনি যোগ দেন—নিউ থিয়েটার্সের অন্যতম সঙ্গীত-পরিচালকরূপে। 'বিজয়া', 'দেবদাস' (হিন্দী), 'পূজারিণী,' 'অধিকার', 'মীনাক্ষী' প্রভৃতি ছবিতে তিনি সুরশিল্পী হিসেবে কাজ করেন। মধু বসুর সি, এ, পি-সম্প্রদায়ের সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন বহুদিন। তাছাড়া, 'অভিনয়', 'কুমকুম', ও 'রাজনর্ত্তকী' ছবিতেও তিনি সঙ্গীত পরিচালনা করেন।

তিমিরবরণের অর্কেস্ট্রা আজও সারা ভারতে বিপুল-ভাবে অভিনন্দিত হয়। কিছুদিন আগে ক'লকাতা বেতার কেন্দ্রে তিনি যে-ভাবে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত-পাষাণ' গল্পটিকে সঙ্গীতযন্ত্রের মাধ্যমে প্রচার করেছিলেন, আজও তা অবিস্মরণীয় আছে সঙ্গীতানুরাগীদের কাছে।

রবীন্দ্রনাথের কথা উঠলেই, শ্রদ্ধার সঙ্গে তিমিরবরণ বলেন—'অমন শ্রোতা আমি দেখিনি। জোড়াসাঁকোর

বাড়ীতে তিনি যেভাবে দু'ঘন্টা ধরে আমার বাজনা শুনেছিলেন, আমার সঙ্গীত-সাধনার সেই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।'

রাধারাণী

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস—একদিন যে রাধাকৃষ্ণ-গীতিকা রচনা করেছিলেন, যুগ যুগ ধ'রেও তা গীত হচ্ছে বাংলার ঘরে ঘরে, ভারতের নগরী ও পল্লীতে। পদাবলী-সংগীতের ধারা আজও অব্যাহত আছে এদেশের সংগীত-শিল্পীদের অনুশীলনে, কীর্তনীয়াদের কণ্ঠে। বাংলার খ্যাতনামা গায়িকা রাধারাণী তাঁদেরই একজন।

কীর্ত্তন-গান বাংলার নিজস্ব সম্পদ। সুর ও তালের অতুল ঐশ্বর্যে কীর্তন-গীতিকা ঐশ্বর্যময়ী। উপযুক্ত সাধনা ছাড়া লোকে এই ঐশ্বর্যের সন্ধান পায় না। সাধারণ গ্রাম্য-বৈরাগী বা বোষ্টমদের গাওয়া কীর্ত্তনে এই ঐশ্বর্যের কোন দ্যুতিই ছড়ায় না; কিন্তু কীর্তন-সাধকের ভাবকণ্ঠে তা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়। সুধাকণ্ঠী রাধারাণী কীর্ত্তনের সেই ঔজ্জ্বল্যই প্রকাশ করে চলেছেন তাঁর প্রতিটি পদাবলী-গানে। কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে ও আন্তরিকতায় রাধারাণীর প্রতিটি কীর্ত্তন-গান শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করে ভাবসমাহিত করে।

বিংশ-শতাব্দীর প্রথম দশকে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ শহরে রাধারাণীর জন্ম। ভাগ্যের করুণ বিড়ম্বনায় খুব অল্প বয়সে তাঁকে রোজগারে বেরোতে হয় কীর্তন গেয়ে। ছোট্ট মেয়ের ললিত কণ্ঠের কীর্তনগান শুনে বহু লোকের চোখেই জল এসেছে। তাঁরা ভেবেছেন; ভক্তিমূলক সংগীতের এই ভাব ও সুর এত সহজে আয়ত্ত করলো কি ক'রে—নাবালিকা রাধারাণী।

রাধারাণী শুধু যে কীর্তন-গানেই নিপুণা, তা নয়; উচ্চাংগ-সংগীতেও তাঁর পারদর্শিতা বড় কম নয়। এক

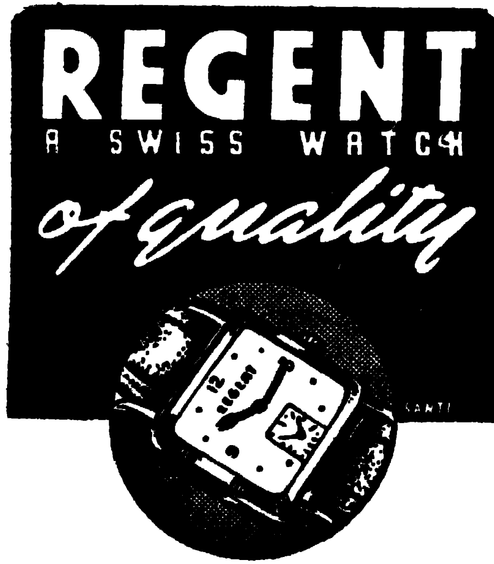


রাধারাণী

বৈষ্ণব-সাধকের স্নেহ-ছায়ায় ব'সে রাধারাণী যখন কীর্তন-গানের পাঠ নিচ্ছেন, সেই সময়েই মুর্শিদাবাদের নবাব-পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হওয়ার সুযোগ ঘটে। মুর্শিদাবাদের নবাব-পরিবার চিরদিনই গুণীর সমঝদার। তাঁরা রাধারাণীর গান শুনে এতই মুগ্ধ হন যে, তাঁকে ওস্তাদ মঞ্জু সাহেবের কাছে উচ্চাংগ সংগীত শেখবার ব্যবস্থা ক'রে দেন। ওস্তাদ মঞ্জু সাহেবের কাছে রাধারাণী ঠুংরী ও গজল গান শেখেন। কীর্তনের মতই ঠুংরী ও গজলে তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে ভবিষ্যৎ জীবনে।

মুর্শিদাবাদ ছেড়ে রাধারাণী এলেন ক'লকাতায়। এখানে আসায় কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হলো। একসময় তিনি—'রাধারাণী (রেডিও)' এই নামেই সংগীত-শ্রোতাদের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

বেতারের মাধ্যমে রাধারাণী সংগীত-শিল্পী হিসাবে যে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছেন তার তুলনা নেই। একবার বেতার-কর্তৃপক্ষ যখন বেতার শ্রোতাদের কাছ থেকে জানতে চান যে, তাঁরা মহিলা সংগীত-শিল্পীদের মধ্যে কাকে সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন, তখন রাধারাণীর ভাগ্যেই সবচেয়ে বেশী ভোট জুটেছিল।



সংগীতবিদ্যায় রাধারাণী যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তার একটা বিশেষত্ব হ'লো এই যে, যে-কোনো শ্রেণীর সংগীতেই তাঁর সমান দক্ষতা। কীর্তন, ঠুংরী, গজল বাদ দিলেও যাঁরা তাঁর ভজন, ভাটিয়ালী, ঝুমুর, পল্লীগীতি এমনকি আধুনিক গান শুনেছেন, তাঁরা নিঃসংশয়ে বলবেন যে—রাধারাণীর কণ্ঠে স্বয়ং বীণাপাণি বাস করেন।

বাংলার বাইরে ভারতের নানা জায়গায় গান গেয়ে রাধারাণী বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছেন। তার প্রধান কারণ, তাঁর কণ্ঠস্বরের ভাবসম্পদ, লালিত্য ও মাধুর্য; সেইসঙ্গে, তাঁর বিশুদ্ধ হিন্দী ও উর্দু উচ্চারণ।

ভারতবর্ষে গত চারবছরের মধ্যে যেসব নতুন বেতার-কেন্দ্র খোলা হয়েছে, তার কয়েকটি উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে রাধারাণী উদ্বোধন-সংগীত গেয়েছেন। এ সম্মান বড় কম নয়। দিল্লীর বেতার-কেন্দ্র বাঙালী-শিল্পীদের মধ্যে এই গায়িকাকেই সবচেয়ে বেশীবার দিল্লীতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। দিলীপ রায়ের একজন অনুরাগী ভক্ত হলেন রাধারাণী। এমনও হয়েছে যে, দিলীপ রায়ের গানের আসরে রাধারাণীকে উপস্থিত হ'তে দেখে, দিলীপকুমার বহুবার তাঁকেই বলেছেন একখানি কীর্তন গেয়ে আসরের উদ্বোধন করতে। রাধারাণীর কণ্ঠে 'কৃষ্ণ কথা কও' গানখানিই দিলীপকুমারের সবচেয়ে প্রিয়।

রাধারাণী বলেন—'এখনও আমার শিক্ষা সমাপ্ত হয় নি।' আশ্চর্য্য! কিন্তু, সত্যিই তিনি এখনও গান শিখছেন। কীর্তনগানে পরিপূর্ণভাবে পাণ্ডিত্যলাভ করবার জন্য তিনি শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য নামে এক কীর্তন-বিশারদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। গুরু-শিষ্যা মিলে সম্প্রতি একটি কীর্তন-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানও খুলেছেন।

অভিনেত্রী হিসাবেও রাধারাণী যশস্বিনী। রঙ্গমঞ্চের বহু নাটকে এবং ছায়াছবিতেও আমরা তাঁর পরিচয় পেয়েছি।

এ পর্য্যন্ত গত বিশ বছর ধ'রে তিনি গান গেয়েছেন প্রায় আড়াইশো গ্রামোফোন রেকর্ডে। তাঁর গাওয়া প্রথম কীর্ত্তন গানের রেকর্ডের একপিঠে ছিল 'কি মোহিনী জান বঁধু,' অন্যপিঠে ছিল 'ছি ছি মহারাজ'। সঙ্গীত-সম্বলিত ভূমিকায় তিনি নেমেছেন হিন্দী ও বাংলা উভয় ভাষার ছায়াচিত্রে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল—মানময়ী গার্লস্ স্কুল, কণ্ঠহার, কৃষ্ণসুদামা, রাঙা-বৌ, দেবযানী, চানক্য, প্রিয়বান্ধবী, দিক্‌শূল, রামানুজ, এ্যায়সা কেঁও, বাপ, বিচার, পরায়া ধন, পদ্মা প্রমত্তা নদী, মাইকেল মধুসূদন, তপস্যা, কুরুক্ষেত্র, মায়াকানন ইত্যাদি। 'মায়াকানন' ছবিটি পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়ার অসমাপ্ত ছবি এবং বর্ত্তমানে মুক্তি-প্রতীক্ষায় রয়েছে। ভূমিকাবর্জ্জিত হ'য়ে শুধু গান প্লে-ব্যাক করেছেন প্রথম এবং একমাত্র ছবি নিউ থিয়েটার্সের 'সৌগন্ধ' (হিন্দী)-তে চন্দ্রাবতী অভিনীত চরিত্রটিতে।

আজও তাঁর নতুন ক'রে শিক্ষালাভ ও সাধনার স্পৃহা তেমনি উদগ্র। বর্ত্তমানে তিনি সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে 'বৈতানিক' সঙ্গীত পীঠে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিখছেন। সম্প্রতি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে অনুষ্ঠিত অবনীন্দ্র-নাথের স্মৃতিসভায় জীবনে প্রথম রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়েছেন তিনি। যে গানখানি গেয়ে শ্রীমতী রাধারাণী এই অনুষ্ঠানে সমবেত রবীন্দ্র-সঙ্গীতানুরাগীদের পরিতৃপ্ত করেন তা' হোলো: 'এই তো ভাল লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়'।

রবিশঙ্কর

দিল্লীতে গণতন্ত্র দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন যে সব শিল্পী তাঁদের প্রত্যেককে মাত্র দশ মিনিট থেকে পনেরো মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত জনগণের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন সঙ্গীত সম্বন্ধে আনাড়ী। অব্যবস্থার জন্য দু-একজন শিল্পী বেশ বিরক্তি বোধ করছেন এমন সময় এক শিল্পী তাঁর সেতার যন্ত্রটি নিয়ে মঞ্চের ওপর হাজির হলেন। যন্ত্রে দিলেন ঝঙ্কার। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী চুপ ক'রে তাঁর অপূর্ব্ব বাজনা শুনতে লাগলেন।

ইনিই হলেন ভারতবিখ্যাত সেতারী রবিশঙ্কর। আধুনিক কালের উদীয়মান কৃতী সঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর বাজানোর মধ্যে শুধু যে গভীর স্নিগ্ধতা আছে তাই নয় তাঁর প্রয়োগ-পদ্ধতিও এত নিখুঁত যে তা কোন সমঝদার শ্রোতার কানই এড়িয়ে যেতে পারে না। উপস্থিত রবিশঙ্কর ঐক্যতানের সুর সৃষ্টির কাজে আত্মস্থ হয়ে আছেন। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে ঐক্যতান বাজনার সৃষ্টির কাজ বিশেষ অগ্রসর হতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমরা, ভারতীয়রা, জীবনের পথে এককভাবেই চলার পক্ষপাতী। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এখানেও একসঙ্গে বাজানোর চেয়ে এককভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করতে সকলেই চান। ঐক্যতান সম্বন্ধে এদেশের কয়েকজন সঙ্গীত-পরিচালক, বিশেষ করে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে, ঐক্যতানের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে ফেলেন। অজ্ঞতা কিংবা শুধু ঝঙ্কার ঝঙ্কার খানিকটা দেখিয়ে চমকে দেবার ভাব নিয়েই এমন সব বিভিন্নধর্ম্মী সঙ্গীতকে মিশিয়ে ফেলেন তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই যা কদাচিৎ মিশে। ছায়াছবির সঙ্গীত সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন যে সেগুলি সম্পূর্ণভাবে সঙ্গীতের সঙ্গতি-বর্জ্জিত, এমনকি সঙ্গীত পদবাচ্যই নয়।

যে ক'জন ভারতীয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকার সঙ্গীতেই সমান জ্ঞানের অধিকারী তাঁদের অন্যতম হলেন রবিশঙ্কর। আর তিনি এ দুইয়ের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করেছেন তাঁর সঙ্গীত সাধনায়।

রবিশঙ্করের জন্ম বারাণসীতে ১৯২০ সালে। প্রবাসে জন্ম হলেও রবিশঙ্কর বাংলাদেশেরই সন্তান। রবিশঙ্করের আদি নিবাস যশোহর জেলার কালিয়া গ্রামে। পিতা শ্যামশঙ্কর নিজে একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। যে-কালে কালাপানি পার ছিল প্রায় অপরাধ সেই সময় তিনি বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টারি পাশ করেন আর তারপর জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট অফ পলিটিক্স ডিগ্রী অর্জন করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য



রবিশঙ্কর

থাকেন। ১৯২৯ সালে মাত্র নয় বছর বয়সে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বনামধন্য উদয়-শঙ্করের নৃত্যসঙ্গী হ'য়ে ইউরোপ ভ্রমণকালে প্যারিসে যান এবং এর তিন বছর পরে আমেরিকায় যাবার সুযোগও তিনি লাভ করেন। এই সব ভ্রমণ-অনুষ্ঠানের মধ্যে তিনি প্রথমে তিমিরবরণের আর পরে বিষ্ণুদাস শিরালীর সংস্পর্শে আসেন। এঁদের

আর নৃত্য ও সঙ্গীতের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল অনুরাগ। ১৯২৩-২৪ সালে তিনি লণ্ডন সহরে সর্বপ্রথম তাঁর অগ্রজ উদয়শঙ্করের নৃত্যানুষ্ঠান করেন। পারিবারিক এই সঙ্গীতানুরাগ সহজাতভাবেই রবিশঙ্করকে সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। রবিশঙ্কর ছেলেবেলা থেকেই উদয়-শঙ্করের স্নেহ ও সহানুভূতি লাভ করে আসছেন। বয়োকনিষ্ঠ রবিশঙ্করকে উদয়শঙ্কর নিজের অর্কেস্ট্রাতে সেতার বাজানোর সুযোগ দিয়েছিলেন। শুধু যন্ত্রসঙ্গীত নয় রবি-শঙ্কর তখন থেকেই নৃত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হয়ে ওঠেন এবং উদয়শঙ্করের তত্ত্বাবধানে নৃত্য-শিল্পেও স্বীয় দক্ষতার পরিচয় দেন। ছোট বয়সেই তিনি তিরিশ রকমের সঙ্গীত আয়ত্ত করে ফেলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঁশী, দিলরুবা এবং হারমোনিয়াম বাজানোও শিখতে

দু'জনের মধ্যে কেউ না কেউ সঙ্গীত-পরিচালক হিসাবে উদয়শঙ্করের সঙ্গে যেতেন। যদিও রবিশঙ্করের কাজ ছিল অভিনয় এবং নৃত্যে অংশ গ্রহণ করা তবুও অবসর সময়ে সেতার বাজানোতেও তিনি বেশ আনন্দ পেতেন।

প্রতি বছরের মতো উদয়শঙ্কর ১৯৩৫ সালেও বিদেশে নৃত্য প্রদর্শনে গেলেন। সেবার তাঁর সঙ্গে ছিলেন মাইহার রাজ্যের ভারত-বিখ্যাত স্বরোদশিল্পী ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। তাঁর নজরে পড়লেন রবিশঙ্কর। তিনি রবিশঙ্করকে পরামর্শ দিলেন সেতার বাজনায় সাধনা করার জন্য। সেই থেকে রবিশঙ্কর পেলেন প্রচণ্ড উৎসাহ এবং সেতার বাজনাতেই একাগ্রচিত্ত হলেন।

এই একমুখী সাধনায় সিদ্ধিলাভে দুর্জয়সঙ্কল্প রবি-শঙ্কর ১৯৩৮ সালে গেলেন তাঁর পরমারাধ্য গুরু ওস্তাদ

আলাউদ্দিন খাঁর কাছে মুণ্ডিতমস্তকে যজ্ঞোপবীত ধারণ ক'রে। ওস্তাদজী তাঁকে বাহুবেষ্টনীতে আলিঙ্গন জানালেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁকে নৃত্যশিল্পী হিসেবেই দলে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রবিশঙ্কর দাদার সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলেও তাঁকে মাসিক ষাট টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হতো, আর তাতেই তিনি আহার ও বাসস্থানের খরচ সমাধা ক'রে যাচ্ছিলেন। দীর্ঘ একটানা একনিষ্ঠ সাধনা চলেছে, দিনে এমনকি ষোলঘণ্টা পর্য্যন্ত। সেতার বাজনার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ তখন তাঁকে সম্পূর্ণ পেয়ে বসেছে; তবুও দাদাকে খুশী করার জন্য তিনি গেলেন আলমোড়ার নৃত্যশিক্ষা কেন্দ্রে। সে শুধু দু'তিন মাসের জন্যে—বছর না ঘুরতেই আবার ফিরে এলেন মাইহারে। যন্ত্রশিল্পীর বিরামবিহীন সাধনা আবার সুরু হোলো কঠিন পণে, কঠিনতর ক্লেশস্বীকারে। এই সাধনায় সাড়ে ছ' বছর কাটলো গুরুগৃহে।

সংসারধর্ম্মের আর একটা দিকের সন্ধান তিনি পেলেন গুরুগৃহেই। ওস্তাদজীর কন্যা অন্নপূর্ণাকে তিনি আহ্বান জানালেন তাঁর সহধর্ম্মিণী হবার জন্য। অলক্ষ্যে দুজনেই উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। নামে অন্নপূর্ণা হলেও মেয়েটি মুসলমানের কন্যা আর রবিশঙ্কর হিন্দু। 'সিভিল ম্যারেজ' আইন অবলম্বন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু এ-ব্যাপারেও তাঁর গুরু ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ স্বাগত জানালেন, বললেন,—'তুমি আমার কন্যাকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রে বিবাহ করো। আমার কোনো আপত্তি নেই।' হলোও তাই, আর্য্য সমাজ প্রথানুযায়ী হলো তাঁদের বিবাহ।

এই সময় ওস্তাদজী চাইলেন তাঁর জামাতাবাবাজী যেন মাইহার রাজ্যেই প্রতিষ্ঠা পেয়ে থেকে যায়—যেমন তিনি নিজে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু রবিশঙ্করের উচ্চাভিলাষ সঙ্কীর্ণ স্থানে পোষ-মানা অবস্থায় থাকতে চায় না—তার চাই উন্মুক্ত অবারিত সুযোগ। বছরখানেক ভারত-ভ্রমণের পর ১৯৪৪ সালে তিনি সস্ত্রীক বোম্বাইতে গিয়ে সেখানেই বসবাস সুরু করলেন। সঙ্গীত-পরিচালক হিসেবে তিনি কৃতিত্ব দেখালেন 'আই-পি-টি-এ'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়া ইম্মরটাল' নৃত্যনাট্যে। তারপর চলচ্চিত্রজগতেও সঙ্গীত পরিচালনায় তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেল—'ধরতী-কে-লাল' এবং 'নীচানগর' ছবি দুটিতে। এর পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর 'ডিস্কভারী অব্ ইণ্ডিয়া' অবলম্বনে যে নৃত্য-নাট্যানুষ্ঠান হয় তাতেও তিনি সঙ্গীতাংশে সুর যোজনা করেছিলেন। এটি প্রথমবার অনুষ্ঠিত হয় 'আই-এন্-টি' প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এবং পরের বারে হয় 'ইণ্ডিয়া রেনেসাঁ আর্টিষ্টস্' সম্প্রদায়ের উদ্যোগে। এই সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন তাঁরই দুই ভাই দেবেন্দ্রশঙ্কর এবং রাজেন্দ্রশঙ্কর। এই সম্প্রদায় ভারতের সর্ব্বত্রই বেশ সাফল্যের সঙ্গে তাঁদের অনুষ্ঠান চালিয়ে যেতে লাগলেন।

বোম্বাই ছেড়ে তিনি এলেন দিল্লীতে। দিল্লীতে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে সঙ্গীত-পরিচালক হিসেবে কাজ করতে লাগলেন। এই বেতার কেন্দ্র থেকে বিদেশের উদ্দেশ্যে

যে বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশন করা হতো সেই অনুষ্ঠানের পরিচালন-ভার নিলেন তিনি। বেতার কেন্দ্র থেকে তিনি পারিশ্রমিক পান মাসিক এক হাজার টাকা। নিয়মিত স্থায়ী শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বোধ হয় এত মাহিনা পান। ঐক্যতান বাজনায় তাঁকে প্রতি মাসে চারটি ক'রে নতুন সুর দিতে হয়, তাছাড়া কয়েকখানি একক সঙ্গীত পরিবেশনও তাঁকে করতে হয়।

বাংলাদেশে সঙ্গীত সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েও রবিশঙ্কর স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে গেছেন। সঙ্গীত সম্মেলনে তিনি বাজালেন আলাউদ্দিনের সৃষ্ট 'হেমন্ত রাগ'। শুদ্ধ স্বরের এই রাগটিতে তিনি অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর সেদিনের বাজনায় বীণ, স্বরোদ ও সেতারের কাজের অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটেছিল। মীড়গমকের চমৎকারিত্বে আর তাললয়ের বৈশিষ্ট্যে তিনি সেদিন সকলের হৃদয় জয় করেছিলেন। এমন চমৎকার সুরেলা হাত ভারতে খুব অল্প শিল্পীরই আছে।

সংমিশ্রিত রাগ-রাগিণীর যে যে সুর আজ পর্য্যন্ত তিনি সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—'মোহন-কৌশ'—এটিতে মালকোশ রাগের কিছু অংশ আছে; 'গুঞ্জী-কানাড়া,' এর মধ্যে মালগুঞ্জী ও কানাড়া বা দরবারীর ছোঁয়াচ পাওয়া যায়--ঠিকমতো বলতে গেলে এই সুরটিকে 'হাঁস-কল্যাণ'ও বলা যায়; আর হলো 'তিলক-শ্যাম,' এর মধ্যে পাওয়া যায় তিলক-কামোদ এবং শ্যাম-কল্যাণ নামক দুটি রাগের সংমিশ্রণ।

তাঁর প্রিয় রাগ-রাগিণী হলো—দরবারী, কাফি, ভৈরবী এবং খাম্বাজ। ওস্তাদ আলাউদ্দিনের বিশেষভাবে সৃষ্টি করা 'জিলা' রাগের ঘরাণাও তাঁর খুব প্রিয় এবং ভক্তিমূলক আবেদনের জন্য 'মন্দ' রাগেও তাঁর খুব আসক্তি আছে।

তাঁর বাজনার পদ্ধতি অতি আধুনিক এবং শিল্পী-মাত্রেরই অনুকরণীয়। তাঁর স্বরবিন্যাসে একঘেয়েমী নেই। আলাপের রীতি সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যময়। তাঁর টিপের রীতিও নিজস্ব। তাঁর বাজনায় কখনো কসরতি বা পালোয়ানী মনোবৃত্তির পরিচয় প্রকট হয়ে ওঠে না। তাঁর বাজনা গমকে গমকে এক অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যময় জগতের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি সুরের সাধকই শুধু নন, তিনি সুরের স্রষ্টাও।

কেবলমাত্র ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত-কলাতেই তিনি পারদর্শী নন নৃত্য-সঙ্গীত রচনাতেও তিনি অপূর্ব্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। গত তিন বছর ধরে রবিশঙ্কর ভারতীয় রাগপ্রধান, হাল্কা ধরণের ও লোক সঙ্গীতের সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গতের উপযোগিতা নিয়ে গবেষণা করছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার উপাধি তাঁর সংগ্রহ করা হয়ে ওঠেনি সে শুধু তাঁর ঘুরে বেড়ানো এবং নৃত্য-শিল্পী হয়ে বিভিন্ন মঞ্চে অবতরণ করার জন্যই —আর এটা তিনি গোপনও করতে চান না। কিন্তু কয়েকটি ভাষার ওপর তাঁর বেশ দখল আছে। নিজস্ব মাতৃভাষা ছাড়া ইংরাজী এবং ফরাসী ভাষায় কথাবার্ত্তা তিনি অনর্গল সমানভাবেই বলে যেতে পারেন। হিন্দী ও উর্দ্দুও ভাল লাগে তাঁর এবং এই দুই ভাষার পুস্তকাদিও পড়তে পারেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য ও শরৎ-সাহিত্যকে তিনি অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করেন।

ভারতীয় ছায়াছবিতে "লোকপ্রিয়তা"র অজুহাতে যে-সব গান চালানো হয়, সে সম্পর্কে রবিশঙ্করের যথেষ্ট আপত্তি বিদ্যমান। তাঁর মতে, অশ্লীল দৃশ্যাদি সম্পর্কে এ-দেশের সেন্সর কর্ত্তৃপক্ষ যতখানি সজাগ, ভারতীয় চলচ্চিত্রের তথাকথিত "লোকপ্রিয়" সঙ্গীত সম্পর্কেও তাঁদের ঠিক ততখানি সজাগ থাকা উচিত। ভারতীয় চলচ্চিত্রের সঙ্গীত ঠিক কি ধরণের হওয়া উচিত, রবিশঙ্কর শুধু থিওরিতে নয়, কয়েকখানি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে কাজেও তার সুস্পষ্ট পথ নির্দ্দেশ করেছেন।

বেতার কেন্দ্র থেকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রচার সম্বন্ধে এক কথিকায় তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন—'সঙ্গীতের মধ্যে সত্যিকার যে প্রাণবস্তু তা' যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। আজকাল সঙ্গীতে এসে পড়ছে সস্তা মাদকতা ও চটুলতা; এর জন্য কিন্তু শিল্পী ও শ্রোতা উভয় দলই দায়ী—তাঁদেরই দুপক্ষের অনাদর অবহেলার জন্যই এই দুর্গতি সম্ভব হয়েছে।'

অন্তরালের সঙ্গীতশিল্পী

লতা মঙ্গেশকর

মেয়েদের মধ্যে প্লে-ব্যাক আর্টিস্টের নাম করলেই সব আগে নাম করতে হয় লতা'র। লতা দীননাথ মঙ্গেশকর (মঙ্গেশকর বা মুঙ্গেশকর নয়) আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ মহিলা-প্লে-ব্যাক আর্টিস্ট।

লতার বাবা ওস্তাদ দীননাথ মঙ্গেশকর মহারাষ্ট্রের একজন বিখ্যাত অভিনেতা, নাট্যকার ও সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন। মহারাষ্ট্রের 'বলবন্ত্ সঙ্গীতমণ্ডলে'র তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। গোয়া-সহরের কাছেই বহু পুরাতন 'মঙ্গেশ'-দেবতার মন্দির। সম্ভবতঃ সেই মন্দিরের কাছাকাছি কোনো গ্রামে ছিল মঙ্গেশকর-পরিবারদের বাস। আসলে কিন্তু এঁরা মহারাষ্ট্রীয়।

লতার বয়স যখন ছয়, তখন তাঁর বাবা স-পরিবারে কোলহাপুরের কাছে সংলি নামে এক জায়গায় উঠে যান। সে ১৯৩১-সালের কথা। তারপর থেকে একাদিক্রমে দশ বছর তাঁরা সেইখানেই বসবাস করেন। এইভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বাস-পরিবর্ত্তনের ফলে লতা ও তাঁর ভাই-বোনদের উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা হয় না। লতা-ই সবার বড়—তাঁর পরে তিন বোন আর এক ভাই। স্কুলের নিয়মিত পাঠের বদলে লতা তাঁর বাবার কাছে সঙ্গীতের নিয়মিত পাঠ নিতে থাকেন। তাছাড়া, তাঁর বাবা যে-সব নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন, তাতে বালক বা বালিকার কোনো ভূমিকা থাকলে লতাকে সেই ভূমিকায় অভিনয়ও করতে হ'তো।

লতার কণ্ঠস্বর ছেলেবেলা থেকেই মধুর। সেই কণ্ঠস্বরের নিয়মিত চর্চা হতো তাঁর বাবার কাছে। মিহি-গলায়, তাঁর সেই ছেলেবেলাকার গান শুনে সবাই বিস্মিত হতেন। দীননাথ মঙ্গেশকর ১৯৩৬ সালে যখন রঙ্গমঞ্চের পাট তুলে 'বলবন্ত্ পিকচার্স কর্পোরেশন' গঠন করলেন—লতাও তখন রইলেন সেই দলে। ছোট খাট ভূমিকাতে অভিনয়ও করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর বাবা বেশীদিন আর এভাবে খাটতে পারলেন না—তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হলো। তিনি পুণায় চ'লে এলেন—সেইখানে ১৯৪১-সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

লতার এবার পুরোপুরি কর্মজীবন। বাবা এমন কিছু রেখে যান নি—যাতে খুব স্বচ্ছলভাবে সংসার চলে। উপরন্তু ভাইবোনদের মানুষ ক'রে তোলার দায়িত্ব। তিনি 'নবযুগ পিকচার্সে' চাকুরী নিলেন। এঁদের 'পহেলী মঙ্গলা গৌড়' ছবিতে লতা একটি পার্শ্ব-চরিত্রে নামলেন। সে-অভিনয় ভালই লেগেছিল সবার—বিশেষ ক'রে তাঁর গান।

সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে লতা গেলেন কোলহাপুরে—বাবুরাও বিনায়কের কাছে। বাবুরাও তাঁকে 'প্রফুল্ল পিকচার্সে'র 'মজা বল্' ছবিতে একটি ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ দিলেন। তারপর থেকে (১৯৪৩-৪৭) বাবুরাও-এর প্রত্যেক ছবিতে (গজাভৌ, চিমুকলা, সৌন্সার, সুভদ্রা, জীবনযাত্রা) লতা অভিনয় করেছেন।

প্রত্যেকটি ভূমিকাই ছিল ছোট—আর, তাতে অভিনয়-দক্ষতা প্রকাশের সুযোগও ছিল কম। কিন্তু লতার তাতে দুঃখ ছিল না—কারণ, তাঁর প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল সংসার চালানো—উপার্জ্জনের দিকটাই ছিল তাঁর কাছে তখন বড়—নামের কথা চিন্তা করার অবকাশ তখন তাঁর ছিল না।

এই সময়ে ডাক এলো প্লে-ব্যাকের। লতার সুমিষ্ট গানের কথা তখন চিত্রজগতের জল্পনা-কল্পনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে! সঙ্গীত-পরিচালক রামচন্দ্র তাঁকে দিয়ে 'সানাই' ছবিতে প্লে-ব্যাক করালেন। তারপর—দত্ত দাওজেকরের 'আপ কি সেবা মেঁ'।

১৯৪৭-সালে বিনায়ক মারা গেলেন।

লতা তখন অভিনয়ের পথ ছেড়ে দিয়ে গানের পথই ধরলেন। ক্রমে পুরোপুরি 'professional play-back singer'।

বম্বে-টকীজের 'মজবুর' ছবিতে লতার গান-ই এনে দিল বিজয়মাল্য, ভবিষ্যৎ-জীবনের ভিত্তি হলো দৃঢ়তর।

যে-সব হিন্দী ছবিতে গান ক'রে লতা প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন—সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—[illegible] রে",

"জিদ্দী', "আনোখা প্যার", "আন্দাজ", "বরসাত", "পতঙ্গা", "মহল", "নাগিনা", "অমর ভূপালী", "আলবেলা"। একই ছবিতে বিভিন্ন নারীকণ্ঠের হয়েও লতাকে গান গাইতে হয়েছে কয়েকবার।

প্লে-ব্যাকের দিক থেকে মেয়েদের মধ্যে এখন সব-চেয়ে বেশী উপার্জ্জন করছেন লতা।

লতার ব্যক্তিত্ববোধ অসাধারণ। কখনও অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করবার প্রবৃত্তি নেই তাঁর। কোন বিষয়ে কখনও কোনো পরিচালকের সঙ্গে তাঁর মতের মিল না হলে—সেখানে তিনি কাজ করেন না—বেশী টাকা দিলেও না।

লতা নিয়মিত দেশী ও বিদেশী ছবি দেখেন। রান্নার দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁক। ভালো রাঁধতেও পারেন। লতা এখন পাকা গৃহস্থ। অবিশ্যি বিয়ে না করেই। বোম্বাই সহরের নানাচকের কাছে ছোট্ট বাড়িতে ভাই বোনদের নিয়ে তিনি থাকেন। চমৎকার সাজানো-গোছানো সে-বাড়ী। ইতিমধ্যেই তাঁর ছোট বোন আশা আর ভাই হৃদয়নাথ সঙ্গীতে পারদর্শিতা লাভ করেছে—অবশ্য তাঁরই শিক্ষায়। আশা ও হৃদয়নাথ এখন তাদের দিদির মতই প্লে-ব্যাক আর্টিস্ট হয়ে ছায়াছবিতে গান গাইছে।



লতা মঙ্গেশকর

গীতা রায়

গীতা রায় আর লতা মঙ্গেশকর দু'জনেই খুব নাম করেছেন প্লে-ব্যাকের দিক থেকে। জনপ্রিয়তার কথা তুললে লতার স্থানই প্রথম—কিন্তু, কণ্ঠমাধুর্যের দিক থেকে যেন গীতার সমাদরই বেশী। লতার গানে 'কাজ' বেশি, কিন্তু স্বরধারা যেন অতি তীক্ষ্ণ—ভাবের চেয়ে স্বরের প্রাধান্যই বেশি। আর, গীতার গানে তুলনায় 'কাজ' কম হলেও, স্বরের মধ্যে স্নিগ্ধতা আছে—স্বরের চেয়ে তার ভাবের প্রাধান্যই বেশি।

তেইশ বছর আগে পূর্ব্ববঙ্গের ইদিলপুরে গীতার জন্ম। তাঁরা ন' ভাইবোন—তিনি সপ্তম সন্তান। তাঁর বাবা শ্রীযুত ডি, এন্, রায়—বাংলা দেশ ভাগ হবার পর—বোম্বাইতে গিয়েই বসবাস করছেন। গীতা সেখানেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় দেবার সুযোগ পান—এবং অল্পদিনের

মধ্যেই সুনাম অর্জ্জন করেন। গীতা অনেকটা তাঁর নিজের চেষ্টা বা সাধনায় এতখানি সুনামের অধিকারিণী হয়েছেন। কারণ সঙ্গীতগুরু বলতে ঠিক যা বোঝায়, কোনদিনই সে-রকম গুরু তাঁর নেই। স্বভাবতঃই তাঁর গান আসে, গানকে তিনি ভালোবাসেন।

১৯৪৫-সালে তাঁদের পরিবারের এক বন্ধু তাঁর গান শোনেন—শুনে তাঁর খুব ভালো লাগে। তিনিই গীতাকে নিয়ে যান সঙ্গীত-পরিচালক হনুমান প্রসাদের কাছে। তিনিও গীতার গান শুনে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে 'বিষ্ণু সিনেটোন'-এর 'প্রহ্লাদ' ছবিতে একটি সমবেত-সঙ্গীতে এক লাইন একক-গানের সুযোগ দেন। প্রথম চেষ্টাতেই সফল হওয়া খুব সহজ নয়। কিন্তু সেই একটি লাইনই সবাইকে মুগ্ধ করে। গীতার প্রথম চেষ্টা সার্থক হয়। এই ভেবে সেদিন বোধ হয় গীতাও মনে মনে খুশি হয়েছিলেন। ছোট্ট এক কলি গানই গীতার পরবর্ত্তী জীবনের আলোক-বর্তিকা হয়ে থাকে।

এর পর, কত ছবিতেই যে গীতা অন্তরালের গায়িকা হয়ে ছায়াছবির দর্শক-শ্রবণকে পরিতৃপ্ত করেছেন তার হিসেব করা কঠিন। তিনি নিজেও তার হিসেব রাখেন না। তবে হাজার ছাপিয়ে গেছে বলেই তাঁর ধারণা। প্লে-ব্যাকে যত গান তিনি গেয়েছেন—তার মধ্যে তাঁর নিজের পছন্দসই গান গেয়েছেন—'দো ভাই', 'শহীদ', 'মজদুর', 'শবনাম', 'যোগন' আর 'বাজী'তে। নিজের বসবার ঘরের তাকে থরে থরে সাজানো থাকে তাঁর রাশি রাশি গানের রেকর্ড—অবসর সময়ে নিজের পুরানো গান বাজিয়ে শোনেন তিনি—যেমন, আমাদের দেশের সাহিত্যিকরা অবসর সময়ে ফাইল ঘেঁটে নিজের বহু-পুরানো লেখা পড়তে গিয়ে আনন্দ পান।

গানের নেশা এক—পেশা আর এক। পেশাদার গায়িকা হ'তে গিয়ে গীতার কি কম বিড়ম্বনা! রোজ প্রায় গোল ঘণ্টাই কাটে স্টুডিওতে স্টুডিওতে—কোথাও গানের 'রিহার্সেল', কোথাও 'টেক' বা 'রেকর্ডিং', কোথাও



গীতা রায়

বা নতুন ক'রে রেকর্ডিং অর্থাৎ 'রি-টেক'! যদিও উপার্জ্জনের অঙ্কটা সবার জানা নেই—তবু, লোকমুখে শোনা যায় মাসে গীতা কয়েক হাজার টাকা পান পারিশ্রমিক হিসেবে।

'প্লে-ব্যাক সিঙ্গার্স এ্যাসোসিয়েশন' ব'লে যে প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি গ'ড়ে উঠেছে গীতা তার সহ-সভানেত্রী। জলসার তালিকায় আজ তাঁর নাম দেখলেই প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে ওঠে। চ্যারিটি-শো'র উদ্যোক্তারা তাঁকে পেলে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন—কারণ, তাঁদের টাকা পুরোপুরি উঠে আসে গীতার গানের জোরে।

সুনামের বিড়ম্বনাও বড় কম নয়। ভক্তদের অসংখ্য পত্রাঘাতে গীতা আনন্দিতও হন যতখানি অস্বস্তিও বোধ করেন তার চেয়ে অনেক বেশী। কারণ আজকাল অধিকাংশ চিঠির মধ্যেই এক প্রশ্ন—'কবে নাগাদ বিয়ে করছেন?' ভক্তির এই কি নমুনা! কিছুদিন আগেও প্রশ্ন হতো—'কাকে বিয়ে করছেন?' কিন্তু, সেটা যখন একরকম ঠিক—তখন দিনক্ষণের জন্যেই যেন পত্রলেখকদের কৌতূহল। 'জাল' ও 'বাজী'-র চিত্র-পরিচালক গুরু দত্তের বাগ্‌দত্তা এখন গীতা রায়—শোনা যায়, কোষ্ঠীর ফলাফলের বিচারে তাঁদের বিয়ের দিন পিছিয়ে গেছে—১৯৫৩ সালের আগে তা সম্ভব নয়।



প্রিয় সম্পাদকভায়া,

সেদিন আমার বাঞ্ছারাম আমাকে একেবারে সিদ্ধপুরুষ ক'রে ছেড়েছিল। বাঞ্ছারামকে চিনলে না বুঝি? ও হরি, তাইতো বটে। চিনবে কি ক'রে? আমার নতুন বাহন। খাস শ্বশুর-বাড়ীর দেশের লোক। কোনো কিছু বাঞ্ছা করলেই, সঙ্গে সঙ্গেই বাঞ্ছাপুরণ! জল চাইলে গামছা এনে দেয়। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে—জল খেতে গেলেই হুজুরের জামায় জল গড়িয়ে পড়বার একটা অভ্যাস আছে—কাজেই, গামছাটা দিলাম গলায় জড়িয়ে রাখবার জন্য। কাজেই, বুদ্ধির ধারটা একবার ধারণা কর। এ-হেন বাঞ্ছারামকে সেদিন বলেছিলাম —'ওরে, একটু তরিবৎ ক'রে সরবৎ কর দিখিনি—খেয়ে শরীল-টা একটু শেতল করি!' তা হাঁদারাম আমাকে এমন খাট্টাই সরবৎ খাওয়ালে যে, চোখে এখনও কেবল হর্ষ্ণেনের ফোঁটা দেখছি! সিদ্ধি খাইয়ে ব্যাটা আমাকে একেবারে সিদ্ধপুরুষ ক'রে ছেড়েছিল সেদিন। সিদ্ধির জোরে উনপঞ্চাশ মিনিটের মধ্যেই একেবারে নরলোক থেকে ব্রহ্মলোকে!

ভায়া বলব কি ছাই। ব্রহ্মলোকের নন্দনকাননে তখন জৌলুসের ফোয়ারা! বিরাট গেট তৈরী হয়েছে—গেটের মাথায় প্লাষ্টিকের প্রকাণ্ড সাইন বোর্ড—তাতে উঁচু উঁচু অক্ষরে লেখা "NEW HOLY-WOOD FILM PRODUCTION"! মইরেচে মাকুন্দা—স্বগ্‌গে এসেও রেহাই নেই—এখানেও ফিল্ম! গেটের কাছে দরোয়ান-টরোয়ান কেউ নেই—কেবল একটা ষাঁড় ব'সে এক বিঁড়ে পান চিবুচ্ছিল। আমাকে দেখেই ব'লে উঠল—দিব্যি মানুষের গলায়—বাবার পেসাদ পেয়েছ যখন, আসতেই হবে! পেসাদের গুণ দেখ, স্ব-শরীরে স্বগ্‌গ লাভ!

বুঝতে আর বাকি রইলো না যে, ষাঁড়টি মহাদেবের আদি অকৃত্রিম বৃষভরাজ।

ষাঁড়বাবাজীর ল্যাজে একটা পেন্নাম ঠুকে বল্‌লাম "আপনি ত্রি-কালজ্ঞ মহাপুরুষ—আপনি ধ'রেছেন ঠিক! বাঞ্ছারামের কৃপায় বাবা ভোলানাথের কিঞ্চিৎ পেসাদ পেয়েছিলাম।"

—"তা বেশ! কিন্তু হাঁ ক'রে দেখছ কি? স্বগ্‌গ আর সে-স্বগ্‌গ নেই! নন্দনকাননে এখন ফিলিম উঠছে—দেখছ না—"New Holy-Wood Film Production"?

—"তা তো দেখছি, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছিনা।" ফিক্‌ ক'রে সেরখানেক পানের পিক ফেলে ষণ্ডরাজ বল্‌লেন—" Holy-Wood" বুঝলে না? পবিত্র-কানন! নন্দনকাননের ইংরেজী নাম। ইংরেজী ভাষা হাজার হ'লেও আন্তর্জাতিক ভাষা তো? আমরাও তাই ইংরেজীতে সাইন বোর্ড টাঙিয়েছি। New কথাটি বসাতে হয়েছে—Copy-right-এর ভয়ে। Hollywood আর Holly-Wood-এর অত তফাৎ কে বোঝে বল? কোনদিন আবার মার্কিন-সরকার ধাঁ। ক'রে International Court-এ Copy-right-এর মামলা জুড়ে দেয়, সেই ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য আমাদের প্রজা-তন্ত্রী-স্বর্গের প্রথম রাষ্ট্রপতি বিষ্ণুরাম-বাবু এই মতলব

ঠাউরে দিয়েছেন। আর শেষের দিকটা তো বুঝতেই পারছ হাজার হোক 'চিত্রবাণী'র সম্পাদক তো তোমার বন্ধু, তিনি তো সবই জানেন। Film Production তোমাকে আর কি বোঝাব?

যণ্ডরাজের কথায় সব জলের মত টলটল। স্বর্গরাজ্যও আর মান্ধাতা আমলের স্বর্গধাম নেই এখন প্রজাতন্ত্রী স্বর্গ। স্বয়ং বিষ্ণু প্রেসিডেন্ট। Film industry-র দিকে সবিশেষ জোর দিয়েছেন। উদ্দেশ্য, ছবির মারফৎ স্বর্গের হালচালটা জগৎকে জানিয়ে দেওয়া, সেইসঙ্গে নরধামের বস্তাকয়েক টাকা তুলে আনা। স্বর্গধামের Revenue নাকি আগের মত ঠিক আদায় হচ্ছে না। তাই, এঁরা Film industry মারফৎ, স্বর্গের Public Exchequer পাকাপোক্ত ক'রে ফেলতে চান।

খবর নিয়ে জানলাম—New Holy-Wood Film Productlon একটা limited company। মেম্বার-বর্গের মধ্যে আছেন কুবের শেঠ (Financier); ভোলা-নাথ শূলপাণি (Producer); দৈবকীনন্দন ঘোষ (Director); আর, গণপতি গজানন (Scenerist); টেকনিশিয়ানদের মধ্যে আছেন—চিত্রসেন গন্ধর্ব (Cameraman); মেঘনাদ লঙ্কাসুন্দরম্ (Recordist); (ইনি রাবণনন্দন হ'লেও মরবার পর স্বর্গে এসে আত্মশুদ্ধি ক'রে দৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছেন—অতএব দেবকুলে কল্কে জুটেছে!); বিশ্বকর্ম্মা গড়াই (Set-নির্ম্মাতা!); সত্য-নারায়ণ ঠাকুর (Editor) আর শুক্রাচার্য্য ঋষি (Laboratory-in-charge)।

যণ্ডরাজের নির্দ্দেশিত পথে সোজা ষ্টুডিওর মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। ঢুকতেই একজনের সঙ্গে ধাক্কা। ভদ্রলোক সামলে নিয়ে বললেন—"দুঃখিতম্! আপনি?"

সবিনয়ে নিজের ভিজিটিং কার্ডটা এগিয়ে দিলাম। ভদ্রলোক সসম্মানে একখানি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন—"বসুন বসুন! নরলোক থেকে এসেছেন, আপনি আমাদের গেস্ট! ওরে কে আছিস—বাবুকে এক কাপ গরম [illegible] দিয়ে যা!"

[illegible] নেই (সিদ্ধিতেই এত, না-জানি সোমরসে আবার কোন্ লোকে যেতে হয় সেই ভয়!) আমি এসেছি আপনাদের ছবি তোলা দেখতে!"

ভদ্রলোক বললেন—"তাতো বুঝতেই পারছি। চলুন তা হ'লে ছু'নম্বরে। সেখানেই আজকের সুটিং হচ্ছে।

—"ছবিটার নাম?"

—"স্বর্গ থেকে দূরে।"

—"কার লেখা?"

—"মহাকবি কালিদাসের অতিবৃদ্ধ প্র-পৌত্রের। বেড়ে লেখেন।"

—"বিষয়বস্তুটা সংক্ষেপে বলবেন একটু?"

—"কেন বলব না? এ-ছবির প্রচারই তো আমার কাজ। আমি এখানকার Publicity Chief—আমার নাম নারদেন্দ্র বারিন্দির!"

কী সর্ব্বনাশ! স্বয়ং নারদ মুনি! একেবারে চিনতেই পারিনি। চিনব কি ক'রে? 'মহাভারতে'র ছবিতে দেখা সে নারদ তো আর নেই—একেবারে ফিটবাবু! গায়ে হাওয়াইয়ান সার্ট, চোখে কালো চশমা, পরণে ট্রাউজার!

নারদেন্দ্র বারিন্দির মশাই সংক্ষেপে গল্পটা যা বললেন তার সারাংশ হলো—এক দেবকন্যা জনৈক মনুষ্যপুত্রের মহব্বৎ-মে গির পড়ি। কিন্তু মনুষ্যপুত্রকে ভালোবাসতেন এক রাক্ষসসুন্দরী। সেই রাক্ষসসুন্দরীকে আবার কামনা করতেন কস্মিন্ দেবস্য পুত্র। আবার সেই দেবকুমারের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন এক নরসুন্দরী!—কাজেই, ব্যাপারটি খুব জটিল! কিন্তু কালিদাসের অতি বৃদ্ধ প্র-পৌত্রের লেখনীর গুণে—কাহিনীটা শেষ পর্য্যন্ত মিলনান্তক-ই হয়েছে। দেবকন্যা, নরকন্যা, রাক্ষসকন্যা, আর দেবকুমার, নরকুমার রাক্ষসকুমার আপোষে স্থির করেছেন—বছরে দুটোমাস ক'রে ওঁরা এক একজনের সঙ্গে বিয়েতে বসবেন। অর্থাৎ—প্রথম দু'মাসে—দেবকন্যা + নরকুমার; নরকন্যা + রাক্ষসকুমার, আর, রাক্ষসকন্যা + দেবকুমার। দ্বিতীয় দু'মাসে—নরকন্যা + নরকুমার;

রাক্ষসকন্যা + রাক্ষসকুমার, আর, দেবকন্যা + দেবকুমার। তৃতীয় দু'মাসে রাক্ষসকন্যা + নরকুমার; দেবকন্যা + রাক্ষসকুমার; আর, নরকন্যা + দেবকুমার—এইভাবে permutation combination ক'রে যাও, ফলাফল সহজেই টের পাবে।

নারদেন্দ্র বারিন্দির হেসে বললেন—"কেমন লাগলো প্লটটা?"

—"খাসা! এরকম প্লট এ-যাবৎ দেখা যায়নি স্তর! আপনারা আমাদের বোম্বাইকেও টেক্কা মেরে গেলেন।"

—সত্যি বলতে কি, এই কাহিনী দিয়েই আমরা World Market লুটে নিব! দেখে নেবেন আপনি বারিন্দির ঠিক বলেছে কিনা—ছবি release হ'লে মিলিয়ে নেবেন। আমরা এ-ছবি তুলছি সংস্কৃত ভাষায়—কারণ সেটাই এখানকার State language। কিন্তু Heaven-এর জন্য ইংরেজীতে, আর বেহেস্তের জন্য উর্দ্দুতেও তোলা হবে।"

—"কিন্তু নরলোকের জন্য?"

—"সে ব্যবস্থাও আছে, নরলোকের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় Sub-title জুড়ে দেওয়া হবে। আপনাদের বুঝতে একটুও অসুবিধা হবে না।"

—"দয়া ক'রে যদি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নামটা বলেন স্তর!"—কৌতূহলভরে জিজ্ঞাসা করি।

—"নায়িকাদের ভূমিকায় আছেন—শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনী; দ্রৌপদীয়া মানবী; আর, প্রমীলা রাক্ষসী। নায়কদের ভূমিকায় আছেন—অর্জ্জুনকুমার, কৃষ্ণবরণ, আর, বৃত্রনাথ। তাছাড়া, বাপ মায়ের পার্টে—চিরকেলে বাপ—জনকদেব আর চিরেকেলে মা জননীদেবীও আছেন।"

—"কিন্তু, নায়ক ও নায়িকা তো আর একটা ক'রে নয়।"

—"তা হোক! আমরা একজোড়া জনক জননী

দিয়েই কাজ সেরে নিয়েছি! বেশী জনক জননী হ'লে নায়ক নায়িকার সংখ্যা যে আরও বেড়ে যাবে মশাই!"

যোক্ষম কথা! এর ওপরে বলবার কিছু নেই!

ছ'নম্বর ষ্টুডিওতে এসে আমরা থামলাম। বিরাট একটা সেটে বিরাট একটা নাচের দৃশ্য তোলা হচ্ছে। প্রচার কুশলী বারিন্দির ঠাকুর বললেন—"প্রথম ছ'মাসে যে বিয়ে—তাতে এই নাচটা আছে। নৃত্য-পরিকল্পনা করেছেন নটরাজ দিগম্বর স্বয়ং।"

স্বয়ং উর্ব্বশী নাচছেন সেণ্টারে। তাঁকে ঘিরে মেনকা রম্ভা, অরুণা, বরুণা, মুরলা প্রায় সাড়ে বত্রিশ ডজন Heavenly Dancer! বলব কি ভাই, নাচ দেখে মাথাটা বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরতে লাগলো। পায়ের কি ঠমক, চোখের কি চমক! বুকের কি উচ্ছ্বাস, ঘন ঘন নিঃশ্বাস! মুখের কি হাস্য, গালের কি লাস্য! পরণের সজ্জা—নেই লাজ-লজ্জা!

বারিন্দিরের কানে কানে বললাম—"নর্ত্তকীদের Costume-গুলি কিন্তু খাসা! এরকম ডিজাইন পেলেন কোত্থেকে এঁরা?"

—"এটা আমরা বোম্বে থেকে ধার করেছি। বুঝ-লেন না, Censor আছে তো? তাই আর খোলাখুলি-ভাবে Sex-appeal দেখানো সম্ভব নয়। ওটা পোষাক-আসাক আর অঙ্গভঙ্গীর মধ্য দিয়েই পুষিয়ে নেওয়া হয়েছে। বোম্বে এ জিনিষটা ভালো বোঝে!"

—"তা সত্যি। কিন্তু Censor-এর কথা বললেন--এখানে censor করেন কে?"

—"কেন, স্বয়ং যমরাজ। কাঁচি উঁচিয়েই আছেন। কিন্তু Sex-appeal জিনিষটা এমনই ছোঁয়াচে যে, এক বার চোখে লেগেছে কি মরেছেন। প্রথম উর্ব্বশী এক-খানা স্ফটিকস্বচ্ছ শাড়ি পরেই নাচছিলেন—কিন্তু যমরাজ বাগড়া দিলেন। বললেন—"দেখ বাপু এরকম নাচ pass করলে—[illegible]মার আর মান থাকবে না! তার চেয়ে বরং মোটা [illegible]নিষ পরে, শরীরের বাঁধুনিগুলো চোখা চোখা ক'রে [illegible] [illegible] appeal দেখিয়ে যাও—কিছু বলব না!" [illegible] Censor! Sex-appeal যত ইচ্ছে থাকুক ক্ষতি নেই—তবে একটু আড়ালে আবডালে—বুকের শাড়ি বুক থেকে পড়ব পড়ব ক'রবে, কিন্তু পড়তে পাবে না—এই রকম আর কি!"

—"আপনি বিচক্ষণ! ঠিক ধরেছেন।" বারিন্দির উর্ব্বশীর বক্ষ-হিন্দোলের দিকে 'তিরছী নজর'-টা রেখেই আমার কথার জবাব দেন।

আবার প্রশ্ন করি—"তা এ-ছবিটা কোন্ সার্টিফিকেট পাবে? A, না, U? অর্থাৎ Adult, না, Universal?

—"আমাদের এখানে তোলা ছবির একই সার্টিফিকেট। অর্থাৎ UA, মানে Universal Adult-দের জন্য। আসলে ছবি যখন অপ্রাপ্তবয়স্করা দেখবেই, তখন আর শুধু 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য'—এই ছাপ মেরে লাভ কি?"

একটা উপযুক্ত সমাধান! Censor-কর্ণধার যমরাজের দেখছি হেড-অফিসে কিছু বুদ্ধি আছে! কি বল তোমরা?

এর পর একে একে অনেক তথ্যই আবিষ্কার করলাম প্রচার-জেনারেল নারদেন্দ্র ঠাকুরের কাছ থেকে।

'স্বর্গ থেকে দূরে'—ছবিতে এঁরা গান রেখেছেন সবসুদ্ধ সাড়ে তেরোটি। মিলনের সময় কোনো গান নেই—গান আছে—খেতে বসার পূর্ব-মুহূর্তে, রোগীর নাভিশ্বাস ওঠবার ঠিক আগে, আর মরবার ঠিক পরেই। এগুলি Solo। আর, Chorus রাখা হয়েছে খেতে খেতে, নাক ডাকতে ডাকতে, আর অঙ্ক কষতে কষতে। সাত-খানি Solo, ছ'খানি Chorus আর দু'মাসের একটি মেয়ের মুখে আধখানা—হাপকাপ চায়ের মতো। স্বয়ং তানপুরাপাণি সরস্বতী একাই সব মেয়ের হয়ে playback করেছেন—আর, ছেলেদের হয়ে playback করেছেন বিদ্যাপতি ঠাকুর (বর্তমানে ইনি প্রথম স্তরের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের দেবতা)! সঙ্গীত পরিচালনা অবিশ্যি একজনের নয়—তাতে এঁরা অনেককে Chance দিয়েছেন। যথা: ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, কমলাবাহিকা পেচকরাজ, বাগ্দেবী-বাহিকা হংসরাজ কেউ বাদ যায় নি। সুরসৃষ্টিতে নাকি এঁদের কারো জুড়ি নেই—দেবদেবীর তাই অভিমত।

বারিন্দির বল্লেন—"এ রকম গান ফিলিম-ইতিহাসে এই প্রথম! দেখবেন—এর সব ক'টা গানই হিট্ হয়ে যাবে।"

—"সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই! তবে, 'লারে-লাপ্পা'কে যদি ডিঙিয়ে যেতে পারেন—তবেই যা ভরসা!"

—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমাদের এ-ছবির গান তার চেয়েও কড়া।"

—"কড়া পাকই ভালো—রসিয়ে রসিয়ে মালুম হয়!"

বারিন্দিরের কাছেই শুনলাম—শকুনি, দুর্বাসা, অষ্টাবক্র, আর মন্থরা, এ-ছবির villain-দের ভূমিকায় নেমেছেন। villainy-র গন্ধ একবার গায়ে লেগেছে বাবা, তখন কি আর সহজে যাবে!

ছবিতে হাসির কাতুকুতু দিয়েছে স্বর্গধামের মাণিক-জোর—নন্দী আর ভৃঙ্গী।

মোটকথা—হেন রস নেই যা এ-ছবিতে নেই। তার ওপর Multicolor-এ তোলা! কোথায় লাগে Technicolor?

বারিন্দিরের কাছেই জানতে পারলেম—খুব শীগ্গিরই এঁরা Heaven-এ গিয়ে ছবির প্রথম উদ্বোধন করবেন। এঁদের ধারণা, স্বর্গের চেয়ে Heaven-এর god-goddess-রাই ছবি বোঝেন বেশি! বলাবাহুল্য সে-উদ্বোধনে ছবির পরিচালক তাঁর নায়ক-নায়িকাদের নিয়েই উপস্থিত থাকবেন!

বাঞ্ছারামের সিদ্ধির জোরটা তখন কমে আসছিল—তাই তাড়াতাড়ি করতে চলো। কি-জানি শেষটায় ঘোর কাটলে বেঘোরে পড়ে যাই! অর্থাৎ, স্বর্গেই যদি থেকে যেতে হয় জলজ্যান্ত আমাকে। খুব ভয় হলো! একেই তো অতর্কিতে বাড়ী ছেড়ে এসেছি—শেষটায় সময়মতো ফিরতে না পারলে—একটা পারিবারিক অশান্তি! কাজ-কি-বাপু অত ঝামেলায়, এবারে মানে মানে স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে নরলোকে নামতে পারলেই হলো।

আমি তাই বিদায় নিতে গেলাম—Producer ভোলানাথ শূলপাণির কাছে। নারদেন্দ্র বারিন্দির introduce করিয়ে দিল—'চিত্রবাণী'র হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীমান্ ধুরন্ধর শর্মা—আর, ইনি আমাদের—"

সবিনয়ে বলি—"আর বলতে হবে না, বলতে হবে না—ওঁকে না চেনে কে?"

শূলপাণি একটু মুচকে হাসলেন। বল্লেন—"বারিন্দির, তুমি তো ছবির বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করেছ—তা একেই দিয়ে দাও না এক পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন 'চিত্রবাণী'র জন্য।"

—"আপনার আজ্ঞা পেলেই—"

—"হাঁ, দিয়ে দাও। একেবারে cover-টাই book ক'রে ফেল। Payment-এর জন্য যেন না ভাবে এরা ছবি release করলেই আমরা টাকা পাঠিয়ে দেব—মারা যাবে না, বুঝলে হে ছোকরা!"

ঘাড় নেড়ে বললাম—"বুঝেছি, আর বলতে হবে না স্যার মানে আপাততঃ কিছুদিনের জন্য (হয়ত বা চিরকালের জন্যই!) আশা ও ভরসাটাকে বাক্সবন্দী ক'রে রাখতে হবে—এই তো? সে আমাদের খুব অভ্যাস আছে।"

শূলপাণি আবার বললেন—"এই সঙ্গে ছবির একটা ছোট রাইট-আপ—দশ বারো পাতার মধ্যে লিখে দাও বারিন্দির—আর খান পঁচিশেক ছবি।

সেই রাইট-আপ আর ছবি, বাঞ্ছারামের হাতে তোমার কাছে পাঠালেন। দেবতাদের যদি না চটাতে চাও বন্ধু তাহলে গাঁটের কড়ি খরচ করে ব্লক করিয়ে ছেপে দাও—রাইট-আপ সুদ্ধু। বিজ্ঞাপনের টাকা পাও আর নাই পাও—স্বর্গে গিয়ে Press-Show দেখবার একটা নেমন্তন্ন নিশ্চয়ই পাবে। পাঁঠার দোকান করার পরামর্শ শোনোনি—এবারে ঠ্যালা সামলাও। ইতি

—ধুরন্ধর



বিশ শতকের নাট্যধারা

সুবোধকুমার ঘোষ



উনিশ শতকের শেষের দিকে আমাদের জাতীয় আন্দোলনে যেমন হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবনের ঝোঁক উঁকি-ঝুঁকি মারছিল, নাট্য-আন্দোলনেই তেমনি হিন্দুধর্ম্মের প্রবণতা ক্রমশঃ বাসা বাঁধতে চাইছিল। নাটক বিবর্ত্তনশীল সমাজেরই সৃষ্টি, সমাজ বিবর্ত্তনের পটভূমিতেই দানা বাঁধে নাট্যসৃষ্টির প্রচেষ্টা, নাট্য-আন্দোলন সামাজিক আন্দোলনকে তাই উপেক্ষা করতে পারে না। গিরিশচন্দ্র তাঁর অনেকগুলি পৌরাণিক ও ভক্তিরসাশ্রিত নাটক রচনা ক'রেছিলেন উনিশ শতকেরই শেষের দিকে।

ইতিমধ্যেই ব্যক্তিগত মালিকানায় কয়েকটি সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। বিশ শতকেও তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। এইসব নাট্যশালার মধ্যে প্রধান হিসেবে নাম করা যেতে পারে ষ্টার (১৮৮৩), মিনার্ভা (১৮৯৩) ও ক্লাসিকের (১৮৯৭)। ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হলেও মূলতঃ শ্রেষ্ঠ অভিনেতারই প্রাধান্য চলছিল এইসব নাট্যালয়ে। ষ্টার ও মিনার্ভা গিরিশচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় খোলা হয় বলে জানা যায় আর ক্লাসিক খোলা হয় অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অধ্যক্ষতায়।

নাট্য-আন্দোলনের তখন শৈশব অবস্থা। সবে সাধারণ নাট্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জাতির তৎকালীন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামকে রূপ দিয়ে তখন নাটকও রচিত এবং অভিনীত হয়েছে। জাতীয় আন্দোলন তখন সামাজিক বিবর্ত্তনের ধারার সঙ্গে তাল রেখে অগ্রসর হ'তে চেয়েছিল, অর্থাৎ শিল্প বিপ্লবোত্তর উৎপাদন ব্যবস্থার যে ধারাটি এখানে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল শাসকশ্রেণী এদেশের নবজাত বণিকশ্রেণী [illegible] নিয়েছিল আর মেনে নিয়েই সুরু [illegible]।

এই সময় [illegible] তান্ত্রিক বিবর্ত্তনের ধারার কাছাকাছিই চলতে চেয়েছিল, নতুন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গড়তে চেয়েছিল সমাজকে। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের কুসংস্কার, উচ্ছৃঙ্খল ইয়ং বেঙ্গলের অনাচারকে কষাঘাত ক'রে অত্যাচারের সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামে আর জাতীয় স্বাধিকারের প্রেরণা দিয়ে নাট্যধারা অগ্রসর হ'তে চাইছিল তখন। কিন্তু ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্ঘরূপ খর্ব্ব হয়ে, ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর জাতীয় নাট্যকার মাইকেল-দীনবন্ধুর মৃত্যুতে (১৮৭৩) শিশু নাট্যশালা অবসন্ন হয়ে পড়ল, গীতিনাট্য, রঙ্গনাট্য ধাঁচের নাট্যাবলী এগিয়ে এল নাট্যধারাকে ঠেকা দিতে। নাট্যকার হিসেবে গিরিশচন্দ্র দেখা দিলেন এই সময়েই (১৮৭৭)। নাট্যশালা ও নাট্যধারা আবার প্রাণ পেল।

কিন্তু জাতীয় আন্দোলন যেমন পা বাড়ালো হিন্দু পুনরুজ্জীবনের পথে, ধর্ম্মভাবও ঠিক তেমনি উপছে পড়ল নাট্যধারায়। সমাজের স্বাভাবিক বিবর্ত্তনের ধারা থেকে জাতীয় আন্দোলনের ধারা যেমন দূরে সরে গেল, তেমনই দূরে সরে যেতে চাইলো নাট্য-আন্দোলনের ধারাও। প্রধানতঃ মিলিত হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি এই বাঙলাদেশে হিন্দুত্বের রঙেই রঞ্জিত হ'ল যেমন জাতীয় আন্দোলন, তেমনই নাট্য-আন্দোলন।

কিন্তু ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধভাবে হ'লেও যখন গণবিক্ষোভ ফেটে পড়ল, জাতীয় আন্দোলন যখন গণতান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহ ক'রল তখন হিন্দুত্বের আবরণেও গুণগত পরিবর্ত্তন দেখা দিল জাতীয় আন্দোলনে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের প্রতি যে আপোষ-হীন মনোভাব জাতীয় নেতাদের একাংশকে পরিচালিত ক'রেছিল হিন্দুপুনরুজ্জীবনের দিকে সেই আপোষহীন মনোভাবই সংগঠিত রূপ নিল এই গণবিক্ষোভে, বিদেশী বর্জনে আর কংগ্রেসের (১৯০৬) স্বায়ত্বশাসনের প্রস্তাবে, পিছু হটতে বাধ্য করলো সাম্রাজ্যবাদী শাসককে (১৯১১)।

নাট্যশালার কর্ণধাররা, নাট্যকাররা নতুন প্রেরণা পেলেন এই আন্দোলনে। গিরিশচন্দ্র ছাড়া ইতিমধ্যেই

নাট্যকাররূপে দেখা দিয়েছেন অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ। অমরেন্দ্রনাথ দত্তও নাটক লিখতে সুরু করেছেন। গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা', 'মিরকাশিম', 'ছত্রপতি শিবাজী' (যথাক্রমে ১৯০৫, ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালে রচিত), অমৃতলাল বসুর 'সাবাস বাঙ্গালী' (১৯০৫), ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' (১৯০৩) 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৬) ও 'নন্দকুমার' (১৯০৭), দ্বিজেন্দ্রলালের 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫) 'দুর্গাদাস' (১৯০৬) ও 'মেবার পতন' এবং অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'বঙ্গের ব্যবচ্ছেদ' (১৯০৫) রূপকনাট্য বর্ত্তমান শতকের প্রথম দশকে জাতীয় ভাবের স্বার্থক উদ্দীপনায় জাতীয় আন্দোলনকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছিল নাট্যশালা থেকে। জাতীয়তার উদ্বোধনে সবচেয়ে বেশী সাড়া জাগিয়েছিল বঙ্গভঙ্গের পূর্ব্বে লেখা ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য'। হিন্দু-পুনরুজ্জীবনবাদী চরমপন্থী জাতীয় নেতাদের স্বাধিকারের সংগ্রামে 'প্রতাপাদিত্যে'র দান স্বীকৃত হয়েছে শ্রদ্ধার সঙ্গে। 'নাট্যমন্দির' (চৈত্র, ১৩১৮) পত্রিকায় প্রবন্ধকার শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু বলেন,—"ষ্টার রঙ্গমঞ্চে 'প্রতাপাদিত্য' অভিনয়ে প্রথমে জনসাধারণ মাতৃভূমিকে মা বলিয়া চিনিল—স্বদেশকে পূজা করিতে শিখিল।" এরপর বঙ্গভঙ্গের তীব্র গণ-আন্দোলন গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্ম-প্রাণ নাট্যক্ষেত্রেও জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক নাটকের স্থান ক'রে দিল, জাতীয়তাবাদী আবেদনে মৌলিক ঐতিহাসিক নাটক রচিত হ'তে লাগলো একের পর এক, জাতীয় গীতিকবি দ্বিজেন্দ্রলালও হয়ে উঠলেন পুরোপুরি স্বদেশী ভাবোদ্দীপক নাটকের লেখক। সিরাজের মুখে —"হিন্দুমুসলমান এক স্বার্থে বাংলায় আবদ্ধ, সে স্বার্থের বিঘ্ন হবে না। বঙ্গবাসীর পরিবর্ত্তে বঙ্গবাসীই কার্য্যভার প্রাপ্ত হবে।......কিন্তু স্থির জানবেন, ফিরিঙ্গি বাঙ্গলার দুশ্‌মন" প্রভৃতি সংলাপ শুনে কে বলবে, ধর্ম্মপ্রাণ গিরিশচন্দ্র শুধু ভক্তিরসেরই বন্যা বইয়ে দিতে চান নাটকে? গিরিশচন্দ্রের উপর্য্যুপরি তিনখানি নাটকের প্রচার ও অভিনয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী ক'রেছিল সাম্রাজ্যবাদী সরকার, নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল ক্ষীরোদপ্রসাদের 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' আর 'নন্দকুমার'-এর ওপর, পুলিশী সেন্সর চালিয়েছিল 'প্রতাপাদিত্যে'। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলনে এদের শক্তিশালী অবদান শত্রুপক্ষও স্বীকার করেছে।

এই সময়কার সামাজিক নাটকেও জাতির দুর্ব্বলতাকে মুছে ফেলে শক্ত সবল জাতি গঠনের নির্দ্দেশ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। জাতীয় জীবনের কদর্য্যতা ও কুসংস্কারকে তীব্র কষাঘাত করে, তাদের নগ্নরূপ তুলে ধ'রে জাতির অগ্রগতির পথে বাধা সরিয়ে ফেলতে আহ্বান জানিয়েছেন নাট্যকাররা। পণপ্রথার কুফল ও সামাজিক গ্লানি বিশ্লেষণ ক'রে গিরিশচন্দ্র রচনা করেছেন 'বলিদান' (১৯০৫), আর বিধবা-বিবাহ সমস্যা নিয়ে রচনা ক'রেছেন 'শাস্তি-কি শাস্তি' (১৯০৮)। দ্বিজেন্দ্রলাল ও অমৃতলাল রচনা ক'রেছেন এই ধরণের অনেক নাটক ও প্রহসন। অমৃত-লালের 'খাসদখল' (১৯১২) 'নবযৌবন' (১৯১৩) আর দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গনারী' (১৯১৬) সে-যুগের উল্লেখযোগ্য সামাজিক নাটক।

কিন্তু যেমন ঐতিহাসিক নাটকে তেমনই সামাজিক নাটকে এই জাতীয় ও সমাজগঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে এসময়-কার মূল সুর ছিল না। ঐতিহাসিক ও জাতীয়তাবাদীনাট্য রচনার তুলনায় আমরা দেখতে পাই, পৌরাণিক, ভক্তি-রসাত্মক আর কাল্পনিক বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা হয়েছে অধি-কাংশ নাটক, কেবল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের স্বাদেশিকতায় নাট্যসেবী ও নাট্যশালা চুপ করে থাকতে পারে নি তাদের ও তাদের শ্রেণীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগের জন্য। নাট্যক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র পুনরুজ্জীবনবাদী পথ বেয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন হিন্দী আধ্যাত্মিকতার ভক্তিমার্গে তাঁর 'সৎনাম' (১৯০৪) নাটকের ভক্তিরস স্বদেশপ্রেমের আড়ালে থেকেও অপর সম্প্রদায়কে ক্ষুব্ধ ক'রেছিল। হিন্দুর এই সামন্তযুগীয় আধ্যাত্মিকতা ধনতান্ত্রিক যুগের গণতন্ত্রের বিকাশের পথে এক প্রবল বাধা। তবুও পৌরাণিক ও [illegible] র্থক, সাধারণ মানুষ যা[illegible] নাট্যশালার সঙ্গে পরিচি[illegible] যোগ[illegible]

লেগেছিল। কিন্তু সমাজ বিবর্ত্তনের পরিপ্রেক্ষিতে নাট্য-বস্তুকে রূপদিয়ে বা জাতীয় আন্দোলনের উন্নত পর্য্যায়ের সন্ধান দিয়ে কোনও নাটক আর রচিত হতে পারে নি। বিশেষ করে হিন্দু সমাজের প্রতি অমৃতলালের রক্ষণশীল মনোভাব ইয়োরোপীয় ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সবকিছুর প্রতিই যেন বিরূপ করে তুলতে চেয়েছিল আমাদের। এমনকি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমি যে প্রেরণা দিয়েছিল নাট্যকারদের, আন্দোলনের পরিসমাপ্তিতে তা' যেন স্তিমিত হ'য়ে গেল, যেন সাময়িক উত্তেজনার পর অবসাদ এল আমাদের নাট্যজীবনে।

অবশ্য, এসময়কার সব নাট্যকারের আদর্শই অবিকল এক ছিল না। গিরিশচন্দ্র তাঁর 'পৌরাণিক নাটক' নামক প্রবন্ধে বলেছেন,—'হিন্দুস্থানের মর্ম্মে মর্ম্মে ধর্ম্ম, মর্ম্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্ম্মাশ্রয় করিতে হইবে।' গিরিশচন্দ্রের নাট্যাদর্শই এই। তাই, তাঁর ঐতিহাসিক নাটকও ভক্তিরস ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব থেকে মুক্ত নয়, এমন কি ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত 'বুদ্ধদেবচরিত' (১৮৮৫) সম্পূর্ণ পৌরাণিক নাটকের আঙ্গিকে রচিত। তাঁর ব্যক্তিজীবনের পরিবেশও ছিল ধর্ম্মের পরিবেশ, আধ্যাত্মিকতার পরিবেশ। কিন্তু ইয়োরোপীয় সভ্যতায় শিক্ষিত বিলেত ফেরৎ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস করতেন না। 'মানব বুদ্ধির অতীত যে সকল অতীন্দ্রীয় এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে সহজাত সংস্কার বা পরিবেশ প্রভাবে, সচরাচর হিন্দু সন্তানের মনে একটা বিশ্বাস ও ধারণা বিদ্যমান দেখা যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল তৎ-সমূহে তিলমাত্রও আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেন না'—(দেবকুমার রায় চৌধুরী)। গিরিশচন্দ্রের যুগে নাটক রচনা ক'রেও দ্বিজেন্দ্রলাল যুক্তিবাদ ও বস্তুনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন নাট্য বস্তুতে, তাই তাঁর পৌরাণিক নাটকেও অন্ধ ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে নি। বিবর্ত্তনশীল সমাজের ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পটভূমিতে তিনি নতুন মানবীয় রূপ দিতে চেয়েছিলেন পুরাণের চরিত্রগুলিকে। তাই কারও কারও মনে হয়েছে,—'পৌরাণিক চরিত্রকে স্বেচ্ছামত নূতন করিয়া গড়িতে গিয়া তিনি অনেক সময় ঔচিত্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন'—(অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু)। ক্ষীরোদপ্রসাদ ছিলেন এদের মাঝামাঝি। তিনিও বুঝতেন,—'নাট্যকলার উন্নতির সঙ্গে জাতীয়-জীবন যেন অনেকটা জড়িত'—(নাট্যমন্দির, শ্রাবন ১৩২৭)। কিন্তু ভক্তিবাদ ও আধ্যাত্মিকতা থেকে তিনি মুক্ত ন'ন। তথাপি অখণ্ড ভক্তি তাঁর নাটকে প্রতিষ্ঠা পায় নি। তাঁর শেষের দিকের (অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের পরে রচিত) পৌরাণিক নাটকগুলিতে যুক্তিবাদও উঁকিঝুঁকি দিয়েছে।

এই নাট্যধারার প্রবাহে নাট্যশালাগুলিরও একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। আগেই বলা হয়েছে, নাট্যশালাগুলিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলেও মালিকরা প্রধান অভিনেতাদের ওপরই নির্ভর করতেন। বস্তুতঃ এই সময় প্রধান অভিনেতাদের বেশ একটু সুবিধাজনক অবস্থানই ছিল। গিরিশচন্দ্র একাধারে ছিলেন প্রধান অভিনেতা ও নাট্যকার। প্রধান অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ নাট্যকার হিসেবে শক্তিশালী ছিলেন না, প্রহসনকার অমৃতলাল নাট্যাধ্যক্ষ ছিলেন বটে, অপর নাট্যকারের ওপর নির্ভরশীলতা তাঁর কম ছিল না। তাই, নাট্যশালাগুলিতে নাট্যধারা নিয়ন্ত্রণে গিরিশচন্দ্রের বিশেষ একটা সুবিধা ছিল। গিরিশচন্দ্র নিজে যখন জাতীয়তামূলক নাটক লিখেছেন সে সময় সাধারণভাবে প্রায় সব নাট্য-শালাতেই একখানি দুখানি জাতীয়তাবাদী নাটকের অভিনয় হয়েছেই, কিন্তু পরক্ষণেই গিরিশচন্দ্র আবার যখন ধর্ম্মভাবে ডুবে গেলেন, অবসাদ দেখা দিয়েছে নাট্যশালায়। এই সময় জাতীয়তাবাদী নাটক সবচেয়ে বেশী অভিনীত হয় মিনার্ভায়, ১৯০৪ থেকে ১৯০৮ সাল এই পাঁচ বছরই মোটামুটি এখানে জাতীয়তার ধারা একাদিক্রমে প্রবাহিত ছিল বলে ধরা যায়। এই সময়ের মধ্যে এখানে অভিনীত হয়েছে 'সিরাজদ্দৌলা' (গিরিশ) 'মীরকাশিম' (গিরিশ) 'ছত্রপতি শিবাজী' (গিরিশ) 'দুর্গাদাস' (দ্বিজেন্দ্রলাল), 'রাণাপ্রতাপ' (দ্বিজেন্দ্রলাল) আর "মেবারপতন" (দ্বিজেন্দ্রলাল)। ষ্টারে অভিনীত হয়েছে "প্রতাপাদিত্য" (ক্ষীরোদপ্রসাদ), "পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত" (ক্ষীরোদ-



এম পি প্রোডাকসন্সের নির্ম্মীয়মান 'আঁধি' চিত্রের একটি
দৃশ্যে রাধামোহন ভট্টাচার্য্য ও দীপ্তি রায়



ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং-এর 'কাজরী' চিত্রের একটি দৃশ্যে
বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও জয়শ্রী সেন

প্রসাদ) আর "নন্দকুমার" (ক্ষীরোদপ্রসাদ) এদের অভিনয়কাল মোটামুটি ১৯০৩ থেকে ১৯০৭ সাল। পুনরভিনয়ের তারিখ ও নাট্যশালা এই হিসেবে আমরা ধরছি না। গিরিশচন্দ্রের নাটকই বেশী পুনরভিনীত হয়েছে বিভিন্ন নাট্যশালায়। বস্তুতঃ এই হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী-যুগ গিরিশচন্দ্রেরই যুগ।

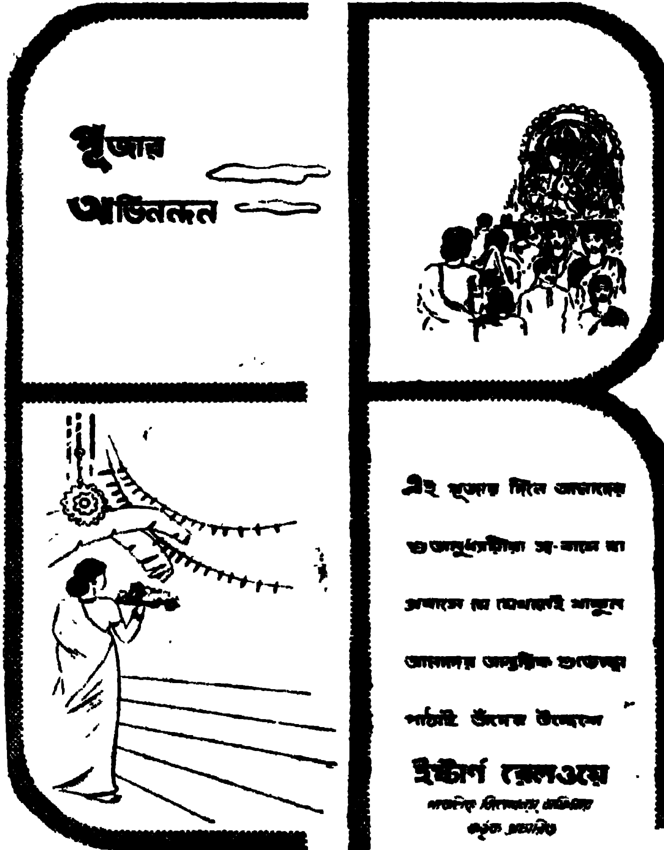
তথাপি, যে যুক্তিবাদ উঁকিঝুঁকি মেরেছে ক্ষীরোদপ্রসাদের মধ্যে, যার প্রতিষ্ঠা দেখেছি দ্বিজেন্দ্রলালে, তা' যে নাট্যধারার পরবর্ত্তী স্তরে পৌঁছতে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছে আমাদের সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ভক্তিরস ও আধ্যাত্মিকতার মূল ধারা বিবর্ত্তনবাদী সামাজিক দৃষ্টি নিয়ে নাট্যধারাকে এগিয়ে দিতে পারে নি, বরং সমাজের বিবর্ত্তন ধারা থেকে নাট্যধারা একটু দূরেই সরে এসেছে।

১৯১৪-১৮ সালের বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শাসকদের প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে প্রচণ্ড আঘাত ক'রলো প্রতিঘাতে ভারত রক্ষা আইন, রৌলট আইন ও অন্যান্য কায়দায় দমননীতির রথচক্র নির্ব্বিবাদে পরিচালিত হ'ল সাধারণ মানুষের ওপর। জাতীয় আন্দোলন কিন্তু আরও শক্তিশালী হ'ল এ সময়, দমে গেল না। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী বছরগুলি, স্বতস্ফূর্ত্ত বহু শ্রমিক-বিক্ষোভ প্রত্যক্ষ করলো, জন্ম দিল পুরোদস্তুর সারা-ভারতীয় শ্রমিক সংগঠনের, খিলাফৎ আন্দোলনের সহযোগিতা এল, কংগ্রেস ও লীগের চুক্তি হ'ল যুক্ত ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামের, কংগ্রেস হয়ে দাঁড়ালো ব্যাপক এক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা। কিন্তু 'অহিংস' সংগ্রামের স্তোকবাক্যে জাতীয় [illegible]র একাংশ তথা দেশীয় বণিকশ্রেণী গণ আন্দোলন- [illegible] পথে পরিচালিত করতে চাইলো জাতীয় [illegible]কে।

[illegible]ক্ষেত্রেও নাট্যশালার মালিকশ্রেণী সচেতনভাবেই [illegible]র অচেতনভাবেই হোক, সমাজ-বিবর্ত্তনের ধারা [illegible]রের কথা জাতীয় আন্দোলনের স্থূল ধারা থেকেও নাট্যধারাকে দূরেই সরিয়ে রাখতে চাইলো অন্ততঃ এই দূরত্ব সৃষ্টির জন্য তারা মালিকানার অধিকার প্রয়োগ সুরু ক'রলো। ম্যাডান কোম্পানীর সঙ্গে শিশিরকুমারের মতভেদের প্রসঙ্গ এই সম্পর্কে আমরা উল্লেখ ক'রতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী যুগের আধ্যাত্মিকতা ও ভক্তি-রসের ধারায় নাট্যশালাকে জনপ্রিয় ক'রে তুলেছিলেন গিরিশচন্দ্র, গিরিশচন্দ্রের যুগ ছিল নাট্যশালার পরিচিতির যুগ। তাই, এক শ্রেণীর দর্শকের সমাজনিরপেক্ষ রুচিকে মূলধন ক'রে স্থায়ী বৃত্তির উত্তেজক সস্তা কাহিনীর বর্ণাঢ্য রূপায়ণে বাজীমাৎ করার ঝোঁক দেখা দিয়েছিল মালিকদের মধ্যে। তা'ছাড়া, গিরিশযুগের মঞ্চসজ্জা ছিল আড়ম্বরহীন, প্রযোজনা-ব্যবস্থাও ছিল সাধারণ ধরণের। মঞ্চসজ্জা ও প্রযোজনা-ব্যবস্থার উন্নতির কোনও কার্য্যকরী চাহিদা গিরিশোত্তর যুগেও তাই দেখা যাচ্ছিল না।

এমনি সময়ে "শুভক্ষণে শিশিরবাবু প্রমুখ নবযুগের তরুণ অভিনেতার দল রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে আজ রঙ্গালয়কে জরার অভিশাপ অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা ক'রেছেন। এ দেশের রঙ্গালয়ে আবার নব যৌবন দেখা দিয়েছে।" (নাচঘর ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৩২) কিন্তু উল্লিখিত দুর্ব্বলতা ছাড়াও এই "নবযৌবন"কে বহু সংগঠিত বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে, হ'তে হয়েছে নাট্যামোদীদেরই একাংশের কাছ থেকে। এই যৌবন-শিল্পীরা অবশ্য তাতে নিরস্ত হ'ন নি। প্রাচীন ধারার পাশাপাশিই এই যৌবন ধারাও তার আসর ক'রে নিল, স্বীকৃতিও আদায় ক'রে নিল শিল্পরসিক ও গুণীদের কাছ থেকে।

অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর অধ্যাপনার পেশা ত্যাগ ক'রে যেদিন সাধারণ নাট্যশালায় দেখা দিলেন, যুগের জাতীয় দাবীকে তিনি অস্বীকার করেন নি। হিন্দু-মুস্লিম সমস্যা তখনকার অন্যতম জাতীয় সমস্যা, এই সমস্যা নিয়ে লেখা ক্ষীরোদপ্রসাদের "আলমগীর"-ই (১০ই ডিসেম্বর, ১৯২১) তাঁকে প্রথম পরিচিত করিয়ে দেয় সাধারণ নাট্যশালার শিল্পী [illegible] ক্ষীরোদপ্রসাদের [illegible] হ'য়ে [illegible]



শিশির-যুগের উল্লেখযোগ্য অবদান যৌথ প্রতিষ্ঠানের মারফৎ নাট্যশালা পরিচালনার চেষ্টা। সাধারণ নাট্যশালায় শিশিরকুমারের যোগদানের সঙ্গে আরও বহু শিক্ষিত শিল্পী যোগদান করেন মঞ্চে। এর আগে পর্য্যন্ত নাট্যশালা অনেক শিক্ষিত লোকের কাছেই হেয় বলে গণ্য হ'ত। এইসব শিক্ষিত শিল্পীদের গণতন্ত্রপ্রিয় শিল্পীমন মালিকদের ব্যবসাবুদ্ধির কাছে বিকিয়ে না দিয়ে গুণী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় উন্নত ধরণের শিল্পনিকেতন গড়ে তুলতে এঁরা চেষ্টা করেন। আর্ট থিয়েটার লিমিটেড এমনি একটি শিল্পনিকেতন (১৯২৩)। শিশিরকুমার নিজে অবশ্য সাংগঠনিকভাবে এসব যৌথ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন না। মনোমোহন থিয়েটার ভাড়া নিয়ে তিনি খোলেন 'মনোমোহন নাট্যমন্দির' (১৯২৪ সালে), তাঁর 'নাট্যমন্দির'ও প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যক্তি প্রচেষ্টায় (১৯২৬)। 'রঙমহল' নাট্যশালারও সুরু হয় (১৯৩১) যৌথ প্রতিষ্ঠান হিসেবে। এইসব নাট্যশালা এদের প্রতিশ্রুতিমত উচ্চাঙ্গের শিল্পকৌশলের প্রবর্ত্তন হয়তো করেছে, কিন্তু বিবর্ত্তনবাদী দৃষ্টি নিয়ে জাতীয় আন্দোলনের সহযোগী শক্তিশালী কোনও নাটকের সৃষ্টি বোধ হয় করতে পারে নি।

অবশ্য, ১৯৩০ সালের পর থেকে অহিংসবাদী জাতীয় নেতৃত্বের গণ-আন্দোলন বিরোধী নীতি সত্ত্বেও গণআন্দোলন যখন ব্যাপক আকার ধারণ করতে লাগল, নেতৃত্বের অসহযোগ সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদী দেশসেবীদের তীব্র বিক্ষোভ যখন মূর্ত্ত হয়ে উঠতে লাগল আর সাম্রাজ্যবাদী সরকারও দমননীতির তীব্রতা দিলো বাড়িয়ে তার ছোঁয়াচ নাট্যশালাতেও অল্পবিস্তর বোধ হয় লেগেছিল। জাতীয় অন্দোলনের সহযোগী না হলেও জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক নাটকের কিছু কিছু সন্ধান এই সময় থেকে আমরা পাই। গৈরিক পতাকা (শচীন সেনগুপ্ত, ১৯৩০), মারাঠামোগল (সুধীন্দ্রনাথ রাহা, ১৯৩৪), সিরাজদ্দৌলা (শচীন সেনগুপ্ত, ১৯৩৮), মিরকাশিম (মন্মথ রায়), রণজিৎ সিংহ (মহেন্দ্র গুপ্ত, ১৯৪০) প্রভৃতি নাটক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার আগে রচিত ও অভিনীত হয়।

এছাড়া পথের দাবী (শরৎ চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩৯) পরিণীতা (যোগেশ চৌধুরী, ১৯৪১) ভারতবর্ষ (শচীন সেনগুপ্ত ১৯৪১) কালিন্দী (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৪১) প্রভৃতি এই সময়ের উল্লেখযোগ্য সামাজিক নাটক। 'পথের দাবী' ও 'ভারতবর্ষে' জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা আছে। পৌরাণিক নাটক 'কারাগারে'ও (মন্মথ রায়, ১৯৩০) আছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইঙ্গিত। তাই নিষিদ্ধ হয়েছিল এ নাটক।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে গেল আবার যুদ্ধ শেষ হ'তে না হ'তেই এল মন্বন্তর, মানুষের সৃষ্ট মন্বন্তর। এক দিকে গণআন্দোলন যেমন তীব্রভাবে ফেটে পড়তে চাইল নানাদিকে, নানাখাতে—ফাঁসীবিরোধী আন্দোলনে, আগষ্ট আন্দোলনে, নৌ-বিদ্রোহে, রসিদ আলি দিবসে, ডাক-তার ধর্ম্মঘটে, ২৯শে জুলাই দিবসে আর তে-ভাগা আন্দোলনে। এইসব গণ-বিক্ষোভ ও গণআন্দোলনে জাতীয় নেতাদের এক অংশের আদৌ কোনও সমর্থন ছিল না। জাতীয় নেতাদের মধ্যেও ঐক্যমত ছিল না, ক্রিপস মিশন তাদের কাছে ব্যর্থ হ'ল, দেশাই-লিয়াকৎ চুক্তি কার্য্যকরী হ'ল না, ক্রমশঃ মাউণ্টব্যাটেন রোয়েদাদের পথ হ'ল প্রশস্ত। জাতীয় আন্দোলনের এই চিত্র রূপ পেল না নাট্যসাহিত্যে, নাট্যশালায়।

মহেন্দ্র গুপ্তের 'মহারাজ নন্দকুমার' (১৯৪৩), 'টিপু-সুলতান' (১৯৪৪), প্রভৃতি কয়েকখানি মাত্র জাতীয়ভাবাপন্ন নাটক এই সময় মাঝে মাঝে অভিনীত হয়েছে। তাতে জাতীয় আন্দোলনের বর্ত্তমান রূপ বা বিবর্ত্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে সৃষ্ট কোনও নাট্যবস্তু স্থান পায় নি। তবুও 'টিপুসুলতান' সম্পর্কে আনন্দ বাজার (১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১) বলেছেন,—"হিন্দু মুসলমানের ঐক্য সাধনের যে প্রচেষ্টা এই নাটকের সূচনা হইতে শেষ পর্য্যন্ত বহুধা বিভক্ত নাটকীয় পরিস্থিতির অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বহমানা রহিয়াছে, তাহার ফলে নাটকখানি উপভোগ্য হইয়াছে।"

'কিন্তু আমার মনে হয় হিন্দু মুসলমান সমস্যাকে স্বাভাবিকভাবে বিশ্লেষণ ক'রে তার সমাধানের কোনও যুক্তিসম্মত চেষ্টা এর মধ্যে নেই, সমস্যাটি প্রসঙ্গতঃ আনা হয়েছে আর ভাবাবেগবহুল এক নাটকীয় পরিস্থিতিতে তার আকস্মিক উপস্থাপনা সমস্যা সমাধান তো দূরের কথা, কোনও স্থায়ী দাগ কাটতে পারে না মনে। 'মহারাজ নন্দকুমার' অভিনীত হয় দুর্ভিক্ষের বছরে তাই সেখানেও একটি দৃশ্যে এক ভুখা মিছিলের অনানুপাতিক ও হাস্যকর আবির্ভাবে আমরা ক্ষুণ্ণ হই। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ "সন্তান"-রূপে রূপায়িত হয়ে (বাণীকুমার,) এই সময় (১৯৪৫) অভিনীত হয় রঙ্-মহলে। কিন্তু অভিনয়ে প্রাণ সঞ্চারিত হয় নি। অগ্রণী নাট্যকার শ্রীযুত শচীন সেনগুপ্ত এর সঠিক কারণ নির্দ্দেশ করেছেন। আধুনিক জাতীয় সমস্যামূলক নাটকের অভাবও ঐ একই কারণসম্ভূত বলে আমাদের মনে হয়। শ্রীযুত সেনগুপ্ত বলেন,—"আমি বলি আনন্দমঠের মূল রস 'সন্তানে'র অভিনয়ে প্রকাশ পায় নি। আর তা না পাবার কারণ হচ্ছে অভিনেতাদের রাজনৈতিক চেতনার অভাব।... আর পাঁচখানা নাটকের মতো আনন্দমঠও প্যাঁচের কসরৎ দেখিয়ে প্রাণবন্ত করা যাবে না। এর জন্য ভিন্ন ধ্যান-ধারণা চাই।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫শে চৈত্র, ১৩৫১) বস্তুতঃ নাট্যশালা-সংশ্লিষ্ট কর্ম্মীরা জাতীয় আন্দোলনের ধ্যান ধারণা ও ধারার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না বলেই জাতীয় ভাবধারা ও সমস্যার নাটক রচিত ও অভিনীত হয় না, জাতীয় জীবন থেকে দূরে সরে যায় নাট্যশালা। তাই বলে শ্রীরঙ্গমে 'দুঃখীর ইমানের' (তুলসী লাহিড়ী) সাফল্যে নাট্যশিল্পীদের রাজনৈতিক চেতনার পরাকাষ্ঠা নির্দ্দেশ করলে ভুল হবে, কেননা শিশিরকুমারের অসামান্য প্রয়োগ-শৈলী রয়েছে "দুঃখীর ইমানের" মূলে। অবশ্য এই সাফল্যে রাজনৈতিক চেতনা কিছুটা প্রমাণিত হয় বৈকি। এটা মূল ধারার ব্যতিক্রম। এই মূল ধারাটি হ'ল জাতীয়তা-বিচ্ছিন্ন ধারা, সস্তা সিদ্ধ রস পরিবেশনের ধারা।

জীবনের অনিবার্য্য পরিণতির প্রাণস্পর্শী এক কাহিনী—

প্রতি ফুটে প্রতিজন শিল্পীর নবতর রহস্য সৃষ্টিতে
রহস্যময়, আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে রূপায়িত হাসি
অশ্রুর সংমিশ্রণে ব্যথাতুর অভিনব
অনবদ্য সমাজ চিত্র।



● সগৌরবে চলছে ●

চিত্রা ❋ প্রাচী ❋ ইন্দিরা

ও মফঃস্বলের বিভিন্ন চিত্রগৃহে

ইষ্ট এণ্ড ফিল্মসের অন্যান্য চিত্র ঃ—

দুর্গেশনন্দিনী • ভক্ত রঘুনাথ • সতী সীমন্তিনী
শ্যামলের স্বপ্ন ও মীমাংসা (আগতপ্রায়)

এই যখন অবস্থা সাধারণ নাট্যশালার, জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত একদল যুবক সৌখীন সম্প্রদায়ের মাধ্যমে নতুন ধরণের নাট্যপরিবেশনের ব্রত নিয়ে তখন হাজির হলেন আসরে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রচিত হ'ল এদের প্রথম নাটিকা। সেদিন ক'লকাতার রাস্তায় রাস্তায় ভীড় ক'রেছিল যে সব নিরন্নের দল তাদের নিয়ে নাটিকাটি লিখলেন শ্রীবিজন ভট্টাচার্য্য। সম্ভবতঃ ফ্যাসী-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের উদ্যোগে নাটিকাটির অভিনয় হয় ক'লকাতার কোনও এক সাধারণ নাট্যশালায় (১৯৪৪ জানুয়ারী)। নাটিকাটির নাম "জবানবন্দী", এর পর গণনাট্য সঙ্ঘের উদ্যোগে শ্রীশম্ভু মিত্রের প্রযোজনায় এই নাট্যকারেরই বৃহত্তর নাটক 'নবান্ন' যখন অভিনীত হল (১৯৪৪) তখন সাড়া পড়ে গেল চারিদিকে, সাড়া পড়ে গেল ব্যবসায়ী ও সৌখীন নাট্যমহলে। 'নবান্নের'ও পটভূমি মন্বন্তর। শুধু নাট্যবস্তুতে নয়, স্বভাবকুশল অভিনয়-ধারাতে, সহজ সরল ও ইঙ্গিতময় দৃশ্যসজ্জায় নতুনত্বের সন্ধান দিল "নবান্ন"-র অভিনয়। গ্রামের ছিন্নমূল ও শ্লথমূল কৃষক তার নিজের ভাষায় নিজের অভ্যস্ত ও অনভ্যস্ত পরিবেশে প্রকাশ করেছে তার ব্যথা বেদনার কথা। "নীলদর্পণ"-এর পর নাকি এমন ঘনিষ্ঠ পরিবেশে সাধারণ মানুষের ব্যথা বেদনা আর ফুটে ওঠে নি। বিভিন্ন সংবাদপত্র এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলো। এর সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের গীতিকাব্য 'মধুবংশীর গলি' ও গীতিনাট্য 'নবজীবনের গান' জাতির ব্যথা বেদনায় জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতির সমস্যায় রূপায়িত। সত্যই এক নতুন নাট্যধারার সৃষ্টি হ'ল, নাচে, গানে, নাটকে গণনাট্য সঙ্ঘ জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যথা বেদনাকে রূপ দিতে এগিয়ে এল বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। শত শহীদের স্মৃতিবিজড়িত জাতীয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ও জাতীয় গণতন্ত্রের আন্দোলন যখন রূপ পেল "শহীদের ডাক" ছায়ানাট্যে, গণনাট্যসঙ্ঘের নাট্যধারা আরও ব্যাপকভাবে তখন পরিচিত হ'ল। ইতিমধ্যে সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের রূপ নিয়েছে সঙ্ঘ কেন্দ্রীয় দলের "ভারতের মর্ম্মবাণী" ও "অমর ভারত" নৃত্য নাট্যও বাঙলা দেশের শিল্পজগতে সাহায্য করলো জাতীয় ভাবধারার প্রতিষ্ঠায়, নির্দেশ জাতীয় আন্দোলনে শিল্পের সহযোগিতায়।

"রেনেসাঁ ক্লাব" এই সময়কার আর একটি সংগঠন। গোর্কীর "লোয়ার ডেপ্‌থ্‌স্‌"-এর অনুবাদ নিয়ে এদের অভিযান সুরু। কিন্তু আজও নতুন ধারার নাট্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এরা এগিয়ে আসতে পারেন নি।

গণনাট্যসঙ্ঘ নব নাট্য আন্দোলনের নেতৃত্ব পেয়েছিল। কিন্তু ১৮৭৬ সালের অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের বলে আর অন্যান্য কৌশলে ব্যাপক পুলিশী হামলা সুরু হ'ল গণনাট্য সঙ্ঘের ওপর। সাংগঠনিক ও নীতিগত বিপর্য্যয়ে গণনাট্য সঙ্ঘের সৃষ্টির স্তরও ক্রমশঃ নেমে গেল। অবশ্য তাতে নাট্য আন্দোলনের পরিধি কমে নি। 'বহুরূপী' 'নাট্যচক্র', 'উত্তর সারথি' 'ক্যালকাটা থিয়েটার' 'অশনিচক্র' প্রভৃতি অনেক প্রগতিশীল নাট্যপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে, প্রযোজনার দিক দিয়ে, জাতীয় ভাব ও সমস্যার রূপায়নে এঁরা নতুন নাট্যধারাকে এগিয়েই নিয়ে চলেছে। বহুরূপীর "পথিক" (তুলসী লাহিড়ী), "উলু খাগড়া" (সঞ্জীব), "ছেঁড়া তার" (তুলসী লাহিড়ী), "চার অধ্যায়" (রবীন্দ্রনাথ), Enemy of the people (Ibsen), নাট্যচক্রের "নীলদর্পণ" (দীনবন্ধু), 'ক্ষুধিতের অভিযান', (নৃত্যনাট্য), উত্তর সারথির 'নতুন ইহুদী' (সলিল সেন) ও 'অসামাজিক' (ধ্রুব চট্টো—প্রস্তুতির পথে) ক্যালকাটা থিয়েটারের 'কলঙ্ক' 'মরা চাঁদ' (বিজন ভট্টা), অশনিচক্রের 'মশাল' (দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়) আজকের বিভিন্ন জাতীয় সমস্যাকেই রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন ও ক'রছেন। এই নাট্যধারার প্রতি ব্যবসায়ী সাধারণ নাট্যশালার শিল্পীরাও অনেকে আকৃষ্ট হয়েছেন। এদের সকলের সমবেত চেষ্টায়, তাই, এই নতুন ধরণের জাতীয় নাট্যধারা—গণনাট্যধারা জাতীয় আন্দোলনের বলিষ্ঠ নির্দেশ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবেই আমাদের জীবনে।

মার্লিন ডিয়েট্রিক

সিদ্ধার্থ সান্যাল

★ ★ ★

আনীল আকাশের বুকে কাশ-শুভ্র খণ্ড মেঘ যেন, যেন বিস্তীর্যমান শ্যামলিমার কোলে ফসলিত জাফরানের ক্ষেত, কিম্বা যেন কোনও রোদ-ঝলকানো সকালে মার্বেল পাহাড়ের সানুতে নিঃসঙ্গ ঝাউয়ের ঘন কুঞ্চিমার ছায়া:—এমনই একটা সৌন্দর্য্যের সমন্বয় জড়িয়ে আছে মেয়েটির তনুলতায়। ওকে দেখলে আর ফেরানো যায় না চোখ, যায় না ঠেকিয়ে রাখা অপ্রতিরোধ্য সেই মধুর আবিলতাকে দৃষ্টির দিগন্ত-হীনতা থেকে যার উদ্ভব। চোখ তলিয়ে যায় ওর দ্যুতিমান সুষমার অতলান্তিক গভীরে, মন ম'ম' ক'রে ওঠে কেমন একটা মসৃণ লুলিত আমেজে। এমন অপূর্ব্ব অনুভূতির অভিজ্ঞতা জীবনে বিরল, কচিৎ কখনও কোন জীবন-শিল্পীর সৃষ্টির সন্নিহিতে হয়তো বা উদয় হয়। ও যেন তাই দা' ভিঞ্চির 'মনালিসা', যেন পিকাসোর আঁকা কোনও সুর-রিয়্যালিষ্ট আর্টের টুকরো প্রতিকৃতি, যেন বাঁধানো কোনও বর্বুক মেঘের কোলে অপ্রকম্প বিদ্যুৎ লেখা।

আবার সেই ফ্রেমে-আঁটা রূপই প্রযুক্ত প্রেক্ষণা আর পরিবেশে নিজের অলক্ষ্যে মুখর হোয়ে ওঠে গতির তীব্রতায়, জাগায় প্রতিস্পন্দন ধমনীর ধাবমান শোণিত-বিন্দুতে। ওকে দেখলে তখন আর চেনাই যায় না ক্ষণপূর্ব্বের সেই চিত্রার্পিতা ব'লে। মনে হয়—এইমাত্র বুঝি ফার্ণ আর ইউক্যালিপটাস্, মাটি আর পাথরের জটিল বন্ধন ছিঁড়ে ছড়িয়ে প'ড়লো উদার উন্মুক্তিতে কোন এক কলস্বনা পাহাড়ী ঝর্ণা। বুঝিবা ঢেউ জাগলো বিচিত্রবর্ণী মরশুমী ফুলের অজস্র কেয়ারিতে, বাঁশী হোয়ে বেজে উঠলো বনানীর পত্র-পুঞ্জ, কিম্বা বুঝি দক্ষিণের দাক্ষিণ্যে আপাত কোন বীত বহ্নির বুকে স্পন্দন উঠলো স্ফুলিঙ্গের।

তবুও কিন্তু মেয়েটি নয় এতটুকুও আত্মসচেতন। সম্পূর্ণ উদাস, নিস্পৃহ,—বোঝেনা কখন আনমনে চঞ্চলিত হোয়ে ওঠে ওর লীলায়িত রূপের বিভাসা, কখন ওর কবোষ্ণ সৌন্দর্যের দীপালীতে নেমে আসে অজস্র পতঙ্গ। বোঝেনা, শুধু ছোটে আর চলে, ছড়িয়ে ছড়িয়ে চলে অকৃপণ মুঠো ভ'রে প্রাণের প্রাচুর্য চপলা বন-হরিণীর মত; মদালসা মধুপিনীর মত। মার কিন্তু নজর এড়ায় না। ওর বয়োসন্ধির তরঙ্গোচ্ছ্বাস তাঁর কানে পৌঁছোয়, চোখে পড়ে ওর তনুর কৌণিক পরিপূরণ, রৈখিক আন্দোলনের বন্ধুরতা। তাই ওকে বাঁধতে চান শাসনের ডোরে, নিষেধের ছোট-খাটো প্রতিবন্ধকে। এ যেন ভস্মাচ্ছাদনে দাবাগ্নি নির্বাপনের নিষ্ফল প্রচেষ্টা, উর্ণাজালে বনজ্যোৎস্না বাঁধার বাতুলতা। বিফল বিতৃষ্ণায় মা তাই রেগে বলেন,—'এখন আর তোমার হৈ হৈ সাজে না মেরী!'

নাম ওর মেরী ম্যাগদালিন। অতবড় নামে ডাকলে মর্মে পৌঁছুতে বিলম্ব হয়। ও তাই ছোট ক'রে এনেছে নামটাকে, প্রথম আর শেষটুকু জুড়ে ক'রেছে মার্লিন, যাতে অন্তর্লীন হয়ে যায় মুহূর্তে। ভারী লাজুক স্বভাবের মেয়ে। ব্রীড়ায় সংকুচিতা হোয়ে থাকে অফোটা রজনী-গন্ধার মত। নমনীয়, অথচ দৃঢ়তায় অটল; আনত, অথচ প্রয়োজনে ঋজু। সেটা ওর বাবার স্বভাবের সংক্রামণ। সমর বিভাগের তিনি অধিনায়ক। মার্লিন পেয়েছে তাঁর সামরিক সময়নিষ্ঠা আর সহনশীলতা-টুকু। উত্তরাধিকারে পাওয়া অত্যাগধর্মী মনের দৌলতে ও তাই হোয়েছে অভঙ্গব্রতী। ভঙ্গিতে নেমেছে তাই একটা নিষ্কম্প ঔদ্ধত্যের উদ্ধতি। এটা হোল ওর চারিত্রিক উপাদানের ইস্পাতের দিকটা, সরস মৃত্তিকার স্নেহল পেলবতার ক্ষেত্র রচনা ক'রেছেন ওর মা। মনের দিক থেকে ও তাই ওর মার খুব কাছাকাছি। মা-র কাছেই হয় ওর জীবনদীক্ষা কৈশোরের শেষ পর্যায়ে সুদূর এক অতীতের দিনে······

সেটা উনিশ-শো-চোদ্দো। প্রথম মহাযুদ্ধের দিনগুলো আতঙ্কে অস্থির, বোমা আর বারুদে বিধ্বস্ত। মার্লিন তখন বছর দশেকের। ওর বাবা গেছেন যুদ্ধে, কাকা ও আর আর খুড়তুতো ভায়েরাও গেছে। ওকে আর ওর দিদি এলিজাবেথকে নিয়ে মা থাকেন বার্লিনে। সংসারে পুরুষ ব'লতে কেউ নেই, মাকেই পোয়াতে হয় সব হ্যাঙ্গামা। তাঁকে সাহায্য করে মার্লিন। কি নিপুণ ওর কর্মনিষ্ঠা,

কি অমূল্য ওর অনভিজ্ঞ সহায়তা! মা খুশি হন। ও-ও কম খুশি হয় না। সংসার আর দায়িত্ব—নারী জীবনের চরম চাওয়ার বস্তু! তার প্রথম আস্বাদ মার্লিনকে মোহময় ক'রে তোলে। সেদিনের সেই চঞ্চল বনবিহঙ্গ মায়ের মন্ত্রে বাঁধা পড়ে সংসারের শিকলে। যুদ্ধের ধাক্কায় মার্লিনের লীলাজগৎটা হঠাৎ ছিটকে আসে উনুন পাড়ে, বেকারীর সোঁদালো গন্ধে আর ক্রকারীর শব্দিত ছন্দে। কি মিষ্টি জীবন—শব্দ আর গন্ধের গলিত অনর্গলতায়!

সামরিক কৃচ্ছ্রতা আর প্রাত্যহিক পরিমিতির ছকে বাঁধা হিসেবী দিনগুলো। তবু কিন্তু মার্লিনের ভালো লাগে, ভালো লাগে আপন হৃদয়ের রঙে রঙীন আর উজ্জ্বল ব'লে। সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে সন্ধ্যা, তারপরও সেই সন্ধ্যা কখন যে মিশে যায় রাত্রের অন্ধকারে—ও টের পায় না। কাজ আর হাসি, নিঃসময় আর অবকাশ—নিরবচ্ছিন্ন চক্রিল আবর্তে ঘুরে ঘুরে ও ভুলে যায় নিজেকেই অনেক সময়। তারপর দিনান্তের কর্ম্মহীন শ্রান্ত তন্দ্রায় ফিরে পায় নিজেকে। মন তখন থিতিয়ে পড়ে, মুক্তি পায় সময়ের সজল আবিলতা থেকে। ম্যান্টলপিসের ওপর মোমবাতি জ্বেলে ঘিরে দাঁড়ায় মা আর এলিজাবেথকে নিয়ে। প্রার্থনা করে—পিতার গৃহ প্রত্যাগমনের, জার্ম্মাণীর বিজয় গৌরবের, বিশ্বের চিরশান্তির......

শান্তি অবশ্য আসে একদিন যুদ্ধবিরতির, কিন্তু ম্লান ক'রে দেয় মার্লিনের জগৎ। নেমে আসে অজস্র কালো-বাদুড়ের ডানায় মর্ম্মান্তিক বেদনার সূচীতীব্র তমসা। সংবাদ আসে—পিতার মৃত্যু হোয়েছে রুশ সীমান্তে, মারা গেছেন আর সব আত্মীয়েরা। মুহূর্তে কে যেন শুষে নেয় ওর আকপিল আকাশ থেকে সমস্ত জ্যোৎস্নাটুকু! মলিন মার্লিনের চোখে নামে স্বাতীর সজল পাণ্ডুরতা। মা শয্যা নেন, এলিজাবেথ ভেঙ্গে পড়ে কান্নায়। রুদ্ধ বেদনা-বহ্নির ধূমায়িত অন্তর্দাহে অস্থির মার্লিন আশ্রয় খোঁজে দর্শনের সত্যসমাহিতির মধ্যে। কাব্য আর সঙ্গীতের শাশ্বত সুধার স্বাদে ভুলতে চায় জীবনের ভঙ্গুরতা, বিপর্যয়ের যত কিছু ক্লেদাক্ত তিক্ততা।

ক্ষণিকে কি যেন হোয়ে যায়! নাবিকহীন নৌকো টলে দিকহীন সাগরে। সুখ আর অর্থের প্রাচুর্য থেকে উৎক্ষিপ্ত হোয়ে আছড়ে পড়ে মার্লিন নির্ম্মম নিঃস্বতায়। একক অট্টালিকার আভিজাত্য থেকে নেমে আসে জনবহুল ব্যারাকের পংকিলতায়। দিনানুদৈনিক দৈন্যের নিষ্পেষণে আর সবাই হাঁপিয়ে উঠলেও মার্লিন কিন্তু অম্লান। সার্ডিন আর স্যালমনের বদলে সস্তা আলু আর গাজরের ঝুঁয়ে চামচ ডোবাতে ওর এতটুকুও সঙ্কোচ জাগে না। পরিতৃপ্তির সশব্দ প্রকাশে বলে—মন্দ কি দশজনের সঙ্গে সমতলে দাঁড়িয়ে জীবনের যে উপভোগ বিচ্ছিন্ন হোলে তা ফিকে হোয়ে আসে। প্রান্তরের আকাশ অনেক বড়, মিনারে উঠলে তা' সংক্ষিপ্ত হোয়ে দাঁড়ায়।

অত পাওয়ার মধ্যে থেকেও না-পাওয়ার এই গ্লানিতে অভ্যস্ত মার্লিনকে দেখে সবাই অবাক হয়। ওর কিন্তু বিস্ময় নেই এতে। দীনতার মালিন্য ও-কে স্পর্শ করে না, ও শুধু মর্ম্ম পীড়া অনুভব করে জার্ম্মানীর অন্তর্বিপ্লবে।

যুদ্ধের শেষদিকে বিপ্লবের বিভীষিকা আরও বিপর্যস্ত ক'রে তোলে ওদের। গুপ্তচর আর গোয়েন্দা, পিস্তল আর বলোয়ারিতে ভয়াল দিনগুলো দীর্ঘতর হোয়ে ওঠে। আজও মার্লিনের স্পষ্ট মনে পড়ে এমনি এক আতঙ্কিত নিঃস্বতার দিনে ওর জীবনের গতি হয় পরিবর্তিত, ও যেন পেয়ে যায় ওর জীবন-জিজ্ঞাসার পরম উত্তর, অন্তর-কামনার নিভুর্ল প্রতিচ্ছবি। বেশ মনে পড়ে—সেদিনের সন্ধ্যা ছিল নির্জ্জন, নিঃসঙ্গ, অন্তরের আসঙ্গে মুখর। বাইরে জানলায় শার্সিতে তুষারের স্ফটিক নক্সা আর পল্লব-ঘন পপ্‌লারের ফাঁকে ফাঁকে হিমেল হাওয়ার আর্ত্তনাদ। ভেতরে উষ্ণ ঘরের কোণে বাতির নীল ঘেরাটোপের নীচে খোলা কাব্য। ও প'ড়ছে, তন্ময় হোয়ে প'ড়ছে জার্মান কবি হফ্‌ম্যান্‌স্‌থালের কবিতা—'মৃত্যু ও মূঢ়'। কি মিষ্টি কবিতা! সহসা কি যে হয় সুরেলা কণ্ঠে সুরু ক'রে দেয় আবৃত্তি। অম্‌নি যেন বেজে ওঠে শত নক্ষত্রের সঙ্গীত, সুরে সুরে অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছিত মার্লিনের তন্তুতন্ত্রীতে জাগে তার প্রতিধ্বনি। মুহূর্ত্তে শিল্পী জন্ম নেয় ওর মনে। ভাবে—কাব্যের সার্থকতা সুষ্ঠু আবৃত্তিতে, সার্থকতা দশজনকে শুনিয়ে। তার জন্যে চাই মঞ্চ, চাই শ্রোতা; তাকে হোতে হবে অভিনয়-শিল্পী।

মার কাছে মার্লিন মিনতি জানায়। আবদার করে—ম্যাক্স্‌ রেইন্‌হার্টের স্কুলে সে ভর্ত্তি হবে, শিখবে অভিনয়শিল্প। মার অভিজাত মনের রুচিতে কোথায় যেন বাধে। প্রথমটা তিনি রাজী হ'ননা সম্মতি দিতে। শেষে অভঙ্গব্রতী মার্লিনের দৃঢ়তায় তাঁকে রাজী হোতে হয়। সুরু হয় মার্লিনের শিল্পী-জীবন......

মার্লিন এসে দাঁড়ায় শিল্পের দেউল দেহলী পারে জীবনের এক শুভ লগ্নে, সে এক নতুন প্রভাতের রঙে রঙ্‌-করা নতুন আলোকে। জ্বেলে আনে হৃদয়ের দীপাধারে



মার্লিন ডিয়েট্রিক

সাধন-ব্রাত্যের অনির্ব্বাণ শিখা। অগোছালো মনটাকে কুড়িয়ে সঞ্চয় করে লক্ষ্যমুখে—যেমন হেমন্তের বিক্ষিপ্ত শিশির-কণা ধীরে ধীরে জমে ওঠে পত্রশীর্ষে বড় একটি ফোঁটায়।

মার্লিন অন্যমনা। অন্তরে বাইরে ওর ব্যবধানহীন বিস্তৃতির কাছে কৃত্রিমতার স্থান নেই, নেই ওর শিল্পবোধের অভিধানে অভিনয়ের আভিজাত্যহীন সংজ্ঞা যা'তে মঞ্চকে বিচ্ছিন্ন ক'রেছে ব্যঞ্জনা থেকে। আবেগের আবরণও সইতে পারে না, পারে না অন্তরের ফল্গুকে কবরিত ক'রে বালির স্তূপ রচনা ক'রতে। অথচ সেইটাই সমাজের শিখর-স্তরে জৌলুস আর শালীনতার [illegible] প্রহরায় থাকে আলাপিতের হৃদয় দ্বারে। চলনে বলনে কোথাও পরিমাপনের পান থেকে চুন খসলে ওর সংঘর্ষ বাধে মার সঙ্গে, অমনি স্বাভাবিক নিয়মে শাসন নেমে আসে তর্জনী উঁচিয়ে। ক্ষেত্র বিশেষে ভর্ৎসনা অনেক সময় শারীরিক সীমাকেও আক্রমণ করে। এমন নজীর মার্লিনের জীবনে অমিল নয়। রেইন্হার্টের স্কুলে মহলা চ'লেছে নৃত্যের। ঘর-ভরা লোক—শিক্ষক, সতীর্থ-শিল্পী, আরও অনেকেই আছেন। মার্লিনকে নাচতে হবে পর পর সবার সঙ্গে। ও তাই নাচেও, পারে না শুধু একজনের সঙ্গে। ছেলেটিকে ও কিছুতেই সইতে পারে না, ওকে সে কেবলই বিকর্ষণ করে। এমন জুড়ির সঙ্গে নৃত্য চলে না, চলে অঙ্গ-ভঙ্গী। মার্লিন তাই মুখ বেঁকিয়ে গোঁজ হোয়ে বসে থাকে। প্রথমটা মার মৃদু ভর্ৎসনা শোনা যায়, তারপর আড়ালটা যখন ভদ্রগোছের হ'য়ে ওঠে, একান্ত মার্লিনের গালে ঠাস্ ক'রে চড় কষিয়ে দেন তিনি। চিক্-চিক্ ক'রে ওঠে ওর গালে দু' ফোঁটা চোখের জল। মার্লিন নাচে ছেলেটির সঙ্গে—যে নাচ ম্লান ক'রে দেয় আগেরগুলোকে।

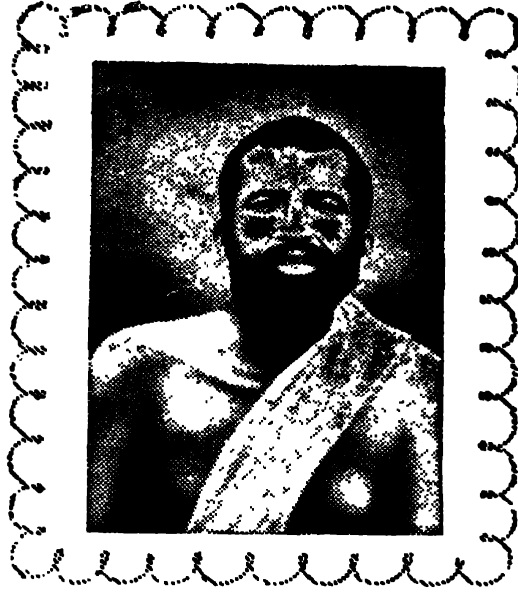
আজও মোছেনি মার্লিনের মন থেকে মার সেই অশ্রু-লেখা স্মৃতিটুকু। আজও তাই মনে পড়ে আসরে-সম্মেলনে, টেবিলে চায়ের নিমন্ত্রণে। কখন অলক্ষ্যে ওর হাতখানি চলে যায় কপোলে। আঙুলের স্পর্শে অনুভব করে দাগ,—আজও আছে সেই দাগ, স্পষ্ট, অতি স্পষ্ট, আকাশ-আকীর্ণ শতভিষার মত। দাগ আছে, নেই শুধু সেদিনের তিক্ততা, কখন তা মধুময় হোয়ে গেছে বোঝেনি মার্লিন......

জীবনে আরও দু'-একটি বসন্ত আসে মার্লিনের। শেষ

হোয়ে আসে শিক্ষার্থী জীবনের। সুরু এবার শিল্পের পথ পরিক্রমণ। তার জন্যে প্রস্তুত মার্লিন। কিন্তু সে পরিক্রমণের প্রারম্ভেই অপেক্ষা ক'রেছিল ওর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় ও মধুর বিস্ময়, যে বিস্ময় বসন্তের মতোই রঙীন, প্রয়োজন নেই যার জন্যে কোন প্রস্তুতির, বিনা আভরণেই যাকে বরণ ক'রে নেওয়া যায়। জীবনের অষ্টাদশ বসন্তে আবির্ভাব সেই অভাবনীয়ের।

বার্লিনের এক চিত্রপ্রতিষ্ঠানে কণ্ঠ পরীক্ষা দিতে গেছে মার্লিন। বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি হোয়ে এসেছেন বিখ্যাত সংলাপ-রচয়িতা রুডলফ্ সীবার। সীবারের সঙ্গে পরিচয় নেই মার্লিনের। তবু কিন্তু প্রথম দর্শনেই মনে হয় মার্লিনের সে যেন চির-পরিচিত, যেন তার সান্নিধ্যে কাটিয়েছে যুগযুগান্তর। চেনা সুর, চেনা গন্ধ, চেনা কোন পরিবেশের মতোই মার্লিনকে আকর্ষণ করে সীবার। দু'জনে মুখোমুখী—নীরব, নিশ্চল। অকস্মাৎ মহাশূন্যে প্রতিবেশী দু'টি তারা যেন নির্বেগ, নিষ্কম্প, প্রতীক্ষায় উন্মুখস্খলিত সেই মুহূর্তের জন্যে যখন ওরা এক হোয়ে মিশে যাবে একই কক্ষ পথে, একই আয়ন ক্রান্তিতে।

পরীক্ষা দেওয়া আর হয় না। অপলকে চেয়ে থাকে পল্লবঘন আঁখি তুলে, রুদ্ধকণ্ঠ মার্লিন। অন্তর্লীন আসঙ্গলিপ্সা ওর বক্ষের পাষাণ-প্রাচীরে মাথা খুঁড়ে মরে, উচ্ছ্বলিত হোয়ে ওঠে কামনার ফেনশীর্ষ দুরন্ত ঊর্মিমালা। বাস্তবকে মনে হয় ওর কল্পনার অনুকৃতি ব'লে। এই সেই পুরুষ যার জন্যে ও কাটিয়েছে অশ্রুসিক্ত বহু বিনিদ্র রজনী, তিলে তিলে যার জন্যে ও গ'ড়ে তুলেছে ওর দেহের দেউল, যার অন্তর্বিহারের জন্যে ওর জগতে জেগেছে বসন্ত। আদিম নারীত্বের সমুদ্র গুঞ্জন ধ্বনিত





হয় মার্লিনের কানে কানে। বহুদিন পরে আবার সেই উজুনপাড়ের বেকারীর সোঁদালো গন্ধ আর রুকারীর শঙ্কিত ছন্দের হাতছানি।

ছুটি ধারা এক হোয়ে মিশে যায়—সীবার আর মার্লিন। মোহানার পলিতে জেগে ওঠে সৃষ্টির আশীর্বাদ—ছু'টি বসন্ত পরে। ওদের জীবনে আসে মারিয়া—একমাথা সোনালী কোঁকড়া চুল, মোমের মত নরম তুলতুলে, হাঁসের মত ধবধবে সাদা, নীলাক্ষী মারিয়া। মার্লিনের নয়নের মণি। প্রথম মাতৃত্বের মধুর আস্বাদে ভরা মারিয়া, স্তবকিত বক্ষের রোমাঞ্চে ভরা মারিয়া……।

মারিয়া! মারিয়া! মারিয়া! মার্লিনের অন্ধ-স্নেহ আরণ্যক উচ্ছ্বলতায় আবর্তিত হয় মারিয়াকে কেন্দ্র ক'রে। মারিয়াকে ও এত ভালবাসে যে পৃথিবীশুদ্ধ লোকের কাছে তেরো তারিখটা অশুভ হোলেও মার্লিনের কাছে তা' চিরশুভ কারণ সেই তারিখেই মারিয়া জন্মেছে। ভারী পয়মন্ত মেয়ে এই মারিয়া। ওর জন্মের পর থেকেই সুরু হয় মার্লিনের শিল্পীজীবন। ডাক আসে রেইনহার্টের স্কুল সংশ্লিষ্ট সাধারণ মঞ্চ থেকে—'দি টেমিং অব দি স্রু' নাটকে বিধবার চরিত্রের জন্যে। মার্লিন আর দ্বিধা করে না। শিল্পীর পক্ষে প্রতিভাই বড় কথা, ভূমিকা নয়। সৃজনীক্ষমতা যার আছে বিকাশ তার সম্ভব যে কোন চরিত্রেই। এটা তো যা হোক মন্দের ভালো, পরবর্তী নাটক 'দি সার্কল'-এ ওকে এক লাইন সংলাপের একটি ভূমিকা দেওয়া হয়। তাতেও মার্লিনের উৎসাহ নেভেনি একটুও। ও জানে জীবনের ভিত্তি স্থাপনে ধৈর্যের অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হোতে হয়। তাছাড়া, এলিজাবেথ বার্গনারের মত প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীর সঙ্গে অভিনয় করা—সে বড় কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

কিন্তু এর চেয়েও বড় সৌভাগ্য প্রতীক্ষা ক'রে ছিল মার্লিনের, আরও ব্যাপক আরও সম্ভাবনায় ভরা। সে এক স্মরণীয় ঐতিহাসিক রাত্রি মার্লিনের জীবনে, বার্লিনের মঞ্চ ইতিবৃত্তে, জার্মানীর অভিনয়-ঐতিহ্যে।

সেদিন রাত্রে রেইনহার্টের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখতে এসেছেন জার্মানীর প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক ফন ষ্টার্ণবার্গ। মার্লিনও আছে সেদিনকার শিল্পী-সম্প্রদায়ে। ক্ষুদ্র একটি অংশ, তবুও এমন প্রত্যক্ষানুগামী অভিনয়, এমন আত্মিক স্পর্শবহ ব্যঞ্জনা স্টার্ণবার্গ দেখেননি ইতিপূর্বে। আকাশ-ছোঁয়া বিস্ময়ে তিনি চেয়ে থাকেন। মনে হয়—দক্ষিণ সমুদ্রের সবুজ কোন দ্বীপ ও তুলে এনেছে মঞ্চে, যেন মরুর মেরু অভিনয়ে ও বয়ে এনেছে বরফের গন্ধ, যেন উদগ্রীব হোয়ে আছে কোনও আগ্নেয়গিরি সূর্যের বিদীর্ণতায় নিজেকে [illegible] অপেক্ষায়।

ষ্টার্ণবার্গ উৎফুল্ল হোয়ে ওঠেন সন্ধিৎসু প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো ঈপ্সিত বস্তুর নাগালে এসে। মার্লিনকে তাঁর চাই। মার্লিনই তাঁর 'ব্লু এঞ্জেল'। ও-কে ছাড়া ছবি তাঁর হবে নিষ্প্রাণ, নীলিমা হয়তো আসবে, আসবে না উর্বশীর সুষমা, ভ'রে তা উঠবেনা স্বর্গের স্বাভাবিকতায়।

অভিনয় শেষে মার্লেন এসে দাঁড়ায় ষ্টার্ণবার্গের সামনে। অভ্রলেহী পাহাড়ের পাদমূলে ব্রততীর বিনম্র আনতি। গুরু আর শিষ্যের প্রথম সাক্ষাৎ। প্রথম প্রস্তুতি মার্লিনের চিত্রদীক্ষায়।

উফা ষ্টুডিও। এমিল জেনিংসের নায়িকা হোতে হবে 'দি ব্লু এঞ্জেল'-এ। তবে পথ খুব সোজা নয়, আবার পরীক্ষা। প্রযোজকের তরফের লুসি মান্‌হাইম্‌ ওর প্রতিদ্বন্দ্বী ভূমিকাটির জন্যে। তা হোক, ভয় ওর করেনা, বরং জয় করে বিচারকদের সুরেলা কণ্ঠে। তবু কিন্তু প্রযোজক এরিক পমার পুরো রাজী হোতে পারেন না লুসির প্রতি পক্ষপাতিত্বে। ষ্টার্ণবার্গ সিদ্ধান্তে অটল। পমারকে জানান—মার্লিন ছাড়া এ ছবি তিনি তুলবেন না। আবার ফিরে যাবেন আমেরিকায়। নিরুপায় পমারকে শেষে রাজী হোতে হয়। পাঁচ হাজার ডলারের চুক্তিতে মার্লিন কাজ করে জার্মান আর ইংরিজি সংস্করণে।

'দি ব্লু এঞ্জেল' সফল, সার্থক—মার্লিনের স্ফুরিত প্রতিভার প্রভায় প্রদীপ্ত। এমন সজীব অভিনয় অমিল, মেলেনা এমন আবেগ-অনুভূতির আন্দোলনে উদ্বেল সমুদ্র-চন্দ্রিকার আস্বাদ। মনে হয় পর্দার ব্যবধান সরিয়েও যেন নিয়ে যায় দর্শককে ওর প্রমোদকল্লোলিত সন্নিহিতে—শীতল ময়ূখ-ঝরা মাটির অতীত কোন মাটিতে—শব্দ যার ভেসে আসে তন্দ্রাবিল কানে দূরাগত পাখীর ডাকের মতো, আমেজ যার ভেসে আসে নরম মসৃণ কোন রাত-শেষের জ্যোৎস্নার মতো। মহুয়া-মদির উল্লাসে উৎকীর্ণ দর্শক। অগণিত স্তাবকের স্তুতিগুঞ্জনে কম্পমান দিক-দিগন্ত।

মার্লিনের সার্থকতার আনন্দ নামে অনিবার স্নেহের বন্যায় অজস্র অনাবৃত চুম্বন হোয়ে। মারিয়ার গালে গালে ফুটে ওঠে চুমুর সজল লেখা। সাবারের চা ঢালতে ঢালতে পিরিচে চামচ্‌ বাজিয়ে নেচে ওঠে মার্লিন, নেচে ওঠে সাবারের নীল পরী······

'দি ব্লু এঞ্জেল'-এর সাফল্য মুহূর্তে স্পর্শ করে আমেরিকার তার। চিত্রামোদীর অন্তরে অন্তরে সৃষ্টি করে বহ্নুৎসব মার্লিনের সাগ্নিক শিখা। অসংখ্য তাগিদের জোয়ারে ওর আহ্বান আসে হলিউড থেকে। প্যারামাউণ্টের প্রধান কর্তা স্বয়ং সুলবার্গ মার্লিনের বার্লিন-দ্বারস্থ। কিন্তু?

কিন্তু কি ক'রে ও যায় মারিয়াকে নিয়ে অত দূর দেশে? সুলবার্গও নাছোড়বান্দা। শেষটায় চুক্তিপত্রে আরও একটি সর্তের যোগ হয়: ভালো না লাগলে যেকোন মুহূর্তেই হলিউড ত্যাগের অবাধ স্বাধীনতা থাকবে মার্লিনের। স্বেচ্ছাধীন সর্ত আর স্ফীত ডলারের এক চুক্তির নিশ্চিন্ত আশ্বাসে ভর ক'রে মার্লিন যাত্রা করে আমেরিকা······

(শেষাংশ ১৬১ পৃষ্ঠায়)

সোভিয়েট রঙ্গজগতে ★ ★

● ● ● নিমাই ঘোষ

সোভিয়েট রঙ্গজগতের বিবৃতি অর্থহীন হবে যদি মস্কো বোলশোই থিয়েটারের কথা না বলা হয়। সোভিয়েট সংস্কৃতির সবচেয়ে গর্ব্বের এবং গৌরবের বস্তু বোলশোই থিয়েটার ; বোলশোই তাঁদের রঙ্গভুনিয়ার শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। রঙ্গমঞ্চ হিসাবে এর বিরাটত্বের সমকক্ষতা আর কোন দেশ দাবী করতে পারে কিনা সন্দেহ। অন্যান্য ইউরোপীয় বা মার্কিন রঙ্গমঞ্চ দেখার সুযোগ আমার হয় নি। কিন্তু যাঁরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে থেকেছেন —এমন সঙ্গী আমাদের সঙ্গে ছিলেন তাঁদের মুখে শুনেছি যে এত বৃহৎ ব্যাপার তাঁরা পূর্ব্বে কখনও দেখেননি।

'অর্ডার অফ্ লেনিন' সম্মানে ভূষিত ষ্টেট একাডেমিক বোলশোই থিয়েটার-এর ইতিহাস, প্রকৃতপক্ষে রুশজাতীয় গীতিনাট্য (opera) ও নৃত্যনাট্যেরই (Ballet) ইতিহাস—যার শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বজনস্বীকৃত।

১৭৬ বছর আগে অর্থাৎ ১৭৭৬ সালের ২৮শে মার্চ মস্কোর তৎকালীন নাট্যজগতের সুবিখ্যাত পি, ভি, উরুশভ মস্কো নগরীতে পাকা থিয়েটার গ'ড়ে তোলার অনুমতি পান এবং সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ নট ও নটী সমন্বয়ে একটি দল গঠন করেন। গোড়ার দিকে ভরনটশভ নামে এক ধনীর গৃহে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়েছিল ; তারপর ১৭৮০ সালে পেট্রোভস্কি ষ্ট্রীটে জমি নিয়ে এই থিয়েটারের জন্যে বিশেষভাবে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করা হয় এবং তার নাম হয় 'পেট্রোভস্কি'। বর্ত্তমানের বোলশোই থিয়েটার এই একই জমির ওপর নির্ম্মিত হয়েছে।

'পেট্রোভস্কি'-তে প্রথম দিকে একই দল গীতিনাট্য এবং নাটক উভয় বিভাগেই কাজ করতেন। তারপর ক্রমশঃ উচ্চশ্রেণীর বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয় এবং থিয়েটারের নিজস্ব অর্কেষ্ট্রা-দলও সংগঠিত হয়। এই নাট্যশালা পত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই 'রাশিয়ান কোর্ট থিয়েটার ট্রাডিশান'-এর বিচ্যুতি ঘটে এবং এই সংগঠন দেখতে দেখতে জাতীয় নাট্যশিল্পের পর্য্যায়ে উন্নীত হয়।

এই সংগঠনের গীতিনাট্য এবং নৃত্যনাট্যগুলির ভিত্তি ছিল লোকসঙ্গীত এবং লোকনৃত্যের ওপর। এই কারণেই এঁদের প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে রুশবাসীদের জাতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যেতো এবং ঐ একই কারণে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব এঁদের অভিনয়ের ধারাকেও প্রভাবান্বিত ক'রেছিল। জোরিন রচিত 'রিবার্থ' পেট্রোভস্কিতে প্রথম রুশ অপেরা হিসেবে অভিনীত হয় এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে। এরপর রুশ রচয়িতাদের গীতিনাট্য একের পর এক মঞ্চস্থ হ'তে থাকে, এবং 'পেট্রোভস্কি' মস্কোবাসীর কাছে 'অপেরা হাউস' নামে খ্যাতিলাভ করে।

খাঁটি রুশ গীতিনাট্য এবং মঞ্চশিল্পের অগ্রগতির সাহায্যে 'পেট্রোভস্কি' প্রভূত প্রেরণা জুগিয়েছিল। অভিনয়ে অভিনবত্ব সৃষ্টি কর', জনগণের জীবন ধারার সঙ্গে নিকট সম্পর্ক স্থাপন করার মূলে ছিল তৎকালীন রচয়িতাদের প্রগতিশীল এবং গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রগাঢ় প্রভাব।

১৮০৫ সালে আগুন লেগে 'পেট্রোভস্কি' ধ্বংস হ'য়ে যায়। পরবর্ত্তী বিশ বছর উক্ত সংগঠন তাঁদের কাজ নিয়মিত চালিয়ে যান বটে, কিন্তু কোন পাকা নাট্যশালা গঠন করা হয় নি।

১৮২৫ সালে প্রফেসর মিখাইলভ্-এর নক্সা অনুযায়ী বোলশোই থিয়েটার নির্ম্মিত হয়। এতবড় থিয়েটার গৃহ তখনকার দিনে আর কোথাও তৈরী হয়নি বলেই সবাই জানতেন। আমি বলি আজও হয়েছে কিনা সন্দেহ। বিখ্যাত "ট্রায়াম্ফ অফ্ মিউজ" দিয়ে বোলশোই থিয়েটারের শুভ উদ্বোধন হয়। কবি দিমিট্রিয়েভের কাব্যের ওপর ভিত্তি করে 'এ্যালিয়াবিয়েভ' এবং 'ভারট্রস্কি' এই বিখ্যাত রচনা করেন। এই 'প্রোলোগ' রুশ জাতীয় অপেরার বনিয়াদ হবার গৌরবই দাবী করে না—রুশ সুরশিল্প ও নাট্যাভিনয় কোন্ পথে যাবে তার দিক্ নির্ণয়ও করেছিল বহুদিন ধ'রে। এর পরেও বহু বিখ্যাত অপেরা মঞ্চস্থ হ'য়েছিল কিন্তু দুনিয়ার দরবারে রুশ গীতিনাট্য 'গ্লিনকোর' আবির্ভাবের পর থেকেই প্রতিষ্ঠা



অভিনীত হওয়ার পর ডাইরেক্টরেট অফ্‌ ইম্পিরিয়াল থিয়েটার বড়ই বেসামাল হ'য়ে পড়েন এবং জনসাধারণের প্রগতিমুখী রুচি এবং উন্নততর শিল্পের প্রতি আকর্ষণ বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে বোলশোই মঞ্চে হাল্কা ও সস্তা তামাসায় উৎসাহ দিতে থাকেন। বিদেশী থিয়েটারের দলের কাছে মঞ্চ ভাড়া দেওয়া হয়। মেরেলীর ইতালীয় অপেরা দল সপ্তাহে ৪।৫টা ক'রে প্রদর্শনীর সুযোগ পেতে থাকে। কিন্তু রুশদেশীয় রচয়িতাদের অপেরা বা ব্যালে বহু চেষ্টা করে মাঝে-মধ্যে অভিনয় করার অনুমতি পায়। ছাই চাপা দিয়ে আগুনের উত্তাপ এবং উজ্জ্বলতা যেমন ঢাকা দিয়ে রাখা সম্ভব নয়—তেমনি রুশ রচয়িতাদের অতুলনীয় প্রতিভা ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি চেপে রাখতে পারেনি। সারা বিশ্ব বিমুগ্ধ বিস্ময়ে দেখেছে—রিম্‌সি কর্‌স্‌কভ্‌-এর "দি স্নো মেডেন্‌", বোরোডিন্‌-এর—"প্রিন্স আইজোভ" (আমরা এই অপেরাটি দেখেছি), ছাইকভ্‌স্কি অপেরা—"দি কুইন অফ্‌ স্পেড্‌স্‌", ইউজিন ওনেজিন-এর ব্যালে—"দি সোয়ান লেক্‌," (আমরা দেখেছি,—যতক্ষণ রেখেছি মনে হয়েছে একটি মধুর স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে রয়েছি)। এছাড়াও ডারগোমাইজস্কি এবং মুসরগ্‌স্কির শক্তিশালী সৃষ্টিগুলি সারা দুনিয়ার সশ্রদ্ধ দৃষ্টি রুশ মঞ্চের প্রতি আকৃষ্ট করেছে।

চ্যালিএ্যাপিন এবং সোবিভব-এর মতো প্রতিভাবান গায়ক এবং নেজ্‌ডানভের মত সুকণ্ঠী গায়িকার আবির্ভাব বোলশোই-এর ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। নৃত্যশিল্পী রোসল্যাভ্‌লেভা, ডাজহরি, গেট্‌সার, টিকমিরভ এবং গোরস্কি-র নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

১৯০৫ সালের বিফল বিপ্লবের ধাক্কা বোলশোই ষ্টেজ-এও লেগেছিল। প্রগতিমুখী মঞ্চশিল্প আর একবার বাধা

লাভ করে এবং ক্রমশঃ সমগ্র নাট্যজগতে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি করে।

১৮৪২ সালে গ্লিনকোর "আইভ্যান-সুসানিন" প্রথম মঞ্চস্থ হয় এবং তার বছরচারেক পরেই তাঁর বিরাট সৃষ্টি "রুশলান এ্যাণ্ড লুডমিলা" অভিনীত হয়।

প্রসঙ্গতঃ এইখানে একটু ব'লে দিই—আজ ১১০ বছর হ'য়ে গেল এখনও এই দুটি বিখ্যাত অপেরা নিয়মিত অভিনীত হ'য়ে থাকে। আমরাও এই দুটি অপূর্ব্ব অপেরা দেখে এসেছি। 'আইভ্যান্‌-সুসানিন্‌'—এক বৃদ্ধ দেশপ্রেমিক কৃষকের পোল্যাণ্ডদেশীয় আক্রমণকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্জ্জয় প্রতিরোধের কাহিনী। "রুশলান এ্যাণ্ড্‌ লুডমিলা" একটি রূপকথা; একটি নির্ম্মল প্রেমের কাহিনীর মধ্য দিয়ে উঁচুদরের ভাব এত সুন্দরভাবে পরিবেশন করা হ'য়েছে যাতে দর্শকের মনের সৎ প্রবৃত্তিগুলি সতেজ হ'য়ে ওঠে। এই দুটি অপেরা এক শতাব্দী আগে যে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন ক'রেছিল, আজও তা' এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি।

জার-শাসিত রাষ্ট্র কিন্তু রুশ মঞ্চের এই প্রগতিশীলতায় বড়ই বিচলিত হ'য়ে প'ড়েছিল। বিশেষ ক'রে গ্লিনকো এই প্রগাঢ় সাঙ্গীতিক তাৎপর্য্য[illegible] দুটি

পায়। করম্যালিজ্‌ম্ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বিষয়বস্তুর গভীরতার পরিবর্তে অর্থহীন ব্যহ্যিক আড়ম্বর বেশী আদর পায়। কিন্তু এ অবস্থা বেশীদিন টেঁকেনি।

এরপর আসে মহান্ "অক্টোবর-বিপ্লব"। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সফলতার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই শিল্প ক্ষেত্রেও প্রতিক্রিয়ার সমাধি রচিত হয়। অত্যন্ত অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে রুশ মঞ্চশিল্প—আদর্শ এবং কলার দিক থেকে উচ্চ হ'তে উচ্চতর স্তরে দ্রুত উন্নীত হতে থাকে। দুষ্ট রাজকর্ম্মচারীদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গালয় তার প্রবেশ পথ উন্মুক্ত করে দেয় নতুন দর্শকদের জন্য—তারা মজুর—তারা চাষী—তারা লাল-ফৌজ! এই নতুন দর্শকদের জন্য নতুন ধরণের অপেরাও রচিত হতে থাকে, যার বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয় মূলতঃ ঐতিহাসিক এবং বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর মধ্য থেকে।

সোভিয়েট্-এ আসলে আজ অবধি বহুবিখ্যাত অপেরা এবং ব্যালে রচিত ও মঞ্চস্থ হয়েছে। এর মধ্যে কতকগুলির জনপ্রিয়তা এতবেশী যে, বোলশোই-এর তালিকায় সেগুলি কায়েমীভাবে জায়গা দখল ক'রে নিয়েছে। যেমন ব্যালের মধ্যে গ্লিয়ারের—"রেড পপি", এ্যাসফেইভের "ফ্লেমস্ অফ্ প্যারিস" এবং "দি ফাউণ্টেন অফ্ বাখ্‌চিসরাই" ইত্যাদি অপেরার মধ্যে ডেজারজিন্‌স্কির "দি সয়েল আপটার্ণড্", চিজকোভের "দি আরমারড্ ক্রুজার-পোটেমকিন,"—জেলোবিনস্কির "মাদার" এবং গ্লিয়ারের 'দি ব্রোনজ্ হর্সম্যান' ইত্যাদি (আমরা এই বিখ্যাত অপেরাটি দেখেছি)।

আমরা "রেড পপি" ব্যালেটি দেখেছি। চীনের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের অপূর্ব্ব কাহিনী, অতুলনীয় সৃষ্টি—যা কেবল দেখেই উপলব্ধি করা যায়—ব'লে বা লিখে তার চমৎকারিত্ব বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা! নায়িকার ভূমিকায় নেমেছিলেন উলানোভা (একাধিকবার 'ষ্ট্যালিন প্রাইজ' পেয়েছেন)। কেবল নাচের মধ্য দিয়ে এত গূঢ় তাৎপর্য্যপূর্ণ কাহিনী এত প্রাঞ্জলভাবে বলা যে সম্ভব "রেড পপি" দেখার আগে তা' আমাদের ধারণাতীত ছিল।

সোভিয়েট রচয়িতাদের হালফিল রচিত "বোরিস গডনভ" এবং "কেফ্ কভ্" নামক দুটি বিখ্যাত অপেরা আমরা [illegible] গ্লিয়ার-এর [illegible] ব্রোনজ্ হর্সম্যান-ও

দেখেছি। প্রযোজনার বিরাটত্ব অবর্ণনীয়। ষ্টেজক্র্যাফট্ যে কোথায় উঠেছে না দেখলে বিশ্বাস করা মুস্কিল। যাঁরা তাঁদের "গ্র্যাণ্ড কন্‌সার্ট ফিল্ম"টি দেখেছেন তাঁরা কিছুটা ধারণা করতে পারেন—কারণ ছবিটি বোলশোই থিয়েটারকেই কেন্দ্র করে তোলা।

১৯৩৭ সালে বোলশোই থিয়েটার "অর্ডার অফ্ লেনিন" সম্মানে ভূষিতও হয়েছে। এই থিয়েটারের ১২টি প্রোডাক্‌শন ষ্ট্যালিন প্রাইজ লাভ করেছে এবং ৬৫জন শিল্পী ষ্ট্যালিন প্রাইজ পেয়েছেন।

এই শিল্পীরা বোলশোই মঞ্চেই তাঁদের কর্ত্তব্য শেষ করেন নি; দেশের জনজীবনের সঙ্গে তাঁদের প্রায় নাড়ীর সম্পর্ক। বোলশোই ছাড়াও বিভিন্ন রিপাব্লিক-এর মঞ্চেও তাঁরা অভিনয় করেন—তা'ছাড়া শ্রমিকদের ক্লাবে (হাউস অফ্ কালচার) এবং সমবায় কৃষি প্রতিষ্ঠানের ক্লাবসমূহে গিয়ে গান শুনিয়ে এবং নাচ দেখিয়ে কর্ম্মীদের অনুপ্রাণিত করাও তাঁদের কর্ত্তব্যের মধ্যেই পড়ে বলেই তাঁরা মনে করেন।

বোলশোই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে তার ষ্টেজ্ এবং টেক্‌নিক্যাল দিকটা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার বলে মনে করি। ষ্টেজ্‌টির ওপনিং ৪৫ মিটার, (১ মিটার = এক গজের সামান্য কম), ডেপ্‌থ্ ৪৫ মিটার, এবং হাইট্ ৬০ মিটার। ষ্টেজ-এর ফ্লোরটি বহু আকারে এবং ভাগে বিভক্ত এবং তার যে কোন অংশ 'হাইড্রলিক' পদ্ধতিতে ওপরে উঠে যায় বা নীচের দিকে নামিয়ে গর্ত্তের সৃষ্টি করা যায়। সমস্ত ব্যাপারই,সেই পট-পরিবর্ত্তন থেকে সুরু করে ষ্টেজ-এ ষ্টীম্ দিয়ে কুয়াশা বা ঝড় ইত্যাদি সৃষ্টি করা, সব-কিছুই যন্ত্রচালিত।

ব্যাক্ ড্রপগুলি (সিন্ পিছনে যা থাকে) অভিনব। মাছধরার জালের মত জিনিষের ওপরে, কারপেট জাতীয় উপাদানের ওপর ছবি এঁকে, তারপর তার কাট্-আউট কেটে ঐ বিরাট জালগুলিতে মানানসই করে আটকে দেওয়া হয়েছে। পর্দ্দাগুলিকে ষ্টেজ-এ যখন একের পর একটি ক'রে ফেলা হয়, জালগুলি প্রায় অদৃশ্য হ'য়ে যায়—আলোকসম্পাতে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে 'কাট্‌আউট্'গুলি—২।৩টি বিভিন্ন প্লেন-এ। বিভিন্ন প্লেন-এ গাছপালা, বাড়ীঘর থাকায় অদ্ভুত ডেপথ্-এর সৃষ্টি হয়। এই জালের নীচের দিকে অর্থাৎ যেখানে ষ্টেজ এসে ঠেকেছে, সেখানে বিরাট-বিরাট ছিদ্র কাটা আছে যার ভেতর দিয়ে অভিনেতা অভিনেত্রীরা বিভিন্ন 'ব্যাকড্রপ'-এর সামনে যাতায়াত করেন। ছিদ্রগুলিও চোখে পড়েনা, ফলে ষ্টেজ-এর সমস্ত ডেপথ-টায় তাঁরা এ্যাক্‌শন নিয়ে 'কভার' করতে পারেন। এখানে উইংস্-এর ধার থেকে 'প্রম্পট্' করা হয় না। ষ্টেজ-এর পাদপ্রদীপের কাছে মাঝামাঝি জায়গায় 'ফ্লোর'-এ খানিকটা কাটা থাকে, 'প্রম্পটার' তার মধ্যে ঢুকে দাঁড়ান—তাঁর মাথাটা ঠিক 'ফ্লোর লেভেল'-এর ওপরে থাকে এবং তাঁকে লুকোবার জন্যে একটি ইস্পাতের ঢাকনা দেওয়া থাকে; বাইরে থেকে দেখলে সেটিকে কচ্ছপের পিঠের মত একটি বস্তু 'ফ্লোর'-এ পড়ে রয়েছে বলে মনে হয়। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেই তবে চোখে পড়ে, নাহলে ব্যাপারটা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। 'প্রম্পটার' প্রকৃতপক্ষে অভিনেতাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'প্রম্পট' করেন এবং বেশ জোরেই বলতে পারেন, কারণ, তাঁর শব্দের 'থ্রো'টা ষ্টেজ-এর ভেতর দিকেই যায়, 'অডিটোরিয়াম'-এর দিকে মোটেই আসে না।

উইংস-এর পাশে একটি কনট্রোল চেম্বার আছে। কনট্রোল-বোর্ডটি দেখলে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ-এর কথা মনে পড়ে—পরিচালক সেখানে বসে বিভিন্ন বোতাম টিপে বিভিন্ন বিভাগে সঙ্কেত করেন এবং যন্ত্রচালিত নানারকম 'এফেক্ট' ও 'স্পেশাল এফেক্ট' সুচারুভাবে নাটকের সঙ্গে তাল রেখে সম্পাদিত হ'তে থাকে। ষ্টেজ-এর সামনে, ঠিক নীচেই, ১২৫ জন যন্ত্রীসমন্বিত অর্কেষ্ট্রা এফেক্ট এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুরসৃষ্টি করতে থাকে। এই সবের যোগফল দর্শকের মধ্যে এক অতুলনীয় অনুভূতির সঞ্চার করে। বোলশোই থিয়েটারে মোট বসবার আসনের সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশী।

বোলশোই ছাড়া আমরা মস্কো আর্ট থিয়েটার-এর মলি থিয়েটারে নাটক দেখেছি। লেনিনগ্রাদে পুশকিন থিয়েটার দেখেছি, সোচিতেও অপেরা দেখেছি। 'কিয়েভ'এ থিয়েটার দেখেছি, টাসকেন্ট এ অপেরা দেখেছি—অন্যান্য রঙ্গমঞ্চগুলি বোলশোই-এর তুলনায় আয়তনে অপেক্ষাকৃত ছোট, কিন্তু ষ্টেজ ক্র্যাফট-এর মূল টেকনিক মোটামুটি সবজায়গাতে একই।

'মলি থিয়েটার' এ আমাদের দুটি নামকরা নাটক দেখার সুযোগ হয়। একটি 'আনফরগেটেবল্ ১৯১৯', অপরটি শেকভ্-এর 'আংকল্ ভ্যানিয়া'। প্রথমটি বলা বাহুল্য বিপ্লবের পটভূমিকায় রচিত। দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ হৃদয়-আবেদনবহুল প্রণয়নাট্য। 'আংকল ভ্যানিয়া'র ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন মিঃ অরলোফ। ইনি রুশ নাট্যগুরু ষ্টানিস্লাভস্কির অতি প্রিয় এবং সুদক্ষ সাকরেদ ছিলেন—৬০ এর কোঠায় পা বাড়িয়েছেন। ইনি রাত্তিরে ষ্টেজ-এ অভিনয় করেন আর দিনে 'ষ্টেট্ ইনষ্টিটিউশন্ অফ্ ড্রামাটিক আর্ট'-এ মাষ্টারী করেন। আমরা সেখানে গিয়ে দেখেছি কি অক্লান্ত পরিশ্রমে ছেলেমেয়েদের শেখাচ্ছেন কি ক'রে অভিনয় করতে হয়। ক্লাশরুমের মধ্যে একটি পরিপূর্ণভাবে সজ্জিত মঞ্চও আছে। সঙ্গে একটি চমৎকার 'মেক-আপ' করার ঘর—ছাত্ররা পাকা 'মেক-আপ' ক'রে এবং পোষাক পরিচ্ছদ পরে কোন একটি নাটকের বিশেষ অংশ অভিনয় করে এবং অরলোফ সেটি নিখুঁতভাবে অভিনীত না হওয়া পর্য্যন্ত তালিম দিয়ে যান। সেই নাট্য-শিক্ষা-বিদ্যালয়ে থেকে ৫।৬ বছর অধ্যয়ন ক'রে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর কোন ছাত্র বসে থাকার অবসর পায় না। সোভিয়েট ইউনিয়নের রিপাবলিকের বিভিন্ন মঞ্চে তাদের জন্য কাজ অপেক্ষা করে।

ব্যালে ইনস্টিটিউট-এ গিয়েও দেখেছি কি চমৎকার-ভাবে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে শুনেছি বোল-শোই এর খ্যাতনামা নাচিয়েরা মাষ্টারী করেন এবং এখান-কার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা ছাত্রাবস্থাতেই মঞ্চে নাচার সুযোগ পায়। এই সব ইনস্টিটিউট থেকে পাশ ক'রে বেরিয়েই তারা সরাসরি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদান করে। এছাড়া সোভিয়েট ইউনিয়নের রঙ্গমঞ্চসমূহে শিল্পী সংগ্রহের আর একটি অভিনব উপায় আছে [illegible] বোলশোই

থিয়েটারে এবং অন্যান্য রিপাবলিক-এর বড় বড় মঞ্চে একটি ক'রে বাৎসরিক কাউন্সিল হয়। তাতে ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। যেমন মস্কো ষ্ট্যালিন অটোমোবাইলস্ ফ্যাক্টরীর কর্মীদের একদল, ইন্‌জিভি কালেকটিভ ফার্ম্ম থেকে একদল অর্থাৎ নানা কলকারখানা এবং ক্ষেতখামার থেকে সঙ্গীত ও নৃত্যানুরাগীদের সখের দল এই সব কন্‌সার্ট-এ যোগদান করেন। তাঁরা আবার সঙ্গীত এবং নৃত্যে শিক্ষা লাভ করেন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের 'হাউস অফ কালচার' থেকে। পণ্ডিত ও অভিজ্ঞ শিল্পীরা এইসব জায়গায় মাষ্টারী করেন। এই কন্‌সার্টএর টিকিট বিক্রি ক'রে জনসাধারণের সামনে অনুষ্ঠিত হয় এবং বিচারকদের মধ্যে থাকেন বহু বিচক্ষণ সমালোচক এবং এ্যাকাডেমিসিয়ান। এই সব কনসার্ট-এ যাঁরা কৃতিত্ব দেখান বোলশোই বা যে কোন বড় বড় মঞ্চে যোগদান করার জন্যে তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমরা এই ধরণের দু'একটি কন্‌সার্ট-এ উপস্থিত ছিলাম। দাদা (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য) তাঁদের প্রশ্ন করেছিলেন, 'বাপু তোমাদের সখের শিল্পী এবং পেশাদারী শিল্পীদের মধ্যে কি প্রভেদ বল তো? আমি তো কোনো তফাৎ পাচ্ছি না।' উত্তরে তাঁদের একজন বলেন, 'কথাটা আপনি ঠিক-ই বলেছেন। একজন এ্যামেচার আর্টিষ্ট যখন পাবলিক ষ্টেজে এসে কন্‌সার্ট-এ আত্মপ্রকাশ করার পর্য্যায়ে পৌঁছয় তখন কাজে উৎকর্ষের বিচারে তার সঙ্গে একজন পেশাদারী আর্টিষ্ট-এর প্রভেদ বড় একটা পাওয়া যায় না। আমরা পেশাদার আর্টিষ্ট তাঁদেরই বলি যাঁরা নাচ, গান ও নাটক ছাড়া আর কিছু করেন না—এই আর কি!' সত্যিই তাই! আমরা কিয়েভ-এ গত বছরের এই ধরণের একটা কনসার্ট-এ রঙীন ডকুমেণ্টরী ছবি দেখি তাতে কোন খামারের এক ট্র্যাকটর চালককে গাইতে দেখি। পরে শুনি ঐ অপূর্ব্ব

গায়কটিকে বোলশোই মঞ্চে যোগদান করার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি সলজ্জভাবে সে আহ্বান এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে, 'আমার গলা হয়তো ভালো হ'তে পারে কিন্তু আমার চেহারা এমন কিছু ভালো নয় যে আমি বোলশোই-এ নামতে পারি। বোলশোই আমাদের বড় গর্ব্বের জিনিষ, কাজেই আপনারা নিখুঁত শিল্পী খুঁজে নিন।' তারপর সেই ছবিতেই এক চিনির কারখানার একটি মেয়েকে গাইতে দেখি। শুনি তিনি নাকি বর্ত্তমানে বোলশোই থিয়েটার-এ এক খ্যাতনামা গায়িকার পদে প্রতিষ্ঠিতা (প্রাইমা ডোনা)।

এইসব দেখে, এটুকু বুঝেছি যে সোভিয়েট রঙ্গজগৎ এমনই একটি দুনিয়া, যেখানে কোনো প্রতিভাকেই এমন কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয় না যে—"চান্স পেলে দেখিয়ে দিতাম—জীবনে চান্স-ই পেলাম না হায়!" একথাও বুঝেছি এখানে চান্স পেতে হ'লে প্রকৃত গুণের প্রয়োজনই হয়। মালিকের সম্বন্ধী বা প্রোডিউসারের রক্ষিতা হ'য়ে বাজীমাৎ করার রাস্তা বন্ধ। প্রকৃত গুণীকে এখানে তাঁবেদারী বা সুপারিশের ওপর ভরসা ক'রে অনিশ্চয়তার ভয় বুকে নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে আড়ষ্ট হ'য়ে চেয়ে থাকতে হয় না। পরিষ্কার বুঝেছি, এখানে প্রতিভা কখনও নজর এড়ায় না; যেখানে আমার দেশে, শুধু আমার দেশ বলি কেন, যে কোন ধনতান্ত্রিক দেশে কত প্রতিভা তার যোগ্যতা প্রমাণ করার অনুকূল পরিস্থিতির অভাবে অথবা আত্মসম্মান বজায় রাখার তাগিদে তাঁবেদারী বা তৈলমর্দ্দনের প্রতিযোগিতায় হার মেনে চোখের আড়ালে নিঃশব্দে শেষ হ'য়ে যাচ্ছে। অথচ কত মাকাল-ফল শেসোক্ত অপকৌশলের জোরে রঙ্গজগতে জাল মুদ্রার মতো চালু রয়েছে। সোভিয়েট রঙ্গজগতে আমরা দেখে এসেছি প্রবীণ অভিজ্ঞ অভিনেতা, যাঁদের চুল সাদা হ'য়ে গেছে। সমাজ এবং রাষ্ট্রে তাঁদের স্থান কত উচ্চে, কি নিশ্চিন্ত স্বচ্ছন্দ জীবন তাঁদের। আর এই শ্রেণীর বহু ব্যক্তিদের এখানেও দেখি!—কি করুণ দৃশ্য! শেষ বয়সে সাহায্য রজনীর দিকে চেয়ে থাকতে হয়। বেশীদূর যাবার দরকার কি? মস্কোতে থাকতেই দাদাকে বল্‌তে শুনেছি—"হ্যাঁ হে এ আবুহোসেনী আর কতদিন? দেশে ফিরে সংসার ঠেলার কথা মনে হ'লে যে হাত পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে যাচ্ছে।" দাদার মত একজন ক্ষমতাশালী প্রতিভাবান ৬৫ বছরের প্রবীণ অভিনেতার মুখে কেন একথা শুন্‌তে হয়? এই "কেন"র উত্তর খুঁজে বার করবার সময় আজ এসেছে। খুঁজে বার করার কথা বল্‌লাম কারণ এই "কেন"র জবাব যে কেবল রঙ্গজগৎ হাঁতড়ালে পাওয়া যাবে না, এ কথা আজ আর বুঝতে কষ্ট হয় না। সঠিক কারণগুলি বুঝিয়ে বলার ভার যোগ্যতর ব্যক্তিদের ওপরেই রইলো—কিন্তু আমার সহজ বুদ্ধিতে মোটা দাগের সাদা কথা যা বুঝেছি তা হ'ল, যেহেতু দাদা সোভিয়েট রঙ্গজগতের মানুষ নয়, তাই আজ ৬৫ বছর বয়সে ৮৫ বছরের বৃদ্ধের মত দৈহিক আকৃতি ও অবস্থা নিয়ে এবং জীবনের সবটুকু নাট্যশিল্পের বেদীতে নিংড়ে দিয়েও আজ কপালের চামড়ার প্রতিটি কোঁচে সংসার ঠেলার এবং আগামীকালের স্থায়ী দুশ্চিন্তা কত ভয়াবহভাবে প্রকট হ'য়ে উঠেছে। আর মিঃ অরলোফ্ আমাদের রঙ্গজগতের মানুষ নয় বলেই ৬০ এর কোঠায় পা বাড়িয়েও ৪৫ বছরের



স্বাস্থ্যবান প্রৌঢ়ের মত চেহারা নিয়ে জীবনের যা কিছু প্রয়োজনীয় তার প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাস ক'রে, নিশ্চিত এবং নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের আওতায় বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে নাট্য-কলাকে উন্নত হ'তে উন্নততর স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে নওজোয়ান শিল্পীদের নেতৃত্ব করার গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে রয়েছেন। অক্লান্ত পরিশ্রমের পূর্ণ পরিতৃপ্তি তাঁর কথায় বার্ত্তায় এবং চোখে মুখে ফুটে বেরুতে দেখেছি।

যাই হোক্, আবার খেই ধরা যাক্। "সোভিয়েট পাপেট থিয়েটার" সম্বন্ধে না বল্‌লে মঞ্চপ্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। থিয়েটার হলটি খুব বড় নয়; তবে বিশেষ ছোটও নয়। থিয়েটারের পরিচালক মিঃ আব্রাশভ্, বয়স হ'য়েছে, তবে দেখতে খুব বুড়োও নয়। অপূর্ব্ব শিল্পী! পুতুল নাচের মধ্য দিয়ে এত হাস্যরস, এত বাস্তব অভিনয় এবং এত নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যায় জানতাম না। 'ষ্টেজ্-ক্র্যাফ্‌ট্'এর উচ্চ কারিগরি ট্রাডিসন এখানেও নজরে পড়ে। ষ্টেজটির ওপনিং হয়তো ৭।৮ ফিট হবে, উচ্চতা এবং গভীরতা হবে ফিট ৫।৬। পুতুলগুলি ফুটখানেক বা ২।৪ ইঞ্চি বেশী কম হবে কিন্তু ঐ পুতুলগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পারিপার্শ্বিক 'সেট', 'সেটিং' এবং জিনিষপত্রগুলি এত 'সুসমঞ্জস', তার ওপর আলোকসম্পাত এবং অভিনয়-চাতুর্য্য এত চমৎকার যে দেখতে দেখতে কিছুক্ষণ বাদে ভ্রম হয় যেন প্রমাণ মাপের অভিনেতাদের বাস্তব অভিনয় দেখছি, শুধু মানুষগুলো যেন কার্টুন জগতের বাসিন্দা। আমরা যে অনুষ্ঠানটি দেখতে গিয়েছিলাম সেটি হলিউডের সাম্প্রতিক কীর্ত্তিকলাপের ওপর একটি চমৎকার ব্যঙ্গ।

বোলশোই থিয়েটারের মতো এরও ওপর তলায় একটি যাদুঘর আছে। সেখানে দুনিয়ার সব দেশের 'পুতুলনাচের' পুতুল সংগ্রহ ক'রে রাখা আছে এবং তাদের সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধও সেখানে রাখা আছে। ঐ একটি যাদুঘর থেকে 'পুতুল নাচের' ওপর রিসার্চ ওয়ার্ক করা চলে বলে মনে হোলো। এখানে যেটা আমাদের খুব আকৃষ্ট ক'রেছিল সেটা হচ্ছে আমাদের দেশের মধ্যপ্রদেশের কোন গ্রামের পুতুলনাচের কতকগুলি পুতুল। রাবণ এবং হনুমানের মূর্ত্তি। মিঃ আব্রাশভ পুতুলনাচ-শিল্পের একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী। মঞ্চের ভিতরে নিয়ে গিয়ে



আজকে যাঁরা বিস্মৃত ঃ তাঁদের একজন
শ্রীমতী মাধুরী

বোম্বাইয়ে ছায়াচিত্রশিল্পের প্রথম যুগে ইনি ছিলেন
অন্যতমা চিত্তহারিণী যৌবনময়ী চিত্রনটী

বয়স হবে। একটি ঐতিহাসিক উপ



আজকে যাঁরা বিস্মৃত ঃ তাঁদেরই আর একজন
বেবী গার্ব্বো
দক্ষিণ ভারতের চলচ্চিত্রশিল্পের প্রথম লাস্যময়ী
সর্ব্বজনপ্রিয়া নায়িকা

আমাদের অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় এবং ষ্টেজক্রাফট্-এর টেকনিকাল দিকটি আমাদের সমস্ত দেখানো ও বুঝিয়ে দেওয়া হয়। মঞ্চ সম্বন্ধে মোটামুটি বক্তব্য এখানেই শেষ করা যেতে পারে।

সোভিয়েট চিত্রজগতের প্রথম বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে যে, এখানে ভুঁইফোড়দের কোনো স্থান নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ বিভাগগুলির মধ্যে 'সিনেমাটোগ্রাফী' বিভাগটি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিভাগ, আমরা 'ষ্টেজ ইনৃষ্টিটিউট অফ্ সিনেমাটোগ্রাফী' এবং 'ইনৃষ্টিটিউট অফ্ মোশান পিকৃচার্স এঞ্জিনিয়ার্স' দুটোই দেখে এসেছি। প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানে ক্যামেরাম্যানদের শিক্ষাকাল হলো পাঁচ বছরের এবং পরিচালক, শিল্পনির্দ্দেশক ও অভিনয় শিল্পীদের জন্য হলো ছ' বছর। দ্বিতীয়টিতে অপারেটার, চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি তৈরী ইত্যাদি এবং শব্দযন্ত্রীর কাজ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিভাগে ঐ রকম ৫ থেকে ৬ বছরের শিক্ষাকালের ব্যবস্থা রয়েছে। হাইস্কুল গ্রাজুয়েশানের পর ছেলেমেয়েরা এখানে ভর্ত্তি হয়। ভর্ত্তি হওয়ার জন্য দরখাস্ত পড়ে বহু কিন্তু সবাইকে তো নেওয়া সম্ভব নয়—কাজেই একটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হয় এবং তাতে যারা উত্তীর্ণ হয় তারাই এইসব প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে। ক্যামেরাম্যান বা অভিনয়শিল্পী হবার ইচ্ছা বায়োস্কোপ দেখার পর অনেকেরই হয়। কিন্তু ঐসব হতে হলে যেসব বিশেষ গুণ বা মনের গড়ন থাকা দরকার সেগুলি না থাকলে তো আর হবো বললেই হওয়া যায় না। কাজেই এই পরীক্ষার ফলে কর্ত্তৃপক্ষও জানতে পারেন কার ভেতর মোটামুটি কি আছে—এবং পরীক্ষার্থীও বুঝতে পারে তার গলদ কোথায়।

আমরা যখন ইনৃষ্টিটিউট অব্ সিনেমাটোগ্রাফীতে যাই তখন বিখ্যাত পরিচালক গেরাস্‌সিমভ্ অভিনয়ের ক্লাশ নিচ্ছিলেন। একটি ছোট্ট করুণ দৃশ্য অভিনয়ের তালিম দেওয়া হচ্ছিল। আমাদের সামনে সেটি অভিনয় করা হলো—আমরা অভিভূত হয়েছিলাম অভিনয় দেখে। শুনলাম তারা ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে।

তারপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় ইনৃষ্টিটিউটের ষ্টুডিওতে। সেখানে স্যুটিং হচ্ছিল। ক্যামেরাম্যান, চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, শিল্প-নির্দ্দেশক এবং কয়েকজন অভিনয়শিল্পী—প্রকৃতপক্ষে তাঁরা প্র্যাক্‌টিকাল্ পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো সকলের। পরিচালককে [illegible] ছাত্র বলে মনে হলো। [illegible] আনুমানিক—২০।২২ বছর বয়স হবে। একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের কোন বিশেষ

একটি অংশ এদের দেওয়া হয়েছে ছবিতে রূপান্তরিত করবার জন্ত। ছবি হয়ে গেলে সেটি বিভিন্ন বিভাগের অ্যাকাডেমিশিয়ানরা দেখবেন এবং তাঁদের বিচারের ওপর এদের পাশ-ফেল নির্ভর করবে। এদের এই কাজটি করতে যেসব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়—বলতে লজ্জা হলেও না বলে পারছি না যে আমরা আমাদের পেশাদারী জীবনে এত সুযোগ পাই না। 'ক্যামেরাম্যান'-ছাত্রকে দেখলাম ঝকঝকে-তকতকে নতুন ক্যামেরা নিয়ে কাজ করছে। আলোর সরঞ্জাম যা—তার অনেকগুলিই এখনও আমাদের দেশে আজও এসেছে কিনা সন্দেহ—যথা "আর্ক ল্যাম্প"। আমি তো এখনও চোখে দেখিনি। জানিনা ভারতের 'হলিউড' বোম্বাইতে কোন ভাগ্যবান দেখেছেন কিনা। 'ডাইরেক্টারে'র আহ্লাদের কথা বলি শুনুন। তিনি যদি মনে করেন যে, কোন একটি বিশিষ্ট চরিত্র তাঁর ইন্‌ষ্টিটিউটের কোন ছাত্র-অভিনেতার দ্বারা হবে না বা উক্ত চরিত্রটির চেহারার বিবরণের সঙ্গে ঠিক টাইপ মিলছেনা; তিনি মস্কোর রঙ্গজগৎ বা চিত্রজগতের যেকোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে দাবী করতে পারেন—তা তিনি যত বড় অভিনেতা বা অভিনেত্রীই হোন না কেন। অর্থাৎ তিনি অহীন্দ্র চৌধুরীই হোন বা নরেশ মিত্রই হোন, বা চন্দ্রাবতীই হোন! ইন্‌ষ্টিটিউট তার ব্যবস্থা করবেন। বিনা পারিশ্রমিকে নয়, উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়েই। আমাদের সামনেই দেখলাম মস্কো আর্ট থিয়েটারের একজন নামকরা অভিনেতা 'ছাত্র-পরিচালকে'র হুকুম তামিল করছেন—কোনপ্রকার ওস্তাদী না ক'রে। কারণ তিনি জানেন যে এখানে 'পরিচালকের' ওস্তাদিরই পরীক্ষা চলছে। বলা বাহুল্য ঐ ব্যাপার কোন ধনতান্ত্রিক দেশে সম্ভব হয়নি এখনও।

তারপর ছাত্রদের সম্পর্কে অন্তান্ত প্রশ্নের মধ্যে জিজ্ঞাসা করেছি—"আপনাদের হাই স্কুল অবধি তো সব ফ্রী—এখানেও কি ফ্রী?" উত্তর পাই—"না, এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তান্ত বিভাগের মতো আমরা বেতন দিই।"

প্রশ্ন করি—"কত?"

উত্তর—"বছরে প্রতি ছাত্র ৫০০ রুব্‌ল দিয়ে থাকে।"

প্রশ্ন—"আপনাদের এখানে কমসে কম লোকের মাইনে ৫০০ রুব্‌ল? যে বাপ-মা কম রোজগার করে, তাদের ২।৩ ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে চলে তো—মুস্কিল? নয় কি?"

উত্তর দিচ্ছিলেন ইনষ্টিটিউটের পরিচালিকা—একজন ৬০ বছর বয়স্কা মহিলা। ইনি একজন অতীতের বিখ্যাত অভিনেত্রী। একটু আশ্চর্য্য হয়ে বলেন—"আপনার প্রশ্ন আর একটু পরিষ্কার করে বলুন, ঠিক বোঝা গেল না।" সত্যই তো ভদ্রমহিলা বুঝবেন কি করে? আমি তো খেয়াল করিনি যে আমার প্রশ্নের কোন ভিত্তিই সে-দেশে নেই। আমি প্রশ্ন করেছি আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে। যাই হোক আমি পুনরুক্তি করার পর তিনি উত্তর দেন—"সে কি কথা? ছেলেমেয়ে পড়বে তার টাকা দেবে বাপ-মা—এটা কি রকম কথা?"

প্রশ্ন—"তবে?"

উত্তর—"ছাত্র-ছাত্রীরা বুদ্ধিমত্তানুসারে সরকারের কাছ থেকে পায় ৫০০ থেকে ৭০০ রুবল প্রতি মাসে।"

প্রশ্ন—"তাহলে আপনারা এটাকে ফ্রী বলেন না কেন—এতো 'ফ্রী'র চাইতে বেশী!"

উত্তর—"তা কি করে বলি বলুন? আমরা ছাত্রের কাছ থেকে টাকাও নিই, তার রসিদও দিই......।"

(মনে মনেই বললাম আপনারা ফ্রী বলুন আর না বলুন—ফ্রী বললে আমাদের বুঝতে সুবিধা হতো।)

প্রশ্ন করি—"একটি ছেলে মাসে ৫০০ রুবল্ পায় আর সে বছরে ৫০০ রুবল করে ইন্‌ষ্টিটিউটে দেয়—তো ঐ বাড়্‌তি রুবলগুলি কি হয় ?"

তিনি আবার সবিস্ময়ে চেয়ে থাকেন—আমায় আবার প্রশ্নটি পরিষ্কার করার জন্য দ্বিতীয়বার বল্‌তে হয়।

উত্তরে বলেন—"সে কি কথা ? একটা সোমত্ত ছেলে বা মেয়ে ছ' বছর ধ'রে পড়বে—রুটি রোজগার করার কোন সুযোগই পাবে না তো তার ভরণ-পোষণ জোগাবে কে —মানুষ হিসেবে তার কোন খরচ নেই ? সে যদি হোটেলে থাকে তো সে হোটেলের টাকা দেবে যদি তার পরিবারের সঙ্গে থাকে তো পরিবারে তার অংশ সে দেবে।"

বললাম—"ভাল!" আর ভাবলাম আমার দেশের ছাত্রদের কথা!

তারপর আমরা যাই মস্কো মণ্ট ফিল্ম ষ্টুডিওতে। সেখানে কার্টুন ছবি তোলা হয়। কার্টুন ছবি তোলার বিচিত্র এবং বিভিন্ন বিভাগগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখি। তাঁদের তোলা সাম্প্রতিক কার্টুনগুলির প্রদর্শন দেখি। আসার সময় আমাদের প্রত্যেককে এক কপি করে বই দেওয়া হয়। তাতে কার্টুন ছবি তোলার বিস্তৃত টেক্‌নিকাল বিবরণ দেওয়া আছে। বইটি রুশ ভাষায় লেখা এই যা মুস্কিল।

অতঃপর মোস-ফিল্ম ষ্টুডিও পরিদর্শন করি। বিরাট ষ্টুডিও—আমাদের দেশের ষ্টুডিওর তিনটি ফ্লোরের সমান তাঁদের একটি ফ্লোর। প্রত্যেক বিভাগেই মেয়ে-পুরুষ সমান-ভাবে কাজ করছেন দেখলাম। "আনফরগেটেবল্ ১৯১৯" ছবির স্যুটিং চলছিল। ছবির পরিচালক হলেন বিখ্যাত "ফল্ অব্ বার্লিন" ছবির পরিচালক মিঃ চেইন্‌ভেল্লি।

তিনি সেদিন উপস্থিত ছিলেন না—তাঁর প্রধান সহকারী মাদাম এ্যানড্রেপেরিটজা পরি-চালনা করছিলেন। এক বিরাট প্যারিসীয় কাফের সেট্—যেখানে বসে প্রতি-বিপ্লবীরা ষড়যন্ত্র করছিল রুশ-বিপ্লব ধ্বংস করার। চিত্রগ্রহণ করছিলেন মিঃ কশিনাট্‌র। ইনিই "ফল্ অব বার্লিনে"র চিত্রগ্রহণ করেছিলেন। এটিও হবে রঙীন ছবি। মসফিল্ম ষ্টুডিওতে আর সাদা-কালো ছবি তোলা হয় না— সবই রঙীন ছবি তোলা হয়। তারপর আমাদের একটি হল-ঘরে নিয়ে যাওয়া হোল—মনে হ'ল একটা আর্ট গ্যালারীতে এসে ঢুকলাম—চারটি দেওয়ালই অসংখ্য সুন্দর সুন্দর পেণ্টিং-এ ঢাকা। এখানে বিখ্যাত পরিচালক রমবের সঙ্গে আলাপ হোল। শুনলাম তিনি বাল্টিক সাগরের এক ঐতিহাসিক যুদ্ধের পটভূমিকাকে কেন্দ্র করে তারই চিত্ররূপ দেওয়ার তোড়জোড় করছেন—ঐ পেণ্টিংগুলি তাঁর চিত্রনাট্যের বিভিন্ন পরিকল্পনার স্থিরচিত্র। এই হোল তাঁর তোড়জোড়ের একটা অংশমাত্র।

মসফিল্ম ষ্টুডিওর মেক-আপ বিভাগে প্লাষ্টিকের সাহায্যে মেক-আপ করার ব্যবস্থা এক অভিনব ব্যাপার। আমরা রুশ ছবি দেখে প্রায়ই বলাবলি করেছি যে এমন অদ্ভুত চমৎকার টাইপ কিভাবে জোগাড় করে। টাইপ যে জোগাড় করে না এমন নয় কিন্তু মেক-আপ বিভাগের ভেল্কিই বেশীটা কাজ করে। ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রে মুখকে মুখ স্রেফ ছাঁচে ঢেলে অভিনেতাকে মুখোস পরিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। মুখোসের চোখের জায়গায় দুটি, নাক এবং মুখের জায়গায় ছিদ্র থাকে—মুখোস বেশ বেমালুমভাবে 'ফিট' করার পর অভিনেতার স্বাভাবিক চোখ দুটি অভিনয় করে এবং লিপ্-মুভমেণ্টেরও কোন অসুবিধা হয়। মুখোসটি এমন একরকম নরম তুলতুলে স্পঞ্জ রাবারের তৈরী যে অভিনেতার নিজের মুখের সূক্ষ্মতম মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণের সঙ্গে

মুখোসেরও 'ফেস-সারফেস'-এর ওপরে তার ক্রিয়া অতি স্বাভাবিকভাবে হ'তে থাকে—মুখোসও অভিনয় করে। অতুলনীয় টেকনিক্। এই জিনিষটি আবিষ্কার করেছেন 'মস ফিল্ম'-এর মেক্-আপ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা এবং তিনি একজন ষ্ট্যালিন্-প্রাইজ লরিয়েট্। "ফল্ অফ্ বার্লিন"-এর চার্চিলের ভূমিকায় অভিনয় তিনিই করেছেন—এইভাবেই করেছেন।

তারপর ল্যাবরেটারী এবং অন্যান্য টেক্নিকাল বিভাগ আমরা পরিদর্শন করি। এ সম্বন্ধে নীরস টেকনিক্যাল আলোচনা করে এ প্রবন্ধ বাড়াতে চাই না। লেনিনগ্রাড্-এ 'লেন্‌ফিল্ম ষ্টুডিও'-ও আমরা দেখেছি। এটিও প্রায় মস্‌ফিল্ম-এর মতই বড়। এখানে সাধারণ এবং রঙীন ছবি দুই-ই তোলা হয়। এরপর 'ইউক্রেন্ ষ্টুডিও' দেখেছি এবং জর্জ্জিয়াতে 'টিবলিসি ষ্টুডিও'-ও দেখেছি। 'টিবলিসি ষ্টুডিও'টি মস্‌ফিল্ম-এর মতই বড় ব'লে মনে হয়েছে। আমরা যে সময় 'টিবলিসি যাই সেইসময় সেখানে দেশ জুড়ে হারভেষ্ট্ ফেসটিভ্যাল হচ্ছিল। জর্জ্জিয়ার দূর-দুরান্তর গ্রামাঞ্চল থেকে যৌথ খামারের চাষীরা এসেছিল এক বিরাট জাতীয় কন্‌সার্ট-এ যোগদান করতে। সেইসব শিল্পীদের আমন্ত্রণ ক'রে উক্ত ষ্টুডিওতে একটি রঙীন দলিল-চিত্র তোলা হচ্ছিল দেখলাম। প্রসঙ্গতঃ বলি এঁদের এই জাতীয় কন্‌সার্ট দেখার জন্যে টিবলিসির অপেরা হাউস-এ আমরাও আমন্ত্রিত হ'য়েছিলাম। চমৎকার সঙ্গীত, অপূর্ব্ব নৃত্য। এখানে এসে আমরা অনুভব করেছিলাম যে স্বদেশের কাছাকাছি এসে পড়েছি। এদের সঙ্গীত, নৃত্য এবং বাদ্যযন্ত্রগুলির সঙ্গে আমাদের দেশের ঐ জিনিষগুলির বেশ মিল আছে। বাদ্যের মধ্যে ঢোলক এবং তবলার মত কতকগুলি যন্ত্র আছে। দোতারা জাতীয় তারের বাজনাও দেখলাম। আর নাচে, তালের সঙ্গে হাতের এবং পায়ের কাজ। পুরুষ এবং মেয়ে একসঙ্গে নাচে বটে কিন্তু কেউ কারো অঙ্গ স্পর্শ করে না। দুজনের মধ্যে যেন তালের প্রতিযোগিতা হয়।



মস্কোর 'সেন্ট্রাল ষ্টুডিও ফর্ ডকুমেন্টারী ফিল্মস্' এক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। এঁরা কেবল দলিল-চিত্র এবং শিক্ষামূলক ছবি তুলে থাকেন। এঁদের দলিল-চিত্র তোলার জন্যও একজন পরিচালক আছেন। তিনি একদল ক্যামেরাম্যান নিয়ে ঘটনাস্থলে যান এবং ক্যামেরাম্যানদের দিয়ে এবং প্রয়োজন বা সম্ভব হলে (যখন কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের ছবি তোলা হয়) অনুষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষের সহকারিতায় প্রোগ্রামের কোন কোন অংশ অল্পবিস্তর নিজের পরিচালনার আয়ত্তাধীনে এনে চিত্রটি যাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় তার চেষ্টা করে থাকেন। এই রকম বহু পরিচালকের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ আমাদের হয়—তার মধ্যে একজন ছিলেন স্ত্রীলোক,—যিনি বিখ্যাত "ইউথ্ ফেষ্টিভ্যাল"এর ছবিগুলি পরিচালনা করেছিলেন। আর একজনের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হই—তাঁর নাম মিঃ ভার্লামোভ। ইনি চীনের মুক্তি সংগ্রামের রঙীন দলিল-চিত্র তুলে "ষ্টালিন প্রাইজ" পেয়েছেন। এঁরই পরিচালনায় তোলা "দি গ্রেট চাইনীজ সার্কাস" মাদ্রাজে দেখানো হয়েছে। সম্প্রতি ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালের সময় তিনি রুশ-চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদলের একজন হয়ে এখানে এসেছিলেন এবং এঁদের সঙ্গে যে তিনজন চিত্রগ্রহণ করবার জন্য এসেছিলেন তাঁদের নাম মিঃ আইভ্যান্ শোলকোনিকভ, মিঃ এ্যান্দ্রে-শোলোগুবভ এবং শ্রীমতী গালিনা মনগ্লোভস্কায়া, মিঃ ভার্লামোভ এখানে তাঁদের ভারত-ভ্রমণের দলিল-চিত্র তুলেছেন। মাদ্রাজে থাকার সময় এঁদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছিল।

সেণ্ট্রাল ডকুমেণ্টারী ষ্টুডিওতে তাঁদের তোলা বহু

ছবি দেখি—সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা একটি প্রবন্ধে সম্ভব নয়।

সোভিয়েট চলচ্চিত্রশিল্প, শিল্পী এবং চিত্রগ্রহণ-পদ্ধতি আমরা একেবারে সামনে থেকেই দেখবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করেছি। স্পষ্টই বুঝেছি সোভিয়েট চলচ্চিত্রের মূলমন্ত্র নির্দোষ আনন্দ পরিবেশনের সঙ্গে জাতি গঠন এবং সমাজের সেবা করা। সোভিয়েট নেতা মার্শাল ষ্টালিন তাঁর এক উক্তিতে বলেছিলেন—Cinematographers are engineers of human mind—সে দেশের শিল্পীরা তাঁদের প্রিয় নেতার উক্তির গুরু-দায়িত্ব বেশ যোগ্যতার সঙ্গেই বহন করছেন। তাই আজ দেখতে পাই সোভিয়েট চলচ্চিত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য নির্দোষ আনন্দ পরিবেশনের সঙ্গে জনসাধারণকে সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যে সচেতন করা এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা। তা সে যে ছবিই হোক—কি দলিল-চিত্র, কি পূর্ণাঙ্গ সাধারণ ছবি, কি কৌতুকচিত্র বা সঙ্গীত ও নৃত্যপ্রধান ছবি—সবেরই লক্ষ্য এক, মূল সুর একই। তাই দেখি তাঁদের ছবিতে গুণ্ডামির স্থান নেই—অস্বাস্থ্যকর কামনা-উদ্রেককারী মদ ও মেয়েমানুষের অর্থহীন হৈ-হুল্লোড়ের দৃশ্য নেই—মানুষকে খুন করার কারিগরীর দৃশ্য নেই। জাতির প্রতি জাতির বিদ্বেষ সৃষ্টি করার অপকৌশল নেই। ছবি দিয়ে যুদ্ধের অনিবার্য্যতাকে প্রমাণ করার কোন অপচেষ্টা নেই। এঁদের ছবিতে নতুন করে "Crime does not pay" মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না—কারণ ক্রাইম করার মনোবৃত্তিই যাতে না হয়—ছবির মূলতত্ত্ব দিয়ে তারই গোড়া বেঁধে দিয়ে থাকেন। এঁদের ছবিতে দেখি মানুষের প্রতি মানুষের কত দরদ, কি ভালবাসা। তাঁরা ছবি দিয়ে এই প্রচারই করেন যে এইটাই স্বাভাবিক, এর বিপরীতটাই প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাঁরা ছবির মধ্য দিয়ে দুনিয়ার সমস্ত জাতির সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। ধর্ম্ম বা বর্ণ তাতে বাধ সাধে না। তাঁদের ছবির মধ্যে দেখতে পাই যুদ্ধের প্রতি কি অসীম ঘৃণা। ছবির মাধ্যমে আজ তাঁরা শান্তির প্রতি অটল আসক্তি দেখিয়েই শেষ করেন না—বিশ্বশান্তি রক্ষা করার দৃঢ়

সঙ্কল্প ঘোষণা করে থাকেন। আর দেখেছি সে দেশে শিল্পী কারো কেনা গোলাম নয়। সম্পূর্ণ স্বাধীন। শিল্পী কারো হুকুম তা[illegible] করে না। কারণ প্রযোজক সেখানে কোনো[illegible]শেষ ধনী বা ধানিক-গোষ্ঠী নয়। রাষ্ট্রই হোল প্রযোজক—যে রাষ্ট্রের কোটি কোটি মালিকের মধ্যে শিল্পী নিজেও একজন। তাই সৃষ্টিশীল শিল্পী, সে দেশে তার সামর্থ্যের সবটুকু জনকল্যাণে নিবেদন করার আনন্দ [illegible]। আর আমাদের দেশে একখানি [illegible]মূলক ছবি করার বাসনা থাকলেও [illegible] কারণ প্রযোজক ধনী ব্যক্তিবিশেষ

—যে মানুষের হীন প্রবৃত্তি ভাঙিয়ে সুদে-আসলে মূলধন ফেরৎ চায় বক্স-অফিস থেকে। তাইতো 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'মাইকেল মধুসূদন', 'স্বামিজী', বা 'বিদ্যাসাগর'-এর মত ছবি এক একটি আকস্মিক ঘটনা। ভারতের 'হলিউড' বোম্বাই-এর কাছে হয়তো দুর্ঘটনা—মানুষের সুরুচি জাগ্রত করার ষড়যন্ত্র।

আমাদের অনেকে সন্দিগ্ধচিত্তে প্রশ্ন করেন—"সোভিয়েট চলচ্চিত্রশিল্পীর কি সত্যই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে? রাষ্ট্রের কোন অনুশাসন নেই তার ওপর?"

রাষ্ট্রের অনুশাসন নিশ্চয়ই আছে—রাষ্ট্র তাকে সব করতে দেবে, কিন্তু লক্ষ্যহীন, অর্থহীন, বক্তব্যহীন ছবি করার বদখেয়াল রাষ্ট্র কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। "Art for art's sake" এই সৌখীন বুলি ওদেশ থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। সোভিয়েট জগতে চালু কথা হচ্ছে,

Art for the sake of people,

Art for the sake of society.

স্বনামধন্য অভিনেতা, অভিনেত্রী বা যে কোন খ্যাতনামা চলচ্চিত্রশিল্পীর উপাধি "Honoured Artist of the people"। তাঁদের কাহিনী এবং তার চলচ্চিত্র-রূপ অত্যন্ত বাস্তবধর্মী। তাঁদের 'কালেকটিভ্ ফার্ম'গুলি স্বচক্ষে দেখে না এলে "কুবান কশাক" এবং "কাভালিয়র অব দি গোল্ডেন ষ্টার" তাঁদের বাস্তবের যে কি হুবহু প্রতিচ্ছবি—এতখানি মনে-প্রাণে উপলব্ধি করতে পারতাম না।

চলচ্চিত্রশিল্পে ব্যবহার্য্য যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য

আনুষঙ্গিক আজকাল তাঁরা সমস্ত নিজেদের দেশে প্রস্তুত করেন—একটি স্ক্রু-ও তাঁরা বিদেশ থেকে আমদানী করেন না। যন্ত্রপাতি দেখে মনে হয়েছে মার্কিন বা বিলিতী যন্ত্রপাতিরই মত। এদিক দিয়ে বিশেষ নূতনত্ব কিছু দেখিনি। তবে চলচ্চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক আবিষ্কার তাঁরা যেটা করেছেন, সেটা "ষ্টিরিও-কিনো"। সোভিয়েট দেশে যাবার কয়েক মাস আগে এই পত্রিকাতেই "ষ্টিরিও-স্কোপ" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম এবং তাতে রুশ-থ্রী-ডাইমেনশনাল ছবির কথা উল্লেখ করেছিলাম—তখন জানতাম না এই অদ্ভুত আবিষ্কার স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হবে। সত্যই অদ্ভুত! এছাড়া দেখতে কোন বিশেষ চশমার প্রয়োজন হয় না। তবে জিনিসটি যে নিখুঁত হয়েছে এমন কথা বলবো না। যেটুকু খুঁত আছে সেটুকু মার্জ্জনীয়। অর্থাৎ ছবি আরম্ভ হবার আগেই একটি ঘোষণা করা হয় তাতে দর্শকদের সতর্ক করে দেওয়া হয় যে—'থ্রী-ডাইমেনশনাল এফেক্ট' পেলেই তাঁরা মাথা যেন ডানদিকে বা বাঁদিকে না হেলান। মাথা নড়ালেই থ্রী-ডাইমেনশনাল এফেক্ট হারিয়ে যায়—ঠিক জায়গায় মাথা ফিরিয়ে আনলে আবার পাওয়া যায়। অবশ্য এ অসুবিধা আছে—কিন্তু এই অসুবিধাটুকু মেনে নিয়ে যে জিনিস দেখা যায়, তার তুলনা হয় না। বাস্তবের প্রতিচ্ছবি। রং আছে গড়ন আছে, শব্দ আছে এবং তার সঙ্গে গতি রয়েছে। এই অসুবিধাটুকুরও বিহিত করার চেষ্টাও তাঁরা করছেন। এর উদ্ভাবক মিঃ আইভ্যানভ্ তাঁর ল্যাবরেটরীতে তিনি আমায় দেখিয়েছেন আরও উন্নততর এক্সপেরিমেণ্ট। এই বিশেষ ব্যাপারে সোভিয়েট চলচ্চিত্রশিল্প অন্যান্য দেশকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে।

আমাদের দেশে ফিরে আসবার দিনকয়েক আগেই ১৯৫১ সালের ৭ই নভেম্বর রুশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের চতুস্ত্রিংশ বার্ষিকী উৎসব হলো। এই উৎসব স্বচক্ষে দেখবার এবং যোগদান করবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। দিনটা ছিল বেশ ঠাণ্ডা—বাইরে যথেষ্ট তুষারপাত হচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই 'রেড স্কোয়্যার'-এ দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে সেই বিরাট শোভাযাত্রা আমরা দেখলাম। আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক কুচকাওয়াজও হলো দেখলাম কিন্তু সেখানে যখন শান্তি-শোভাযাত্রার দল বেরোলো সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য—আমরা মুগ্ধ হলাম—সামরিক কুচকাওয়াজও তার কাছে যেন ম্লান হয়ে গেল।

১০ই নভেম্বর অতি প্রত্যূষে আমরা সোভিয়েট দুনিয়া ছেড়ে চলে আসি। আর এ কথাটাও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই তখন দেশের জন্য আমাদের বেশ মন কেমনও করছিল। মায়ের কোলে শিশু ফিরে গিয়ে যে-আনন্দ অনুভব ক'রে ঠিক সেইরকম একটা চাপা আনন্দ আমরাও অনুভব করলাম। মন কিন্তু ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে, মনে হচ্ছিল যেন কত আপনজনদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তারা যেন কতো ভালবেসে আমাদের কাছে টেনে রেখেছিল। চারিদিকেই ঘোলাটে অন্ধকার—বিমান ঘাঁটির জমির ওপর যতটা দেখা যায় তার সর্ব্বত্রই বরফে ঢাকা। আমাদের সকলের টুপির কানায় আর ওভার-কোটের কাঁধে বেশ খানিকটা ক'রে তুষার জমে রয়েছে। সেই বিমানঘাঁটির খোলা প্রাঙ্গণে আর্ক-ল্যাম্পের আলো জেলে সমস্ত স্থানটি আলোকিত করা হয়েছিল। বিমানে ওঠবার ঠিক আগেই বিদায়-সম্ভাষণের পালা সুরু হলো। বিদায়-অভিভাষণ পাঠ করলেন সোভিয়েট সিনেমাটোগ্রাফীর ডেপুটী মন্ত্রী কমরেড সেমিয়োনোভ্। অভিভাষণ-বাণীর উত্তরে দাদা (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য) বললেন—'আমাদের দেশে যে বিদায় দেয় সে বলে "এসো", যে বিদায় নেয় সে বলে "আসি"—আপনারাও বলেন 'Das-Viidania' যার সারার্থ "এসো"—তাই আমরাও বলে যাচ্ছি—প্রিয় বন্ধুগণ, আজ "আসি"।'

বাংলা থিয়েটার উঠে যাচ্ছে কেন ?

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ভায়া, আমাকে রীতিমত বিপদে ফেলেছ, প্রশ্ন ক'রে, বাংলা থিয়েটার উঠে যাচ্ছে কেন ?

বাংলা থিয়েটার সম্বন্ধে যাঁরা বলবার অধিকারী, তাঁদের যখন এই প্রশ্ন সোজাসুজি করা হয়, তখন দেখেছি তাঁরা তিন রকম উত্তর দিয়ে থাকেন।

প্রথম রকম, একটু মৃদু হেসে অন্য কথার উত্থাপন করেন, অর্থাৎ উত্তর দেন না, নীরব থেকে এড়িয়ে যান।

দ্বিতীয় রকম, উপস্থিত শ্রোতাদের দিকে চেয়ে আগে ভাল করে দেখে নেন, থিয়েটার-সম্পর্কিত কোন্ শ্রেণী বা স্বার্থের লোক সামনে আছেন, তারপর যে-শ্রেণী বা যে-শ্রেণীরা অনুপস্থিত, মোটামুটি তাঁদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে, সর্বশেষে সিদ্ধান্ত স্বরূপ বাংলাদেশের 'জেনারেল' অবনতি-কেই বড় করে দায়ী করেন।

তৃতীয় রকম, এই প্রশ্ন ওঠবার সম্ভাবনা দেখলে, স্থান ত্যাগ করেন।

এই তিন রকম উত্তরদাতাই কম-বেশী বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ লোক। এবং তাঁদের তিন ধরণের উত্তর থেকেই একটা কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেটা হলো, এ প্রশ্নের সত্যি-কারের উত্তর দেওয়া অত্যন্ত বিপদজনক, হয়ত অসুবিধা-জনকও, অতএব, কার গুড়ে মাছি পড়েছে, তাই নিয়ে আমাদের আলোচনা করে কি দরকার দাদা! অতএব চেপে যাও, নীরব হয়ে থাক!

আমি আজ ভায়া, আহম্মুকের মত ঠিক করেছি, এ প্রশ্নের উত্তর দেবো।

যদি এক কথায় আমাকে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তাহলে আমি কাদের সবচেয়ে বেশী করে দায়ী করবো, জান? যাঁরা এই প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে নীরব হয়ে থাকেন বা আছেন, তাঁরাই হলেন আজ সবচেয়ে বেশী অপরাধী।

প্রত্যেক জাতির জীবনে, প্রত্যেক সমাজের জীবনে, এমন একটা সময় আসে, যখন [illegible] অমর ভাষায় বলতে হয়, Silence is action. সেই জাতীয় সঙ্কট লগ্নে বুদ্ধিমানের মতন চুপ করে থেকে, যাঁরা মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, ভাল-মন্দ কোনটাতেই তাঁরা নেই, সেই প্রচণ্ড আত্ম-প্রতারকেরা জানেন না যে, তাঁদের নীরবতার দ্বারা তাঁরা একান্ত সক্রিয়ভাবে মন্দকেই সাহায্য করছেন ; যে-চাকা অন্ধকার গর্তের দিকে ছুটে চলেছে, তাঁদের নীরবতার শক্তি দিয়ে তাঁরা সেই অন্ধকার-মুখী চাকার গতিকেই আরো দ্রুত করে চলেছেন। তাঁদের নিজের চামড়া হয়ত আপাততঃ তাতে বাঁচতে পারে, তার জন্যে তাঁরা বুদ্ধিমান বলে আত্মপ্রসাদও লাভ করতে পারেন কিন্তু তাঁদের সেইসঙ্গে জেনে রাখা দরকার, তাঁরা হলেন জগতের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর 'coward'…বুদ্ধিমান coward!

বাংলাদেশে আজ বাংলার রঙ্গালয়ের যে সমস্যা, সেটা থিয়েটার মালিকের সমস্যা নয়, সেটা অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমস্যা নয়, সেটা নাট্যকার বা প্রযোজকদের বা দর্শকের সমস্যা নয়, এ সমস্যা হোল বাংলার জাতীয় সমস্যা, বাংলার অন্যতম সবচেয়ে বড় জাতীয় সমস্যা, যার সঙ্গে বাঙালীর জাতিগত মর্য্যাদা ও বাঙালীর অস্তিত্বের সমস্যা একান্ত নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। অন্নহীন দুর্ভিক্ষের সমস্যা কাঁটার মতন আমাদের চোখে এসে আপনা থেকে বেঁধে বলে, সেই সমস্যা নিয়ে আমরা সকলে চীৎকার করি, কিন্তু দুর্ভিক্ষের নিদারুণ ছায়া সাধারণ মানুষের মন ও মস্তিষ্কের ওপর সরাসরি প্রতিফলিত হয় না বলে, তাকে অবাস্তব মনে করে আমরা সরিয়ে রাখি ; তার জন্যে চীৎকার করাকে, তার জন্যে জনমনকে জাগিয়ে তুলতে আমরা লজ্জা পাই, সঙ্কোচ বোধ করি, মনে করি সেটা একটা intellectual fashion, অবসর সময়ে খবরের কাগজে এক-আধটা প্রবন্ধ লিখলেই যথেষ্ট। অর্থনৈতিক দারিদ্র্য বা দুরবস্থা যে-কোন জাতির পক্ষে একান্ত মারাত্মক কিন্তু তার আসল মার যে কতখানি গভীর আর কোথায়, তা দুর্ভিক্ষে মৃতদের সংখ্যার তালিকার দিকে চেয়ে বোঝা যায় না। দারিদ্র্যের সবচেয়ে বড় মার হলো, সে এমনভাবে মানুষের সমস্ত দৃষ্টিকে পেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ

করে আনে যে, তার আড়ালে সে নিঃশব্দে একটা জাতির চরিত্র ও চেতনাকে চিরকালের মত অথম করে দিতে পারে এবং এমনভাবে সেই মারণ-ক্রিয়া চলে যে মুমূর্ষু ব্যক্তি তা স্বীকার করতে পর্য্যন্ত লজ্জিত হয়। তাই মানুষ অন্নের দুর্ভিক্ষের জন্যে যেভাবে হাহাকার করে, মনের বা মস্তিষ্কের বা চিন্তার দুর্ভিক্ষের জন্যে সেভাবে আত্মজাহির করতে সে কুণ্ঠা বোধ করে। মনের দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্রে তার প্রতিবাদ প্রাণহীন, ক্ষীণ, সৌখীন কথার বিলাসিতায় পরিণত হয়, তার মধ্যে থাকে না বেঁচে-থাকবার প্রচণ্ড তাগিদ, প্রয়োজনের দাবীর বলিষ্ঠতা, সত্যিকারের প্রাণের উত্তাপ ও উৎসাহ। আজ বাঙালীর জাতীয় জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক কথা হলো, এই দুশো বছর ধরে অন্নহীনতার মধ্যে থেকে থেকে, সে দারিদ্র্যের কাছে আত্মবিক্রয় করেছে, তার জাতীয় চরিত্রকে বাঁচিয়ে রাখবার কিছুমাত্র চেষ্টা পর্য্যন্ত তার নেই,—তাই যখনই কোন অর্থনৈতিক ধাক্কা আসে, আমাদের দেশে দরিদ্র ব্যক্তি অনায়াসে হয়ে যায় ভিক্ষুক। ভিক্ষুকের দেহ কোনরকমে ভিক্ষার অন্নে, সরকারী বা সামাজিক মুষ্টি-ভিক্ষায় বেঁচে থাকবে, কিন্তু ভিক্ষুকের জাতিকে স্বয়ং ভগবানও বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন না। আজ বাংলাদেশে বাহ্যিক আর্থিক দুর্গতির আড়ালে চলেছে বাঙালীর মানস-জীবন বা জাতীয় চরিত্রের নিঃশব্দ মৃত্যু। সে-মৃত্যুকে রোধ করবার, সে-মৃত্যু সম্বন্ধে জাতিকে সচেতন করবার কোন চেষ্টাই কোথাও নেই। যদি থাকতো, তাহলে, আমাদের স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের, স্বাধীন বাংলার নাগরিকদের চেতনা বাংলার রঙ্গালয়ের এই মুমূর্ষু দশার শেষ আক্ষেপ-দুঃখের মর্মান্তিক ট্রাজেডী দেখে, কখনই এমন উদাসীন হয়ে থাকতে পারতো না। মুখে আমরা বড় বড় কথা বলি, কিন্তু আজও মনে মনে বিশ্বাস করি, থিয়েটারটা শুধু থিয়েটারই···সমাজের বাইরের একটা অবসর বিনোদনের জিনিষ···শিক্ষিত নাগরিক কিম্বা আমাদের প্রধান শ্রেণীর সংবাদ-পত্রের কিম্বা আমাদের

রাষ্ট্র এ নিয়ে মাথা ঘামাবে, এমন জিনিষ থিয়েটার নয়।

বাংলা দেশের কালচারের ইতিহাসে, বাংলার রঙ্গালয় আজ দেড়শো বছর ধরে যে বিরাট দায়িত্ব পালন করে এসেছে, যতই তার মধ্যে ত্রুটি থাক্, একান্ত দুঃখের বিষয় তার ঐতিহাসিক মূল্য, আমরা আজও উপলব্ধি করি নি। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক সত্ত্বা যে গুটীকতক বিষয়কে কেন্দ্র করে বিশ্ববরেণ্য হয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান বিষয় হলো, নাট্য। গ্রীসের প্রাচীন সভ্যতা যেমন তার রঙ্গ-মঞ্চকে কেন্দ্র করে আবর্ত্তিত হয়েছিল, ভারতের প্রাচীন সভ্যতাও তেমনি তার নাট্য-মঞ্চকে কেন্দ্র করে আবর্ত্তিত হয়েছিল। তাই প্রাচীন হিন্দু যে-দেবতাকে দেবতার দেবতা বলে জানতো, যিনি ছিলেন মহা-দেব, তাঁকে তাঁরা উপাধি দিয়েছিলেন নট-রাজ। দীর্ঘ জীবনের ভাঙ্গনের ফলে সেই ভারত-ঐতিহ্য যখন সপ্ত-স্তর মাটীর তলায় চলে গিয়েছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ যখন রাজনৈতিক ভাঙ্গনের বন্যায় সমস্ত ভারতীয় ঐতিহ্যকে হারিয়ে ফেলেছিল, ভারতবর্ষের মানস-জীবনে যখন রাত্রির ঘন অন্ধকার নেমে এসেছিল, সেই সময় আর্য্যঋষিকৃত আর্য্য-সভ্যতার উত্তরাধিকারী এই বাঙালীই সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একা ভারত-চেতনার প্রদীপকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। ভরতের দেশ এই ভারতবর্ষে, ভরত-মুনির দানকে, গত দেড়শো বছর ধরে, বাঁচিয়ে রেখেছিল একমাত্র বাঙালীই। গত দেড়শো বছর ধরে বাংলার রঙ্গালয় ভারতবর্ষের কালচারের ইতিহাসে একটা বিরাট আলোকস্তম্ভের মত জ্বলে ছিল। এই ঘটনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আমরা বাঙালী কি সচেতন? একটা জাতির দেড়শো বছরের প্রতিভার অনন্যসাধারণ প্রকাশ এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিল, আজ বাঙালী নিজে পান চিবোতে চিবোতে তাকে মাড়িয়ে চলেছে। রাস্তার ধারে একটা ভিখিরী মেয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে থাকলে, যতটুকু উদাসীন কৃপা-দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বাংলার মুমূর্ষু রঙ্গালয় আজকের বাঙ্গালীর চলমান রাজনৈতিক জনতার কাছে তার চেয়ে একবিন্দু কৃপা-দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি।

তাই ভায়া, তোমার কাছে আবেদন করেছিলাম, তোমরা যখন এই শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে আসরে নেমেছ, তখন সত্যিকারের crusader-দের মতন, বাংলার মুমূর্ষু মানসিক জীবনের প্রতি বাঙালীর চেতনাকে জাগিয়ে তোল। বাংলাদেশ থেকে যদি রস চলে যায়, বাঙালীর হৃদয়-মন-মস্তিষ্ক থেকে চলে যায় তার সৃজন-উল্লাস, যদি শুকিয়ে যায় বাঙালীর ঐতিহাসিক শিল্প-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, তাহলে ক্ষতি যে শুধু বাংলার হবে, তা নয়, ক্ষতি হবে ভারতবর্ষের।

আজ বাঙালীর জীবনের প্রত্যেক স্তরে এসেছে ভাঙ্গন। বাঙালীর ঐতিহাসিক সত্ত্বায় আজ পড়েছে আঘাত। তাই আজ মুখ শোঁকাশুকি, পিঠ-চাপড়ানো, ভদ্রবেশী জ্যাকামি আর আপাতমধুর অর্দ্ধ-সত্যের কোন স্থান নেই। আজ নির্লজ্জ বলিষ্ঠতায় বাঙালীকে সত্যের পাবক শিখার আলোয় নিজের ভিতরকে নিজেই করতে হবে বিশ্লেষণ। এই বৈপ্লবিক নীতিতেই বাঙালীকে আজ বিচার করতে হবে,

কেন বাংলার রঙ্গালয় এইভাবে সুনিশ্চিত মরণের দিকে এগিয়ে চলেছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারেন, থিয়েটারের সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত তাঁরা, যদি তাঁরা এই বিরাট সমস্যার ঐতিহাসিক দায়িত্ব উপলব্ধি ক'রে, সত্যের আলোকে নির্মমভাবে আত্ম-সমালোচনা করেন।

বাংলা থিয়েটারের বর্ত্তমান মুমূর্ষু অবস্থার জন্যে সাধারণতঃ তিনশ্রেণীর কারণকে দায়ী করা হয়,

(১) অর্থনৈতিক, দেশ-গত, কাল-গত ও ব্যবস্থা-গত

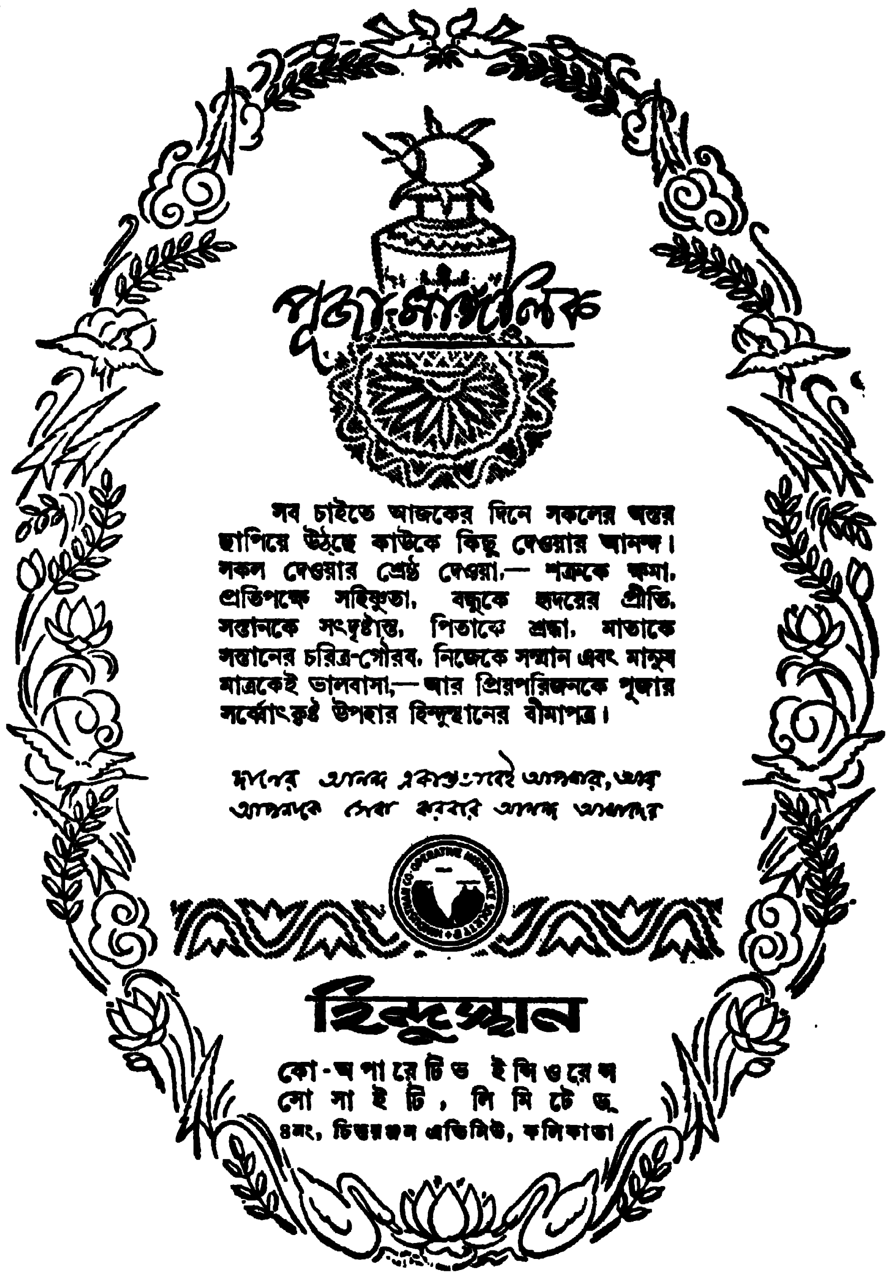
(২) দর্শকদের প্রতিক্রিয়া-গত

(৩) নাট্য-রচনা ও অভিনয়-গত

এই তিন শ্রেণীর কারণ ও তার প্রভাব তো আছেই, কিন্তু তাছাড়া, আর একটা সবিশেষ কারণ আছে, যে-সম্বন্ধে সকলেই ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত নীরবতা পোষণ করেন। সেই সবিশেষ কারণটা, থিয়েটার-পরিচালক ও থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহার, আচরণ, অভ্যাস ও রীতি-নীতি সম্পর্কিত। অর্থনৈতিক কারণ এবং যুগ-গত বিভিন্ন সমস্যার দরুন বাংলার রঙ্গমঞ্চের দেহ যদি শীর্ণ হয়ে এসে থাকে, বাংলার রঙ্গমঞ্চের প্রাণ সেই শীর্ণ দেহের আড়ালে বহুদিন হলো মরে গিয়েছে, এবং এই প্রাণের অপঘাত মৃত্যুর জন্যে একমাত্র দায়ী বাংলা-রঙ্গালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা সংযুক্ত, তাঁরা, থিয়েটারের পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা ও অভিনেত্রী। একটা বৃহৎ মহীরুহ যখন ভেতর থেকে মরে যায়, তখন তার মৃত্যুর পর বহুদিন পর্য্যন্ত বাইরে শীর্ণপত্র আর শুষ্কপ্রায় শাখা-প্রশাখা বেঁচে-থাকার মরীচিকা সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে থাকে। বাংলার রঙ্গালয় আজ ঠিক তেমনিভাবেই মৃত্যুকে গোপন করে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র।

একেবারে ধরাশায়ী নিশ্চিহ্ন হবার আগে, আমি বর্ত্তমান বাংলা রঙ্গমঞ্চের অধিনায়কদের কাছে একটা কাতর

(শেষাংশ ১৩৪ পৃষ্ঠায়)



সুরঝংকৃত গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্মকাহিনী

★

শ্রুতিধর

একখানি আট-দশ বা বারো ইঞ্চি রেকর্ড···রং তার কুচকুচে কালো তবু তাকে লোকে এত ভালবাসে কেন? তার বুকে সূক্ষ্ম রেখার অন্তরালে যে সুধার নির্ঝর লুকিয়ে আছে—যার আবেদন 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া' মন-প্রাণ সঞ্জীবিত ক'রে তোলে, শুধু তারই জন্য। কিন্তু এই যে তিন থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাধারণ অসাধারণ সকলের চিত্তজয়ী এই আবেদন, এর পেছনে যে বিরাট রহস্য, যে শত শত কর্মীর প্রাণ-ঢালা ঐকান্তিক পরিশ্রম নিহিত আছে—ক'জন তা জানেন, ক'জন তা ভাবতে পারেন?

আজ যে রেকর্ডখানি নতুন ব'লে আপনার হাতে এলো তার জন্যে তিন চার বা ততোধিক মাস বহু চিন্তাশীল, সুধী ও কর্মী অন্তরের একাগ্রতা দিয়ে যেভাবে পরিশ্রম ক'রেছেন তারই লেখাচিত্র পাপনাদের সামনে ধরবার চেষ্টা ক'রবো। কবি গান বাঁধেন, ছড়া কিম্বা নাটক রচনা করেন—বর্তমান বা আগামী কালের প্রয়োজনের সঙ্গে মিল রেখে, অথবা অতীত কালের স্মরণীয়কে সরণী ক'রে, তারপর সেই রচনা উপস্থাপিত করেন প্রয়োগ-প্রতিনিধির কাছে···তিনি আবার উপ-প্রতিনিধি ও শিল্পী বা পরিচালকের সঙ্গে ঐ রচনার মান নির্ণয় ক'রে মনোনীত রচনাটি পরিচালককে প্রদান ক'রে সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীও নির্দ্ধারণ ক'রে দেন। এবার একখানি গানের বিষয় ধরা যাক্। এর পর সুরশিল্পী কবির সাহচর্যে ঐ গানের ভাষায় দিলেন সুরের রং, যন্ত্রীদল সেই সুরকে আয়ত্ত ক'রে নিলেন—নির্দ্দিষ্ট শিল্পী এলেন কবি ও সুর-শিল্পীর ভাষা ও ভাবকে আত্মস্থ ক'রতে—সুরু হ'য়ে গেল তারই সাধনা।

শিল্পী বাছাই করা—এক বিরাট্ কর্তব্য। অনেকে মনে করেন "আমি এত ভাল [illegible] সুযোগ দেওয়া হয় না বলেই দেশের মনে আসন গ'ড়ে তুলতে পারছি না"। কিন্তু এইখানেই তাঁরা মারাত্মক ভুল করেন—শব্দগ্রহণ যন্ত্র (মাইক) এমনি এক অদ্ভুত জিনিষ যে সকলের স্বর তার উপযোগী নয়। অনেক বিশিষ্ট গুণী বা জ্ঞানী আছেন যাঁদের সংগীতকে ডিস্কে ধ'রে দেখা গিয়েছে তা শ্রুতিকটু ও অশ্রাব্য। এ ক্ষেত্রে তিনি যত বড় গুণীই হোন্ তাঁর রেকর্ড বাজারে প্রচার করা কোন রকমেই সম্ভব হ'তে পারে না। শুধু তাই নয় এমন অনেক খামখেয়ালী শিল্পী আছেন যাঁরা সময়ের মূল্য দিতে চান না—অথচ এই সময়টুকুকে না মানলে রেকর্ডিং সম্পর্কিত কোন কাজই চল্‌তে পারে না। কাজেই শিল্পী বাছাই করার আগে প্রয়োগ-প্রতিনিধি এই দু'বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন এ কথা নবাগত শিল্পীদের স্মরণ রাখা কর্তব্য। আর কণ্ঠ যদি স্বরগ্রহণ যন্ত্রের উপযোগী না হয় তবে অযথা কাহাকে দোষারোপ না ক'রে স্বর-মাধুর্যের চর্চায় মন দেওয়া উচিত। এইখানে আর একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে নবাগতদের অবহিত হ'তে হবে—স্পষ্ট ও দোষ—বর্জিত উচ্চারণ হওয়া চাই-ই। এই শিল্পী বাছাই করার ব্যাপারে কোন কোন ক্ষেত্রে যে অনিচ্ছাকৃত ভুল হয় না, এ কথা বললে সত্যের অপলাপ করা করে।

সুর যখন আত্মগত হ'য়ে গেল, সমস্ত গানটি যখন সময়ের পরিমাপে পূর্ণতর হ'ল, তখন প্রয়োগ-প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে উপ-প্রতিনিধি, সুরশিল্পী বিক্রয়িক-প্রধান ও প্রচার বিভাগীয় প্রতিনিধিগণ একত্রে গানখানি শুনে নিজ নিজ মত জানাবার পর উপযুক্ত বিবেচনায় প্রয়োগ প্রতিনিধি রেকর্ডিং-এর তারিখ ও সময় নির্দেশ করেন।

শিল্পীর বিশ্রামের ঘর প্রভৃতি বাদ দিয়ে শব্দগ্রহণের জন্য দরকার হয় পরস্পর সংলগ্ন দু'খানা ঘর। এর মধ্যে বড় ঘরখানি, যেখানে মাইকের সামনে শিল্পী গান, আবৃত্তি বা নাটক অভিনয় করেন তাকে বলা হয় 'ষ্টুডিও'। আর অন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ঘরখানি, যেখানে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে শব্দকে ধারণ ক'রে এ্যাসিটেট্ ডিস্কের ওপর প্রতিফলিত করা হয়, তাকে বলা হয় 'রেকর্ডিং রুম' বা স্বর-সংরক্ষিকা কক্ষ। মাইকের সামনে বেদীর ওপর শিল্পী

উপবেশন করেন—যন্ত্রীদলকে প্রয়োজন মত দূরে বা কাছে সংস্থাপন করেন—স্বরগ্রাহক যন্ত্রী বা রেকর্ডার। এর পরই আরম্ভ হয় সর্বশেষ মহলা—এই মহলাকালে প্রয়োগ-প্রতিনিধি ও স্বরগ্রাহক যন্ত্রী, স্বর সংরক্ষিকা কক্ষে উপস্থিত থেকে গানখানি যন্ত্রের মাধ্যমে শুনে নেন—প্রয়োজনমত স্বর-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও স্বরগ্রাহক যন্ত্রীকেই ক'রতে হয়—অবশ্য যদি শিল্পীর স্বর-নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা না থাকে। এই মহলার পর পরীক্ষামূলক রেকর্ডিং করার ব্যবস্থা বর্তমান। এবার প্রথম সংকেত শব্দের সঙ্গে নীল আলো জ্ব'লে শিল্পী ও যন্ত্রীদলকে প্রস্তুত হবার নির্দেশ দান করে—সঙ্গে সঙ্গে ষ্টুডিও ঘরের সমস্ত বৈদ্যুতিক পাখা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়—প্রতিটি দরজা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়, ষ্টুডিও ঘর নিস্তব্ধ হ'য়ে ওঠে…আধ মিনিটের ব্যবধানে জ্বলে ওঠে লাল আলো। এই নীল ও লাল আলো শিল্পী ও যন্ত্রীদের সামনে দেওয়ালের মধ্যস্থলে থাকায় প্রত্যেকেরই দেখার বিশেষ সুবিধা আছে। লাল আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গান সুরু হয়। ঘরের ভেতরে যেমন লাল আলোর সংকেত আছে, ষ্টুডিওর প্রত্যেকটি প্রবেশ পথেও ঐরূপ আলোর সংকেত থাকায় এ সময়ে ষ্টুডিওতে গমনাগমন নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

গান চলতে থাকে—ষ্টুডিও ও রেকর্ডিং-রুমের মধ্যে দেওয়ালে কাঁচ দিয়ে ঢাকা একটি জানালার ওপারে রেকর্ডিং রুমে প্রয়োগ-প্রতিনিধি সংকেতে শিল্পী ও যন্ত্রীদলকে সুন্দর পরিবেশনে সাহায্য করেন, এ পাশে ষ্টুডিওতে সুরশিল্পী নীরব ইসারায় সমগ্র গানটিকে পরিচালিত করেন। গান শেষ হয় কয়েক সেকেণ্ড পরে, সংকেত শব্দ ক'রে আলো নিভে যায়। যতক্ষণ ষ্টুডিওর লাল আলো নিভে না যায় ততক্ষণ ষ্টুডিওতে অবশ্য সকলকে নিস্তব্ধ থাকতেই হবে।

পরীক্ষামূলক রেকর্ডটি এর পর বাজিয়ে, স্বরবর্ধক যন্ত্রের সাহায্যে ষ্টুডিও ঘরে শোনানো হয়—এবং এর দ্বারাই শিল্পী, যন্ত্রী, পরিচালক সকলেই দোষ-ত্রুটি প্রত্যক্ষে জানতে পেরে সংশোধন ক'রে নিতে সচেষ্ট হন—প্রয়োজন

হ'লে আবার মহলা দেওয়া হয়। অতঃপর পরীক্ষামূলক রেকর্ডিং-এর অনুরূপ উপায়ে এ্যাসিটেট্ ডিস্কে সংগীতের শব্দ-লিপি গ্রহণ করা হয়। এইখানেই একরকম শেষ হ'য়ে যায় সুরশিল্পী, শিল্পী ও যন্ত্রীদলের কর্তব্য। এরপর নমুনা রেকর্ডখানি প্রস্তুত হবার পর প্রয়োগ-প্রতিনিধি ও শিল্পীর অভিমত গ্রহণ করে তবে বাজারে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়···সে এর অনেক পরের ঘটনা। সংগীতের শব্দ-লিপি গ্রহণ করার পরই সত্যকার বিস্ময়কর কর্ম-প্রণালীর মাধ্যমে, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের নিয়ন্ত্রণে, বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় রেকর্ডটি ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশের পথে অগ্রসর হয়।

—দুই—

নাটক বা সমবেত সংগীতের ক্ষেত্রে একাধিক শব্দগ্রহণ যন্ত্রের (মাইক) ব্যবহার প্রচলিত আছে। এ অবস্থায় পরিচালক ও প্রয়োগ-প্রতিনিধিকে যে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন ক'রতে হয় একথা বলাই বাহুল্য। এবার রেকর্ডখানি বাজারে প্রকাশিত হবার আগে কি রকমভাবে, কি কি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ চল্‌তে থাকে তার দিকে নজর রেখে আমাদের কথা বল্‌তে চেষ্টা করবো।

ওয়াক্সের ওপর শব্দগ্রহণ করার পর (এ্যাসিটেট্ ডিস্ক সাধারণতঃ ওয়াক্স নামেই পরিচিত) শব্দ-গ্রাহক বিশেষজ্ঞ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা ক'রে নেন যে শব্দানুলেখগুলি ঠিক মত এসেছে কিনা। তারপর ঐ ডিস্কখানি ওয়াক্স ফেসিং বিভাগে প্রেরিত হয়—সেখানে ঐ ডিস্কের ওপর এমনভাবে এক পর্দা অনুলেপন দেওয়া হয় যাতে ধুলোবালি বা ধাক্কা লেগে শব্দানুলেখগুলি সহজে বিকৃত হবার সুযোগ না পায়। এরই মধ্যে সহকারী প্রয়োগ-প্রতিনিধি ঐ ওয়াক্সের ক্রমিক সংখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে গানের প্রথম ছত্রটি লিখে সংরক্ষণ করেন, যাতে ভবিষ্যতে গানটি চিনে নিতে কষ্ট না হয়।

মৌলিক এই সংগীতধারকটি (ডিস্ক) ওয়াক্স ফেসিং বিভাগ থেকে কপার রুমে পাঠানো হয়। এখানে এটি থেকে এইবার একটি তামার চাকৃতিতে গানখানির অনুলিপি ছেপে নেওয়া হয়। এই চাকৃতিকে বলা হয় 'মাদার' অর্থাৎ উৎপাদিকা। উৎপাদিকাটি [illegible] আবার [illegible] মৌলিক সংগীতধারকটির এবারের [illegible]

হ'য়ে যায়—এর পর ঐ ধারকটির ওপরের একপর্দা চেঁচে ফেলে আবার তাকে সংগীতধারকের কাজে ব্যবহার করা হয়।

উৎপাদিকা অর্থাৎ মাদারটি পরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো হয় 'একৃজামীন রুমে'। পরীক্ষা-অন্তে এই উৎপাদিকা থেকে একটি ষ্ট্যাম্পার তৈরী করা হয়, এরপর এই ষ্ট্যাম্পারটি রেকর্ড-প্রস্তুত কামরায় পাঠানো হয়, আর উৎপাদিকা অর্থাৎ 'মাদার'টিকে সযত্নে সংরক্ষণ করা হয়।

রেকর্ড-প্রস্তুত কামরায়, বিভিন্ন দ্রব্যের সংমিশ্রণে, বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত রেকর্ড-মণ্ড বা কেক্, রেকর্ড-ছাপা যন্ত্রের নীচে ওপরে রক্ষিত দু'খানা ষ্ট্যাম্পারের মধ্যে রেখে, ষ্ট্যাম্পারের সঙ্গে তার লেবেল অর্থাৎ পরিচয়-চাক্তি উল্টো ক'রে লাগিয়ে পরে ঐ কেকৃটিকে উত্তাপে গলিয়ে নেওয়া হয়। মণ্ডটি উত্তাপে প্রয়োজনমত নরম হ'য়ে যাবার পর, ওপর ও নীচ থেকে দু'খানি ষ্ট্যাম্পারের প্রয়োজনমত চাপ প্রদত্ত হয়—সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডার সংস্পর্শে রেকর্ডটি কঠিন আকার ধারণ করে। এর পর ফিনিসিং রেকর্ডটি সমাপ্তির রূপ লাভ করে। এই সমাপ্তির পথে এগিয়ে আসার পর যন্ত্রগুলি এমন সুশৃংখলে সন্নিবেশিত আছে, যাতে অযথা সময় বা জিনিষের অপচয় না হয়। সমাপ্তির পরে পরীক্ষা-অন্তে রেকর্ডখানি কাগজের খামে ভ'রে সংরক্ষণাগারে পাঠানো হয়। এখান থেকে প্রেরক বিভাগের মাধ্যমে এই রেকর্ড অনুমোদিত বিক্রেতার কাছে অথবা সরাসরি আপনার কাছে নতুন রেকর্ডরূপে উপস্থিত হয়।

বাংলা থিয়েটার উঠে যাচ্ছে কেন?

(১৩১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

নিবেদন জানাচ্ছি, তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে মঞ্চ-প্রবেশের দ্বার-প্রাচীরে রক্ষিত ঠাকুর রামকৃষ্ণের মূর্তিটি সরিয়ে ফেলেন, তার পরিবর্তে সেখানে তাঁরা রঙ্গমঞ্চের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাখতে পারেন, হেমেন মজুমদারের একটা ছবি আর একটা বোতল।

দেবতাকে বিস্মৃত হওয়া ভাল, দেবতাকে ক্রোধে উত্তেজিত করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। শুনেছি, থিয়েটারের পরিচালকেরা বিশেষ বুদ্ধিমান লোক সব, আশা করি আমার প্রস্তাবটা তাঁরা বিবেচনা করে দেখবেন।

মুগ্ধ যাঁদের গান শুনে

[মুগ্ধ যাঁদের গান শুনে—অবশ্য ছবির পর্দায় নয়, গ্রামোফোন রেকর্ডে এবং বেতারে। যাঁদের গান মাতায় প্রাণ অথচ ছবির জগতের সঙ্গে খুব বেশী যোগাযোগ না থাকলেও যাঁদের সম্বন্ধে চিত্রভক্তদের আগ্রহ ও কৌতূহলের শেষ নেই তাঁদের সম্পূর্ণ পরিচিতি সঙ্গীতানুরাগী পাঠকবর্গকে জানানোর জন্তচৌদ্দটি প্রশ্নের একটি তালিকা পাঠানো হয়েছিল বারো-জন এমনিধারা কৃতবিদ্য শিল্পীকে—তার মধ্যে ছ'জনের কাছ থেকে আমরা উত্তর পেয়েছি, বাকী ছ'জন নিরুত্তর। নিরুত্তর যাঁরা তাঁদের নাম হলো—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, গৌরীকেদার ভট্টাচার্য্য, সুকৃতি সেন, সন্তোষ সেনগুপ্ত, বেচু দত্ত ও ভারতী বসু। এঁদের নীরবতার কারণ অবশ্য আমাদের জানা নেই, তবে নিরুত্তর থেকে তাঁরা তাঁদের অনুরাগী ভক্তদের আগ্রহ ও কৌতূহলের প্রতি কতখানি সুবিচার করেছেন তা হয়তো তাঁরা নিজেদের বুদ্ধিহীনতায় উপলব্ধি করতে পারেন নি, তাই সে বিচার আমরা পাঠক-পাঠিকাদের হাতেই ছেড়ে দিলাম। —'চিত্রবাণী'-সম্পাদক]

১। জন্ম
২। সংক্ষিপ্ত পরিচয়
৩। সাধারণ শিক্ষা
৪। সঙ্গীতের ঘরওয়ানা (গুরু)
৫। কীভাবে "রেকর্ডে" আসেন ?
৬। কোন্ সঙ্গীত-পরিচালকের অধীনে সর্বপ্রথম "রেকর্ড" করেন ?
৭। কোন্ সুরকার সবচেয়ে প্রিয় ?
৮। কোন্ গীতিকার সবচেয়ে প্রিয় ?
৯। সমসাময়িক কোন্ "রেকর্ড" শিল্পীকে সবচেয়ে ভাল লাগে ?
১০। "রেকর্ড"-শিল্পীদের সম্বন্ধে নিজস্ব অভিমত
১১। কী উপায়ে "রেকর্ড" কর্তৃপক্ষ শিল্পীর মূল্য নির্ধারণ করেন ?
১২। নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ "রেকর্ড" কোনটি ? —জনপ্রিয়তা বা আয় অথবা উভয় দিক থেকেই
১৩। আবহ-সঙ্গীত সম্পর্কে কোন বক্তব্য আছে কিনা ?
১৪। চলচ্চিত্রে প্লে-ব্যাকে গান গেয়েছেন কিনা ? যদি গেয়ে থাকেন তবে প্রথম প্লে-ব্যাকে গাওয়া গান কোন্‌টি এবং কোন্ সালে প্লে-ব্যাক করেন ? যেসব ছবিতে প্লে-ব্যাকে গান গেয়েছেন তার তালিকা এইসঙ্গে দেবেন

বিমলভূষণ (মুখোপাধ্যায়)

১। আমার জন্ম-তারিখটা ১৬ই ভাদ্র, আর সনটা সম্ভবত: ১৩২৮। স্থান—ক'লকাতায়—ভবানীপুর, হরিশ মুখার্জ্জি রোডে। সনটা এক-আধ-বছর এদিক-ওদিক যদিও বা হয়—তারিখটা আর স্থান কিন্তু নির্ভুল।

২। পিতৃদেব স্বর্গীয় ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় (যিনি "ডক্টর নরেন" নামে সুদূর ইউরোপেও প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছিলেন) সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না বটে, তবে একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-রসজ্ঞ ছিলেন।

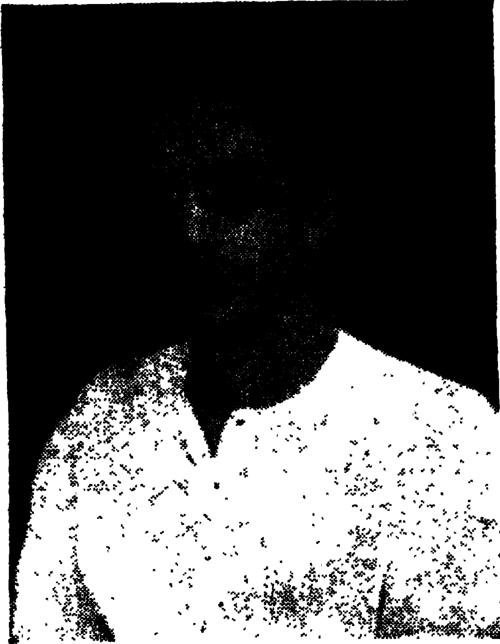
৩। সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণটা মূলত: আমার মাতৃকুল থেকে পাওয়া। আমার মাতৃদেবী—স্বর্গীয়া সুশীলাবালা দেবী—অপূর্ব্ব কণ্ঠ-সম্পদের অধিকারিণী ছিলেন। হিন্দু ব্রাহ্মণ কুলবধূ—যিনি জীবনে কোনদিন ওস্তাদের কাছে তালিম নিয়ে গান শেখবার অবসর পান নি—তিনি শুধু তাঁর দাদাদের মুখের গান শুনে শ্রুতি-বলে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত সেই গানের সবগুলি পদ; সুর ইত্যাদি মনে রেখে—কি ক'রে যে অত নিভুর্লভাবে গাইতেন—তা আজো আমার কাছে পরম বিস্ময়! তাঁর পূজোর সময়ের সঙ্গীতে

শ্রীভগবানের চরণে আত্মনিবেদনের তন্ময়ভাব আমার সাধনার বস্তুই রয়ে গেছে এখনো! সঙ্গীতের রূপ-বিকাশের ক্ষেত্রে ভাব যে অপরিহার্য্য সম্পদ—এই মূলমন্ত্র তাঁর কাছ থেকে পাওয়া আমার প্রথম ও প্রধান শিক্ষা।

আমার মাতুল এ্যাড্‌ভোকেট্‌ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় বৃদ্ধ বয়সেও অবসর সময়ে সঙ্গীত-চর্চ্চা ক'রে থাকেন। অবশ্য এটা তাঁর নেশা, পেশা নয়।

আমাদের ভাইবোনদের সঙ্গীত-শিক্ষার দিকটা অবহেলা তো দূরের কথা—তার উৎকর্ষ-সাধন-প্রচেষ্টায় সাহায্যই ক'রে গেছেন বাবা-মা চিরদিন।

আমার বড়-দা—স্বর্গীয় বিভূতিভূষণ—যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ নিতান্ত অল্প-বয়সে লোকান্তরিত হন—কিন্তু মাত্র



বিমলভূষণ

১৬।১৬ বছরের জীবনকালেই তাঁর সুকণ্ঠের-প্রসাদে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন।

বর্ত্তমানে আমরা ছ' ভাই, এক ভগ্নী। দিদিই সর্ব্বজ্যেষ্ঠা। দিদি, বর্ত্তমান বড়-দা, মেজদা, ছোটো তিনটি ভাই ও আমি—প্রত্যেকে গান শেখবার সুযোগ-সুবিধে সমভাবেই পেয়েছি। সর্ব্বকনিষ্ঠ শ্রীমান প্রভাতভূষণ সম্প্রতি বেতারে গান গাইছে।

সঙ্গীত-প্রীতির আধিক্যে—সাধারণ শিক্ষার দিকটা অবহেলিত না হয়—সেদিকেও সজাগ-দৃষ্টি ছিল বাবা-মা'র। ভবানীপুর সাউথ সুবার্ব্বন মেন স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই এস্‌প্ল্যানেড-ধর্ম্মতলার মোড়ে চৌরঙ্গী রোডের এক বাড়ীতে উঠে যাই আমরা। অতদূর থেকে স্কুলে যাওয়া-আসা করার বিশেষ অসুবিধে হতে লাগলো। তা ছাড়া বাবা প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপকেই শিক্ষার মাপকাঠি ব'লে ধরেন নি কোনদিন। তাই স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাড়ীতেই পড়াবার ব্যবস্থা হ'ল। দিনে ছ' ঘণ্টায় ছ'জন শিক্ষক বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাস নিতেন। ছাত্র আমরা ক'টি ভাই। এ ছাড়া বাবা নিজে ইংরাজী পড়াতেন। নিয়ম-কানুন স্কুলের মতই ছিল বটে, তবে ফাঁকির দিকটা নয়। গরমের সময় ভোর-বেলা ক্লাস বস্‌তো। নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ মিশনারী স্কুলের মতই মেনে চ'লেছি আমরা। আমোদ-প্রমোদের সুযোগ-সুবিধেও কম ছিলনা। প্রতি শনিবার-রবিবার গান-বাজনা ছাড়াও স্ত্রী-ভূমিকা-বর্জ্জিত নাটকাভিনয় হ'ত। আমার সেজদা শ্রীবিজয়ভূষণ ও শ্রীমান প্রমোদভূষণ এই ব্যাপারে পাণ্ডা ছিলেন। আমার সর্ব্বপ্রথম গানে সুর দেওয়াও ঐ নাটকাভিনয় উপলক্ষ্যে। এই সময়েই আমার জ্ঞাতি-কাকা সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "মহারাজ সিং" নামে একটি স্ত্রী-ভূমিকাবর্জ্জিত নাটক লিখে স্বয়ং একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে স্বেচ্ছায় রাজী হ'ন।

৪। আমার ভালো ক'রে গান শেখার ইচ্ছাটা যদিও মনে মনে ছিল বরাবরই তবে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে সেটা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞায় রূপান্তরিত হয়। অনেকে আমার গান-বাজনা শেখার ইচ্ছাটা সুনজরে দেখেন নি। এখন যেমন প্রায় ঘরে-ঘরে সঙ্গীত-চর্চ্চা সুরু হ'য়েছে—আমার ছেলেবেলায় এমনটি তো ছিলই না—বরং উল্টোটাই ছিল বলা চলে। অবশ্য সঙ্গীতশিল্পীরা বেশীর ভাগই যে পরিবেশের মধ্যে থাক্‌তেন সে সময়ে—সে সব দেখে-শুনে এই পথে এগিয়ে আস্‌তে নিষেধ করার যে কারণ ছিল না—

এ কথা বলি না। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তাঁদের আপত্তির কারণটা ঠিক এই ভিত্তিতে ছিল না। আমার গান গাওয়ার ওপর তাঁদের কেন যে বিষ-দৃষ্টি প'ড়েছিল—তা আজো বুঝে উঠতে পারি নি। তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, গান-বাজনা করার চেষ্টা করা আমার পক্ষে পণ্ডশ্রম মাত্র। আর তাঁদের এই মনোভাব একদিন তাঁরা আমার মুখের ওপরই ব্যক্ত ক'রে দিলেন। আমাদের বাড়ীতে একটু গান-বাজনার আয়োজন হ'য়েছিল। আমি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একটি গান গেয়েছিলাম। দ্বিতীয় গান গাওয়ার সুযোগ আর আমার হয় নি। একে আমার গাওয়ার ওপর তাঁরা ছিলেন বিরূপ—তায় গেয়েছিলাম রবীন্দ্র-সঙ্গীত—যা নাকি তাঁদের মতে সঙ্গীত-জগতে সর্ব্বনাশ সাধন ক'রছিল তখন। তাঁরা আবার গোঁড়া উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত ভক্ত ছিলেন কিনা! আমার গান শেষ হ'তে না হতেই তাঁরা কঠোরভাবে নিন্দাবাদ সুরু ক'রলেন, আমার দাদা ও ভাইয়েরা আর উপস্থিত কয়েক-জন বোঝাবার অনেক চেষ্টা ক'রলেন তাঁদের। কিন্তু অবুঝকে বোঝাতে পারা যায় কি সহজে? যাই হোক্ শেষকালে আমি তাঁদের ব'লে দিলাম যে, "আজ আপ-নারা যত নিন্দেই করুন, আমি একদিন আপনাদের এই ভ্রান্ত ধারণার পরিবর্ত্তন করাবোই।" এর পর থেকে (১৯৩২ সাল) আমি নিয়মিত উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত সাধনা সুরু করি, আর তা' বজায় রাখতে আজ পর্য্যন্ত সাধ্যমত চেষ্টা ক'রছি।

স্বর্গীয় সঙ্গীত নায়ক গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শিষ্যত্ব নেওয়ার বাসনা বহুদিন ছিল। কিন্তু যে-সময়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হ'লাম সে সময়ে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ। তবে তাঁরই নির্দ্দেশে তাঁর কৃতী শিষ্য সঙ্গীতাচার্য্য যামিনী-নাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর (যিনি সঙ্গীত শিক্ষাদান ব্যাপারে গিরিজাশঙ্করের দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ ছিলেন) কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণে আমি বিশেষ উপকৃত। এর আগে পণ্ডিত কেশব গণেশ ঢেকণে মহাশয়ের কাছেও কিছুদিন গান শিখেছি। এছাড়া যেসব গুণীজনদের কাছ থেকে এক-আধখানি গান শিখেছি—তাঁদের নামের তালিকা দিতে গেলে এ প্রসঙ্গের আর শেষ হ'বে না, অতএব এই পর্য্যায়ের গান শেখার আলোচনার কথা এই পর্য্যন্ত থাক্!

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গান আমার মনে প্রথম স্থানা-ধিকারী। আমার শৈশবে ইউনাইটেড্ মিশনারী স্কুলে কিণ্ডারগার্টেন ক্লাসে যখন পড়ি তখন সেখানকার সঙ্গীত-শিক্ষক দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে প্রথম দিনেই রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনে এত ভালো লেগেছিল যে ত' বোঝাবার মত ভাষা জানি না। সে-সময়েও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন লোকের যে অভাব ছিল না এ তো আগেই ব'লেছি। কিন্তু আমার বাবা-মা একান্ত-ভাবে রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন। তাই কারো কোনো বিরুদ্ধতাই আমার ক্ষতি ক'রতে পারে নি। তবে মজার কথা এই যে পরবর্ত্তীকালে এইসব বিরুদ্ধ-বাদীদেরই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশেষ ভক্ত (?) রূপে রূপান্তরিত হ'তেও দেখলাম।

(৫) রবীন্দ্র-সঙ্গীত গায়ন-পদ্ধতির দিক থেকে সুরসাগর পঙ্কজকুমার মল্লিক ও শ্রীমতী কনক দাস (বিশ্বাস)-এর ভঙ্গীটি বেশ ভালো লাগতো। পরে পঙ্কজবাবুর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগও ঘটেছিল। তাই তাঁর গায়ন পদ্ধতিটা প্রায় ঘরওয়ানা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল আমার কাছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নীহারবিন্দু সেন মহাশয়ের কাছে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষা ক'রে আমি যথার্থ উপকৃত হ'য়েছি।

১৯৩৭ সালের শেষের দিকে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবরা আমায় রেকর্ড-রেডিওতেও গাওয়ার চেষ্টা করার জন্য বল্লেন। নিজেরও যে ইচ্ছে ছিল না তাও নয়, কিন্তু সে-সব ক্ষেত্রে প্রবেশের পথও জানা ছিল না আর সঙ্কোচও ছিল যথেষ্ট। একদিন আমার উৎসাহী বন্ধুদের কয়েকজন স্বর্গীয়-গায়ক হরিপদ রায়কে নিয়ে এসে হাজির হ'লেন। তাঁরা আমায় নিয়ে যান নিউ থিয়েটার্স-হিন্দুস্থান রেকর্ডের টালিগঞ্জ ষ্টুডিওতে। সেখানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হ'লাম। কিন্তু তাঁরা প্রারম্ভিক উদ্যোগ-আয়োজন ক'রতে অতি দীর্ঘ সময় নিলেন। তাতে আমায় সঙ্কোচটাও যেন কিছু বেড়ে গেল।

(৬) এর [illegible] আমার বন্ধুরা "হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" [illegible] তে নিয়ে যাবার সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে

হঠাৎ একদিন বেড়াতে যাবার নাম ক'রে আমাকে গ্রামোফোন কোম্পানীর চিৎপুর-গরাণহাটার মোড়ের তৎকালীন রিহার্সাল-রুমে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। সেখানে রেকর্ড কোম্পানীর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সোম, সঙ্গীত পরিচালক শ্রীকমল দাশগুপ্ত প্রভৃতি ছিলেন। তাঁরা আমার গান শুনে বিশেষ প্রীত হ'ন এবং তাঁদের অনুরোধে আমায় খানপাঁচেক গান গাইতে হয়। শ্রীযুক্ত সোম তৎক্ষণাৎ আমার রেকর্ড করাবার আয়োজন সম্পূর্ণ ক'রতে শ্রীকমল দাশগুপ্তকে ভার দিলেন এবং তাঁরই (শ্রীদাশগুপ্তের) পরিচালনাধীনে আমার প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে (এইচ এম ভি-তে) বেরোয়। সেই সময়েই আমি বেতারেও যোগদান করি। ১৯৩৭ সালের ২৭শে অক্টোবর আমি সর্ব্বপ্রথম বেতারে গান করি। ঐ দিনই আমার বর্ত্তমান বড়দা শ্রীযুক্ত রেবতীভূষণও গান করেন বেতারে। বর্ত্তমানে যদিও তিনি সাধারণ আসরে গাইবার অবসর পান না, কিন্তু তাঁর চিকিৎসা ব্যবসার চাপে তাঁর সুকণ্ঠ নষ্ট হয় নি। বেতার-কর্ত্তৃপক্ষ যদিও আমায় সে সময়ে তিনবার "অডিশনে" অকৃতকার্য্যতার ছাপ দিয়ে দেন অকারণে, এবং পরেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মতদ্বৈধ চূড়ান্ত রূপ নেয় একাধিবার—তবে বর্ত্তমানে আমার প্রতি তাঁদের কৃপা-দৃষ্টি আছে ব'লেই তো মনে হয়।

(৭) সুরকারদের সম্বন্ধে ব'লতে গিয়ে একটু বাধো বাধো লাগলেও,—যখন জানতে চেয়েছেন তখন বলতে হবেই।

কুমার শচীন দেব বর্ম্মণের সঙ্গীত-পরিচালনা সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রাখি। যদিও তিনি আজ সুদূর বোম্বাইতে হিন্দী ছবির সুরকাররূপেই সমধিক পরিচিতি লাভ ক'রেছেন, কিন্তু বাংলা দেশে থাকাকালে তিনি যে যথোপযুক্ত সম্মানলাভে বঞ্চিত হ'য়েছিলেন এ নিতান্তই দুঃখের বিষয়। শ্রীরবীন চট্টোপাধ্যায় বর্ত্তমানে বাংলার শ্রেষ্ঠ আবহ-সঙ্গীত পরিচালক হ'লেও শ্রীঅনুপম ঘটকের সুরগুলিই নতুনত্ব প্রকাশে অধিক সচেষ্ট। উদীয়মান শ্রীসলিল চৌধুরীর নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

(৮) গীতিকার-প্রসঙ্গও সুরকার প্রসঙ্গের প্রভাবমুক্ত নয়। অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হ'বে—তাই একটি গোষ্ঠির কয়েকজনের নাম উল্লেখ না ক'রলে অন্যায় করা হয়। শ্রীমতী অলকা উকিল, সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য, বটকৃষ্ণ দে, প্রবোধভূষণ, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার প্রভৃতির রচনা আমার ভালো লাগে গান হিসেবে।

(৯) সমসাময়িক রেকর্ড-শিল্পীদের মধ্যে যাঁকে আমার সবচেয়ে ভালো লাগতো তিনি সম্প্রতি লোকান্তরিত শিল্পী সুধীরলাল চক্রবর্ত্তী। তাঁর অকাল-মৃত্যুতে আমি সত্যিই মর্ম্মাহত হ'য়েছি।

(১০) রেকর্ডের শিল্পীদের মধ্যেই শুধু নয়—বর্ত্তমানে শিল্পীদের প্রায় অনেকেরই মধ্যে যে আগ্রহটা দেখি তাতে আমি বিশেষ ব্যথিত। ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা লেশমাত্র কম নেই আমার। কিন্তু তাঁরা বোম্বাই-মাদ্রাজের ছায়াছবির অনুকরণ ক'রে বাংলা গানকে যে পর্য্যায়ে এনে

দাঁড় করাচ্ছেন তার সমর্থন করতে আমি অক্ষম। ভালোর অনুকরণ করা ভালো, ক্ষেত্র বিশেষে—কিন্তু অন্ধভাবে পুরোপুরি অনুকরণ ক'রে যে ধরণের গান আজকাল চালু হ'য়েছে তার স্থায়িত্বকাল খুব স্বল্প ব'লেই আমার ধারণা, তবু রবীন্দ্রনাথ-অতুলপ্রসাদ-নজরুলের দেশ বাংলার এই অনুকরণের দৈন্যদশা দেখে লজ্জা হয়। অবশ্য কেউ হয়তো বলবেন যে এটা ব্যবসার দিক থেকে বর্ত্তমানে বিশেষ লাভজনক—তাহোলে কিছু মন্তব্য না করাই ভালো! তবে এর জন্যেও শিল্পীদের চেয়ে রেকর্ড কর্ত্তৃপক্ষকেই দোষী করার যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁরা তাঁদের ব্যবসার খাতিরে দেশকে নৈতিক অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিতে নিশ্চয়ই পারেন না—দেশের সংস্কৃতির চিতার ওপর তাঁদের ব্যবসার ভিত্তিকে দৃঢ় হ'তে দেওয়া যেতে পারে না। তাঁরা অবশ্য মনে করেন যে শিল্পীদের মরণ-বাঁচন তাঁদের হাতে যখন তখন তাঁদের মর্জ্জিমত চলতে শিল্পীরা বাধ্য।

(১১) শিল্পীদের সঙ্গে তাঁরা চুক্তিটা বেশ এক তরফাই করে রাখেন, মৌখিক যাই বলা হোক না কেন। মূল্য নির্দ্ধারণ পদ্ধতিটাই ধরা যাক। হয়তো স্থির হ'ল একটি রেকর্ডের বিক্রয়-লব্ধ অর্থের শতকরা সাড়ে সাত টাকা শিল্পীর প্রাপ্য। কার্য্যক্ষেত্রে টাকাটার হিসেব-নিকেশের সময় দেখা গেল ঐ শতকরা সাড়ে সাত টাকা থেকেও বিভিন্ন বিভাগে কেটে-কুটে যৎসামান্যই শিল্পীর হাতে পৌঁছলো। সবচেয়ে আপত্তিকর হ'ল যে তাঁরা তাঁদের খুশীমত হিসেব পাঠাবেন। নিজস্ব হিসাব পরীক্ষক দিয়ে যে পরীক্ষা করাবেন সে সুযোগ শিল্পীর নেই। কোনো শিল্পী যদি আপত্তি করেন তো তাঁকে জব্দ করার অস্ত্রও তো কোম্পানীর হাতে আছেই। কারণ—তাঁরা ইচ্ছে ক'রলে প্রমাণও ক'রে

দিতে পারেন যে শিল্পীর রেকর্ড বিক্রয়-যোগ্যই নয়। এমন-কি একবার হিসেব দাখিলের বিক্রয়-তালিকাকে পরবর্ত্তী হিসেব-নিকেশকালে ফেরৎ পাওয়ার পর্য্যায়ে ফেলতেও তো বিশেষ কষ্টকর হবে না তাঁরা ইচ্ছে ক'রলে। কিংবা বিপরীত মতাবলম্বী শিল্পীদের শিক্ষা (?) দিতে তাঁরা পাঠাবেন্ই না সব দোকানে সেসব শিল্পীর রেকর্ড। এমন-কি রেকর্ড ছাপানোই হয় তো বন্ধ ক'রে দিলেন কোনো না কোনো অজুহাত দেখিয়ে—তা সেইসব শিল্পীর বা গানের যত জনপ্রিয়তাই থাক না কেন! বোধ হয় (monopoly business) একচেটে ব্যবসার চরমতম নিদর্শন এই-গুলো! কয়েকজন ভাগ্যবান ব্যতীত প্রায় সকল শিল্পীকেই রেকর্ড কোম্পানীর এই বিষম জালে জড়িয়ে পড়তে হবেই। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে বিদেশী কোম্পানীর বিদেশী কর্ত্তাদের চেয়ে বাঙালী কর্ম্মচারীরাই রয়েছেন এর মূলে। বিদেশী কর্ত্তাদের একজন কিছুকাল আগে—অন্যান্য ভারতীয় রেকর্ড-কোম্পানীগুলিকে ধূলিসাৎ ক'রে দেবার যে অভিপ্রায় সদম্ভে প্রকাশ করেছিলেন—তাকে রূপ দিতে তাঁদের বাঙালী কর্ম্মচারীরাই অধিক আগ্রহশীল—যাঁরা প্রগতিবাদী বলে নিজেদের প্রচার করেন—এও কম লজ্জার নয়। পরাধীন দেশে প্রবর্ত্তিত এক-চেটে ব্যবসার নিয়মের নামে এই অবিচার আজ স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পাঁচ বছরের মধ্যেও তার কোনো সংস্কার সাধন করা গেল না—এও নিতান্ত পরিতাপেরই বিষয়। শিল্পীদের দিয়ে বিনা প্রতিবাদে তাঁদের হুকুম তামিল করানোর এই মনোবৃত্তির প্রতিবাদেই আজ দু' বছর হ'ল আমি রেকর্ড-জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রতে বাধ্য হয়েছি।

(১২) আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রেকর্ড কোন্‌টি? প্রশ্নটি জটিলও নয় মোটেই। কিন্তু আমার পক্ষে বর্ত্তমানে এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া সত্যিই শক্ত। কারণ দীর্ঘ-বিরতির পর ১৯৪৬ সালে গ্রামোফোন কোম্পানীর শ্রীযুক্ত অধীরচন্দ্র সেন মহাশয়ের আগ্রহে রেকর্ডিং সম্বন্ধে পুনরায় মনোযোগী হই। তারপর শ্রীযুক্ত সেনের আগ্রহাতিশয্যেই ১৯৫০ সাল [illegible] কোনোমতে রেকর্ডিং [illegible] কলম্বিয়া কোম্পানীতে [illegible]কে ছিলাম। কিন্তু প্রথম খান দুই রেকর্ড করার পর থেকেই শিল্পীদের মূল্য নির্দ্ধারণ পদ্ধতি ও অন্যান্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (যার জন্যে শিল্পীদের ক্ষতিই হয় বেশী) ইত্যাদির প্রতিবাদ করার ফলে কর্ত্তাদের সুনজর লাভে বঞ্চিত হই। তাই জনপ্রিয়তার মাপকাঠি অর্থাৎ সাধারণের প্রশংসাধন্য হয়ে যে রেকর্ড বহু দূর দেশেও বাজতে শুনলাম—সেই রেকর্ডেরই মূল্য নির্দ্ধারণকালে কোম্পানীর খুসীমত প্রেরিত অর্থই মাথা পেতে নিতে বাধ্য হয়েছি। তবে শ্রোতৃবর্গের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে এ কথাটাও আনন্দের সঙ্গেই ব'লব যে, আমার রেকর্ডের কোনো গানই তাঁদের সম্বর্দ্ধনা লাভে বঞ্চিত হয় নি—আর তাই-ই আমাকে রেকর্ড কোম্পানীর সমস্ত অবিচার সহ্য করবার শক্তি দিয়েছে, সান্ত্বনা দিয়েছে। যাই হোক্, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনীর বিবৃতি দিতে গিয়ে অনেক অপ্রিয় সত্য কথাই এই প্রসঙ্গে ব'লতে হ'ল ব'লে আমি বিশেষ দুঃখিত।

(১৩) আবহ-সঙ্গীতের ব্যাপারে এখানে যে পদ্ধতি প্রচলিত তারও আশু পরিবর্ত্তন অবশ্য প্রয়োজনীয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে ফ্লোরে ব'সে টেকিং-এর কিছু আগে সিচুয়েশনটা জেনে অর্কেষ্ট্রা পার্টিকে দিয়ে আন্দাজের ওপরেই বাজনা বাজিয়ে নিয়ে কাজ সারা হয়। এতেও না হ'ল তো—বিলিতি ছবির আবহ-সঙ্গীতের টুক্‌রো কেটে নিয়ে জুড়ে দিয়ে ঝামেলা মেটানোর সুযোগ তো রয়েছেই। শুধু গানের সুর দিয়েই সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্ব চুকে যায় না। আবহ-সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি এবং তার জন্যে বিশেষভাবে চিন্তা করারও যে যথেষ্ট প্রয়োজন—একথাটা যেন অনেকেরই অজ্ঞাত মনে হয়। অবশ্য এজন্য প্রযোজক বা পরিচালকের সঙ্গীত-সম্বন্ধে অজ্ঞতা-সূচক তাড়াহুড়োও বহুলাংশে দায়ী।

(১৪) চলচ্চিত্রে প্লে-ব্যাকে আমি গান গেয়েছি মাত্র দু'খানি ছবিতে। প্রথমটি ১৯৪৩ সালে "জজ-সাহেবের-নাতনী" চিত্রে। তারপর স্থির করি যদি নিজের উপযুক্ত কোনো চরিত্রাভিনয়ের সুযোগ ঘটে তো চিত্রে অবতরণ করেই গান গাইবো—প্লে-ব্যাকে আর গাইবো না। দীর্ঘকাল পরে ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ

ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে ম্লানমুখে লেখা
শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত
চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে
প্রাণ তার—
তারপর সন্তানেরে দিয়ে যায়
বংশ বংশ ধরি...



চিত্রভারতীর নিবেদন

পরিচালনা:
সত্যেন বসু

কাহিনী:
সলিল সেনগুপ্ত

সংগীত:
সলিল চৌধুরী

শ্রেষ্ঠাংশে:
প্রভৃতি

পরিবেশক:
প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

মিত্র (ছোটাই বাবু) মহাশয় আমাকে তাঁর "হের-ফের" চিত্রে নামানো স্থির করেন এবং ঐ ছবির নায়কের গান-গুলিও কিন্তে রেকর্ডিং করা হয়। কিন্তু আমার মাতৃবিয়োগ ও অন্যান্য কয়েকটি কারণে আমার চিত্রাবতরণ স্থগিত রাখতে হয়। যাই হোক্—প্লে-ব্যাকে গান গাওয়া ঐ আমার দ্বিতীয় এবং বোধ হয় শেষ—আর তার কারণটা তো আগেই ব'লেছি।

আর একটি প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে চাই—যদিও এটা আপনাদের প্রশ্ন-তালিকার বহির্ভূত।

আমি পদবীহীন শুধু "বিমলভূষণ" হ'য়েছি কেন—অনেকেই এ প্রশ্ন করে থাকেন আমায়। এ কিন্তু আমি কোনো বিশেষ খেয়ালবশে করি নি, ক'রেছি বাধ্য হ'য়েই। ১৯৩৮-৩৯ সালে অপর একজন বিমলভূষণ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সমবেত সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হ'ত বেতারে। তাঁরা তাঁদের দলের নাম রেখেছিলেন—"কমিউনিটি সিঙ্গিং পার্টি"! 'বেতারজগৎ' পত্রিকায় তার বাংলা অনুবাদ ছাপা হ'ল—"সাম্প্রদায়িক সঙ্গীত"—পরিচালক বিমলভূষণ মুখোপাধ্যায়। এর পরে ইস্লামিয়া কলেজে এক অনুষ্ঠানে গাইতে ডাকা হয় আমাকে। হঠাৎ আমার এক মুসলমান বাল্য-বন্ধু এসে আমাকে ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নিষেধ করেন, কারণ সেখানে নাকি বিপদের আশঙ্কা ছিল। 'বেতার জগতে'র সামান্য ভুলে প্রাণ যায় যায়। যাই হোক্ তখন পিতৃদেবের উপদেশানুসারে দুই বিমলভূষণ মুখো-পাধ্যায়ের পার্থক্য নির্ণয় করতে নিজে শুধু বিমলভূষণ-এ দাঁড়ালাম। আজ অবশ্য অপর বিমলভূষণ মুখোপাধ্যায়কে বেতার-আসরে দেখি না কিন্তু আমি 'বিমলভূষণ'ই রয়ে গেলাম।

সত্য চৌধুরী

১। ইংরাজী ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর বাংলা ১৩২৫ সালের ৩১শে ভাদ্র কলিকাতার গ্রে ষ্ট্রীটে আমার জন্ম।

২। পিতামহ ৺কিশো[illegible] যুগের বিশিষ্ট বা[illegible]দের মধ্যে অন্[illegible]লেন। [illegible] রাজনীতিতে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাজসাহীর নিজ বাড়ীতে শত শত ছাত্রকে আপন তত্বা-বধানে রেখে প্রচুর অর্থব্যয় করে তাদের ভবিষ্যৎ-জীবন গঠন করতে সাহায্য করেছিলেন। ৺উপেন্দ্রলাল মজুম-দার (প্রথম বাঙ্গালী এ্যাকাউন্ট্যান্ট্ জেনারেল এ্যাণ্ড কন্ট্রো-লার অফ কারেন্সী) আমার মাতামহ। আমার পিতা ৺যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী কলকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ এ্যাডভোকেট ছিলেন। শিক্ষা এবং সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল।

৩। বংশানুক্রমিক ধারা বজায় রাখতে আমি যথা-রীতি প্রচলিত শিক্ষার সোপান ধরে ছাত্রজীবন সুরু করে-ছিলাম। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ভবানীপুর মিত্র ইন্সটিটিউসান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আশুতোষ কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্ত্তি হই। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে বি, এ, পরী-ক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এম, এ,-ল' পড়বার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করি। ইচ্ছা ছিল পিতা এবং পিতামহের মত আইন ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করা। কিন্তু ঘটনাক্রমে তা' আর হোয়ে ওঠে নি।

৪। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর আমার প্রকৃত সঙ্গীত-চর্চ্চা সুরু হয়। পিতা এবং মাতুলের অনু-প্রেরণায় সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের সাধনাও করতে থাকি।

ইন্টারমিডিয়েট পড়বার সময় শিল্পী শ্রীশচীনদেব বর্ম্মণ মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি এবং পরে ৺ফণীভূষণ গাঙ্গুলীর শিষ্যত্বও গ্রহণ করি। ৺ফণীভূষণ গাঙ্গুলী ছিলেন উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের সাধক। প্রিয় শিষ্য হিসেবে সুরজগতের নানান বৈচিত্র্যের সঙ্গে তিনি আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে-ছিলেন। ৺ফণীভূষণ গাঙ্গুলীর কাছে শিক্ষা শেষ করে তানসেনের বংশধর ওস্তাদ দবীর খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করি। এই সময়েই আমি গেলাম আমার অন্যতম আত্মীয় পণ্ডিচেরীর শ্রীদিলীপকুমার রায়ের কাছে বাংলা গান এবং ভজন শেখার উদ্দেশ্যে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত কীর্ত্তন, প্রভৃতি যথারীতি শিক্ষা এবং অনুশীলন করেছি। কয়েকজন গুণী শিল্পী এবিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে আন্তঃ-কলেজ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় সর্ব্ববিষয়ে সাফল্যলাভ করে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীরূপে পুরস্কৃত হয়েছিলাম। 'অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিসান' প্রতিযোগিতায়ও বিশেষ সাফল্যলাভ করতেও সক্ষম হয়েছিলাম এবং সেই সময়ে কনফারেন্সে গাইবার আহ্বানও এসেছিল।

১৯৪৯ সালে 'অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে' বাংলা ধ্রুপদ গান গেয়েও গুণীজনদের প্রশংসা অর্জ্জনে ধন্য হয়েছিলাম।

বাংলা গানের নানা শাখা-প্রশাখা—বাউল, কীর্ত্তন, ভাটিয়ালী, প্রাচীন বাংলা-গীতি, শ্যামাসঙ্গীত, আধুনিক, রবীন্দ্র-গীতি, রাগপ্রধান, তাছাড়া আছে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত —যার প্রচলন বেশী হিন্দী ভাষার ওপর—সবরকম সঙ্গীত পরিবেশন করার উপযোগী শিক্ষা আমি লাভ করেছি।

৫। সুরকার শ্রীঅনুপম ঘটকের সঙ্গে ছাত্রাবস্থায় আমার পরিচয় হয় এবং তাঁরই ইচ্ছায় হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে যোগদান করি—পরে শ্রীদিলীপকুমার রায় ও শ্রীহেম সোমের আগ্রহাতিশয্যে এইচ, এম, ভি, কোম্পানীতে স্থায়ীভাবে যোগদান করি।

৬। আমার সর্ব্বপ্রথম গানের রেকর্ডের সুর-সংযোজনা এবং পরিচালনা করেছিলেন শ্রীঅনুপম ঘটক।

৭। বিখ্যাত সঙ্গীত-পরিচালক শ্রীকমল দাশগুপ্ত আমার প্রিয় সুরকার।

৮। শ্রীপ্রণব রায় আমার প্রিয় গীতিকার।

৯। শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্যাকেই আমর সবচেয়ে ভালো লাগে।

১০। শিল্পীদের প্রথম জীবনে স্বাভাবিক ইচ্ছা থাকে রেকর্ডে গান ক'রে নিজের কণ্ঠস্বর শোনা এবং পাঁচজনকে শোনানো। রেকর্ডের গান সাফল্যমণ্ডিত হলে নাম-যশ এবং পরে পেশা হয়ে দাঁড়ায়।

সব ব্যবসার মতই রেকর্ড-জগতেও কয়েকজন কর্ণধার থাকেন। উন্নতি, অবনতি, সংস্কৃতি সবকিছুই নির্ভর করে তাঁদের ওপর অর্থাৎ এই পেশার মান নির্দ্ধারক তাঁরাই হন। দুঃখের বিষয় রেকর্ড-শিল্পীদের জনপ্রিয়তা ও কাজের পরিমাণ ইত্যাদি সবই নিছক স্বর্ণলোলুপ স্বার্থান্ধ ব্যবসায়ীদের হাতে থাকায় তাঁরা রেকর্ড কোম্পানীর হাতের পুতুল হয়ে যান। যা করানো হয় তাঁরা তাই করেন এবং তাঁদের ঐ লক্ষ্য ক্রমে অর্থের দিকে চলে যায়। এই একটি কারণে ক্রমে ক্রমে রেকর্ড-সঙ্গীতের অবস্থা এমন একটা অবস্থায় এসে পড়েছে যখন শিল্পীরা যদি অবহিত হয়ে নিজেদের মর্য্যাদা বাড়াবার দিকে দৃষ্টি না



সত্য চৌধুরী

দেন—তাহলে 'রেকর্ড'-শিল্পীর প্রতিভার অপব্যবহার হওয়ারই সামিল হয়ে দাঁড়াবে। রুচিসম্মত সঙ্গীতের চাহিদা সৃষ্টি করার চেষ্টা এবং অর্থের লোভে ক্রীড়নকের মত যথা আজ্ঞা পালন না ক'রে তথাকথিত জনপ্রিয়তার অন্ধমোহ কাটানোর প্রয়াস শিল্পীদেরই করতে হবে এক-যোগে—নতুবা [illegible] অনুকম্পার পাত্র হয়েই রইবেন। শিল্পীদের [illegible] অন্নসংস্থানের অন্য উপায় [illegible] দের [illegible] আরও বেশী উপার্জ্জনের [illegible] মোহ কাটিয়ে নিজেদের এবং দেশের সঙ্গীত

শিল্পের উন্নতি তাঁরা নিশ্চয়ই করতে পারেন জনসাধারণের রুচিসম্মত সঙ্গীত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করতে হবে তাঁদেরই।

১১। কণ্ঠস্বর রেকর্ড করবার উপযুক্ত হলে সামান্য একটু গান করতে পারলেই রেকর্ড কোম্পানী শিল্পীদের নিয়ে 'এক্সপেরিমেন্ট' করতে প্রয়াস পান। হরবোলার মত মুখস্থ করা গান উগরে যান কোনরকমে নবাগতা শিল্পী,...শুনে সম্ভাবনার কোন ইঙ্গিত পেলে তাঁকে আরও 'চান্স' দেওয়া হয়। তার সম্বন্ধে প্রচার করা হয় আধুনিক প্রচার পদ্ধতিতে। ক্রমে জনসাধারণের সঙ্গে পরিচয় ঘটে,...অদৃষ্ট প্রসন্ন হ'লে শিল্পী 'তারকা'র আসনেও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। প্রকৃত সঙ্গীত শিক্ষার চাইতে কে কতটা নিখুঁতভাবে শিক্ষকের শেখানো কবিতা মিষ্টিসুরে আওড়াতে পারেন সেই চেষ্টাই হয় শিল্পীর একমাত্র সাধনা!

১২। 'পৃথিবী আমারে চায়'—এটির গীতিকার মোহিনী চৌধুরী এবং সুর-সংযোজনা ও পরিচালনা করেছিলেন শ্রীকমল দাশগুপ্ত।

১৩। আবহ-সঙ্গীত সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে নাটক নাটকের রস, নাট্যসঙ্গীত ইত্যাদি অনেক বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা এসে পড়ে। জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে অহরহ যে রসসৃষ্টি হচ্ছে নাটক তারই প্রতিরূপ। অভিনয় দিয়েও যেখানে সে রসসৃষ্টি পরিপূর্ণ হচ্ছে না আবহসঙ্গীতের সাহায্য সেখানে অপরিহার্য্য। কিন্তু মুস্কিল হয়ে দাঁড়ায় এই ব্যাপারে যে, ভারতীয় সঙ্গীত হ'ল 'মেলডি'-প্রধান একক সুরের প্রাধান্তেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এক একটি রাগ-রাগিণী এক একটি সুরের বাহক। বহুকাল থেকে কোন একটি বিশেষ রসসৃষ্টির পরিপূরক হিসেবে বিশেষ কোন সুরের ব্যবহার চলে আসছে। আজ কিন্তু অনেক সময়ই সেটা কাণে পুরনো এবং একঘেয়ে ঠেকে। ছন্দ এবং সঙ্গতিপূর্ণ যে 'হারমনি' ইউরোপীয় সঙ্গীতের প্রাণ এ ক্ষেত্রে তার ব্যবহারের প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। বিদেশী ছবি ও রেডিও তার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। অথচ জানা না থাকায় বিদেশী অর্কেষ্ট্রার ব্যর্থ অনুকরণে যে আবহ-সঙ্গীতের সৃষ্টি হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই

আমাদের দেশের সঙ্গীত-পরিচালকদের আমাদের নিজেদের সুরকেই ছন্দ-বৈচিত্র্যে নতুনভাবে ঢেলে সেজে উপযুক্ত জায়গায় ব্যবহার করার চেষ্টা করা উচিত। প্রথম প্রথম সাফল্যলাভ না হলেও একদিন সিদ্ধি আসবেই। অপর পক্ষে না জেনে না শিখে ফিরিঙ্গী পাড়ার 'হোটেল ব্যাণ্ডের' ভাড়া-করা যন্ত্রীদের নিয়ে ও তাদের কাছ থেকে ধার-করা কোন বিলিতী ঐক্যতানের সুরকে অনুকরণ করে বা বিলিতী ঐক্যতানের যেসব স্বরলিপির বই ও রেকর্ড পাওয়া যায় তার অপব্যবহারে সাময়িক অর্থোন্নতি ও সস্তা হাততালি পাওয়া অসম্ভব নয় কিন্তু সমগ্রভাবে দেখলে এ নিয়ে চলবে ক'দিন?

নিছক ভারতীয় ঐক্যতানের বৈচিত্র্যে আলাউদ্দিন খাঁ, তিমিরবরণ, পণ্ডিত রবিশঙ্কর বা আলি আকবরের মত কয়েকজন মুষ্টিমেয় শিল্পী ছাড়া কেউ-ই বিশেষ কিছু করেন নি যেটুকুও বা করেছেন তা' 'টাইম সার্ভিং'। মনে হয় খুব কম চিত্রেই আজ পর্য্যন্ত সঠিকভাবে আবহ-সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়েছে...যা হয়েছে তা ব্যভিচার—জনসাধারণের অজ্ঞতাও এর জন্য দায়ী বহু পরিমাণে।

১৪। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে হীরেন বসুর পরিচালনায় গৃহীত "কবি জয়দেব" ছবিতে আমি প্রথম প্লে-ব্যাকে গান করি। আজ পর্য্যন্ত যত ছবিতে প্লে-ব্যাকে গান গেয়েছি তার কয়েকটির নাম দিচ্ছি:

বাংলা ছবি 'এইতো জীবন', 'বন্দিতা', 'পাপের পথে', 'অভিযোগ', 'অভিযাত্রী', 'পথের দাবী', 'মন্দির', 'জয়যাত্রা', 'চন্দ্রশেখর', 'বসুমাতা', 'ধাত্রীদেবতা', 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন', 'আশাবরী', 'চীনের পুতুল', 'নিবেদতা', 'মালঞ্চ' প্রভৃতি এবং 'কুরুক্ষেত্র', 'রামানুজ', তপস্যা,' চন্দ্রশেখর' 'কাজরী', 'এ্যারেবিয়ান নাইট্‌স', কাশ্মীর হামারা হ্যায়', 'আমিরী', ফুলওয়ারী', 'বিজয় যাত্রা' প্রভৃতি হিন্দী ছবিতে।

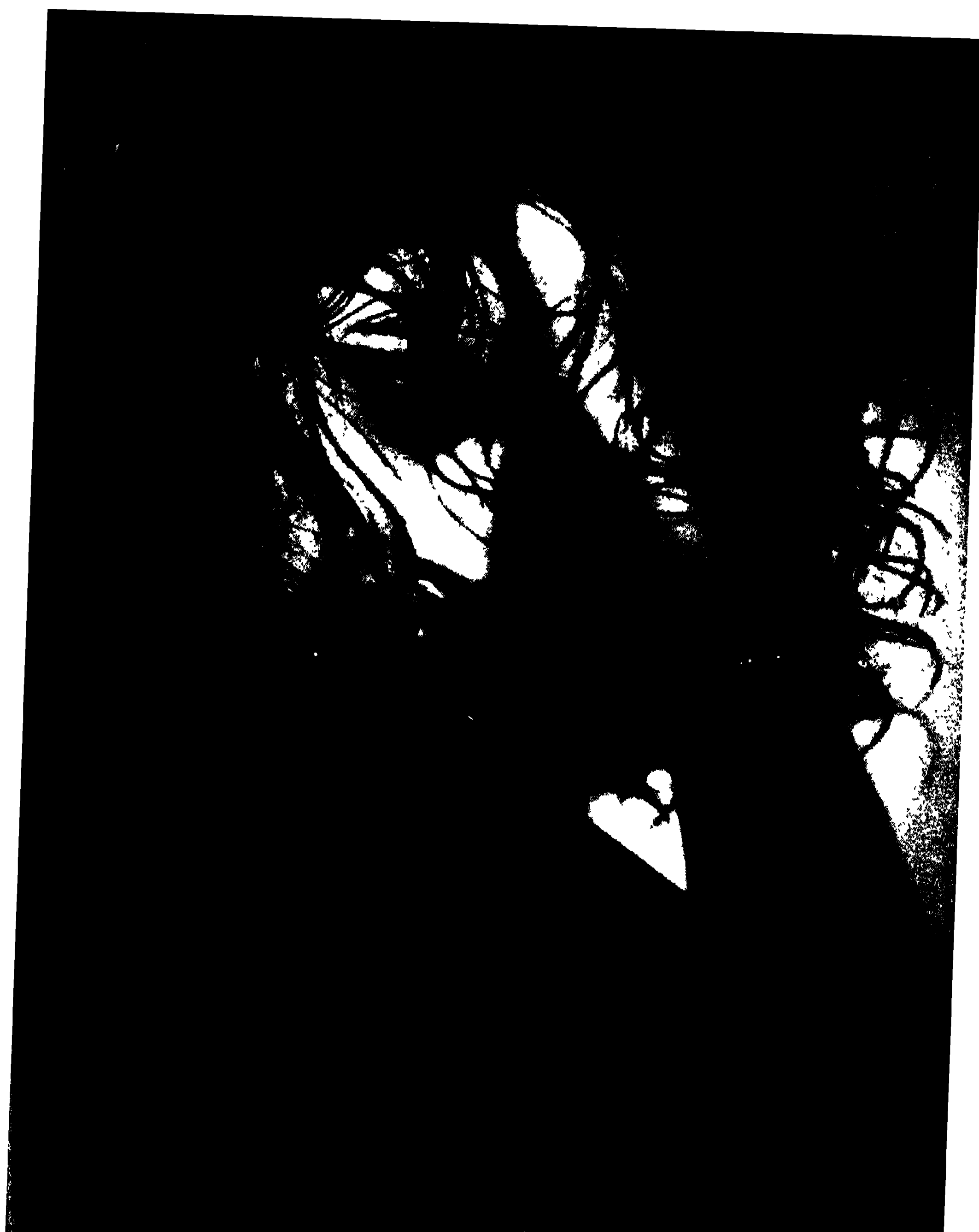
দ্বিজেন চৌধুরী

১। ১৯১২ সালে সিরাজগঞ্জে আমার জন্ম হয়।

২। গান-বাজনার আবহাওয়ার মধ্যেই আমি মানুষ।



ভারতীয় চিত্রজগতে নবাগতা ও সৌভাগ্যশালিনী অভিনেত্রী
অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়



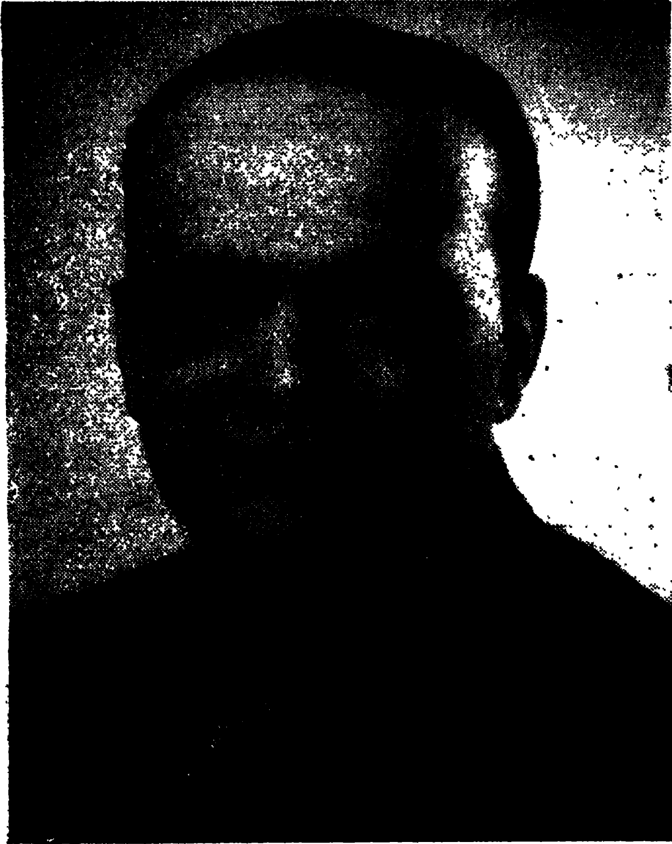
হিন্দী চিত্রজগতের চিত্তহারিণী
চিত্রনটী নার্গিস

আমার বাবা কান্তকবি রজনীকান্তর গান খুব ভাল গাইতেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর গান শুনতাম এবং আপনা থেকেই শেখা হয়ে যেত। মনে পড়ে খুব ছোটবেলায় মা-র কাছে একটা গান শিখেছিলাম 'সম্মুখে রাজা মেঘ করে খেলা'—এ গানটি কার রচনা তা জানিনা তবে খুবই গাইতাম। যখন আমার বছর পনেরো বয়স তখন একবার বরিশালে গিয়েছিলাম। একটি বন্ধু আমাকে নদীর ধারে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে শুনলাম আমারই সমবয়সী একটি ছেলে গান গাইছে। অপূর্ব লেগেছিল তার গান। পরবর্তী জীবনে সেই ছেলেটিই চলচ্চিত্র-জগতের বিখ্যাত সংগীত পরিচালক অনিল বিশ্বাস নামে পরিচিত হয়েছেন, বরাবরই গান-বাজনার দিকে আমার স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল কিন্তু নিয়মিত চর্চা করার সুযোগ হয়নি নানা কারণে।

৩। ভবানীপুর সাউথ সুবার্বান স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে সেন্ট জিভিয়ার্সে ভর্তি হই। তখন আমি কাঁসারিপাড়ায় থাকতাম। সেখানে একজন 'বারোয়ারী' পিসেমশাই ছিলেন। ভদ্রলোক তবলা বাজাতে খুব ভাল

বাসতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ কেউই তাঁর সংগে গাইতে রাজী হতনা। কিন্তু আমি গাইতাম, কারণ তিনি খুব খাওয়াতেন। খাওয়ার লোভে গাইলেও আমার একটা উপকার হয়েছিল—তাল-জ্ঞানটা পাকা হয়ে গিয়েছিল গোড়া থেকেই।

৪। ১৯৩২ সালের কথা—তখন আমি সেন্ট-জেভিয়ার্সে ফোর্থ ইয়ারে পড়ি। একদিন ক্লাসে পড়াবার



দ্বিজেন চৌধুরী

সময় একজন অধ্যাপক বললেন,—আমাদের কলেজ থেকে স্পোর্টস্, ডিবেট ইত্যাদি সব বিভাগেই ছাত্রেরা যোগ দেয়, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত 'ইণ্টার কলেজিয়েট মিউজিক কম্পিটিশানে' কোন ছাত্রই যোগ দেয়নি। কথাটা শোনার পরেই ঠিক করলাম সেই সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় যোগ দেবো। ভয়ে ভয়ে অধ্যাপক মশাইকে জানালাম [illegible]। কথাটা জানাজানি হতে দেরী লাগলো না। এবং শুনে সকলেই অবাক হয়ে গেল যে, আমি গান-বাজনার চর্চাও করে থাকি—ব্যাপারটা যেন অবিশ্বাস্য! যাই হোক বুক ঠুকে না হোক কপাল ঠুকে লেগে গেলাম। কম্পিটিসনে গাইলাম আধুনিক ও বাউল। আধুনিকে প্রথম ও বাউলে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলাম। মনে পড়ে ৺উমাপদ ভট্টাচার্য্য মশাই আমাকে কম্পিটিসনে গাইবার জন্য শিখিয়েছিলেন নজরুলের একটি বিখ্যাত গান 'কত আর এ মন্দির দ্বার হে প্রিয়'।

৫। ১৯৩৩ সালে বি, এস, সি পাশ করার পর গান-বাজনার দিকে বিশেষভাবে ঝোঁক দিলাম। ৺উমাপদবাবু আমাকে নিয়ে গেলেন হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে রেকর্ড করার জন্য। কিন্তু সুবিধা হ'লনা। সেনোলাতেও নিয়ে গেলেন। সেখানেও একই অবস্থা—মুসড়ে পড়লাম। হঠাৎ যোগাযোগ হয়ে গেল অনুপম ঘটকের সংগে।

৬। ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার প্রথম রেকর্ড 'তোমার আমার মাঝখানে' বাজারে বেরোলো হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানী থেকে, অনুপম ঘটকের পরিচালনায়। অনুপমবাবুর কাছে আমি এজন্য অত্যন্ত ঋণী। বছরখানেকের মধ্যেই আমি বেতারে যোগদান করার সুযোগ পাই। আমার দ্বিতীয় রেকর্ড 'আজি এ মাধবী রাতে' পাইওনিয়ার রেকর্ড কোম্পানী থেকে—হিমাংশু দত্ত সুরসাগর সুরযোজনা করেছিলেন গানটিতে—এই রেকর্ডের 'অলখ চামেলী' গানটি রচনা করেছিলেন শৈলেন রায়—আমি নিজেই সুর তৈরী ক'রে গেয়েছিলাম। এ গানটিই আমার সবচেয়ে প্রিয় গান, তবে জনপ্রিয়তা ও অর্থাগমের দিক থেকে কমল দাশগুপ্তের পরিচালনায় 'সহধর্ম্মিণী' ছবির গান 'জানিয়ে জানিয়ে মোর হৃদয় কারে চায়' সবচেয়ে বেশী সাফল্য লাভ ক'রে।

৭। ৺হিমাংশু দত্তের পরিচালনায় শচীন দেব বর্ম্মণের কয়েকটি গান সে-সময় খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। বাংলার অধিকাংশ তরুণ শিল্পীই তখন শচীনদেবের গান ও

রাইচাঁদ বড়ালের

ভুলের শেষে

ভারতী দেবী • কমল মিত্র
রেণুকা • প্রভা • অমর মল্লিক
কানু • তুলসী লাহিড়ী • নীতীশ
শ্যাম লাহা • বীরেন • হরিধন

পরিচালনা • অমর মল্লিক
সুরশিল্পী • রাইচাঁদ বড়াল

প্রাইমা
ফিল্মস্
রিলিজ

আমার
বধূজীবনে
চেয়েছিলাম
নারীত্বের সম্মান,
সে কি আমার
ভুল—অপরাধ?
সে কি আমার স্পর্দ্ধা!
তারই জন্যে আজ
আমি বিতাড়িতা,
কেউ করেছে আমার
চরিত্রে সন্দেহ,
কেউ দিয়েছে 'চোর' অপবাদ
কেউ বা এসেছে তার
কামনা আগুনে আমাকে
ধ্বংস করতে—

এক ভাগ্যহীনার জীবনে
বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত বেদনার
মর্ম্মন্তুদ কাহিনী.........

রূপবাণী
ভারতী
অরুণা

ও সহরতলীর অন্যান্য
চিত্রগৃহে একযোগে

পূজাবকাশের

পরেই শুভমুক্তি

(১০) আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার যদি কোন মূল্য থাকে তাহ'লে এ কথাই বলবো যে বাংলা গানের বর্ত্তমান ধারা বদলানোর একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, এবং যদি না বর্ত্তমান শিল্পী, সুরকার ও গীতিকাররা এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন তাহলে বাংলার সংগীত-জগতে হিন্দী ছায়াচিত্রের গানই চলতে থাকবে ও বাংলাদেশের ঐতিহ্যের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

(১১) যদিও বর্ত্তমানে শিল্পী ও শিল্পের মূল্য নির্দ্ধারণ করা হয়ে থাকে রেকর্ড বিক্রীর ওপর নজর রেখে, কিন্তু এর দ্বারা শিল্পী বা শিল্পের মান নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয় এবং উচিতও নয়। আশার কথা এই যে দু'-একজন তরুণ সুরকার ও গীতিকার নতুন পথের সন্ধান দিচ্ছেন আজকাল। কিন্তু

সুর-সাগরের সুর পছন্দ করতেন। আমিও বিশেষ ভক্ত ছিলাম এঁদের। আর আমার ভালো লাগতো ইন্দুবালার গান ও সায়গলের গাইবার ভঙ্গী। রবীন্দ্র-সংগীতের শিল্পীদের মধ্যে পঙ্কজবাবুই সবচেয়ে প্রিয়।

৮। রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদের কথা ও সুরই আমার অত্যন্ত প্রিয়। এঁদের বাদ দিলে আধুনিক সুরকারদের মধ্যে হিমাংশু দত্ত সুরসাগরের সুরই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে, কারণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সুরের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে তাঁর রচনায়। তাই তাঁর প্রত্যেকটি রচনাতেই নতুনত্ব পাওয়া যেত।

৯। গীতিকারদের মধ্যে ৺অজয় ভট্টাচার্য্যই আমার বিশেষ প্রিয়।

গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য্য, সুরকার হিমাংশু দত্ত এবং শিল্পী শচীনদেবের যোগাযোগে যে গানের সৃষ্টি হয়েছিল, ভবিষ্যতে তা আর হবে বলে মনে হয় না।

তাঁদেরও গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না। অচিরেই তাঁদের সৃষ্টি একঘেয়ে বলে মনে হবে।

আরেকটা কথা এ-প্রসংগে বলতে চাই। আবহ-সংগীতও শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের অনুকরণ বা ঐক্যতানের নামান্তর হলে চলবে না। আলাউদ্দিন খাঁ বা সুরেন দাস সম্পূর্ণ ভারতীয় রাগ-রাগিণীর ওপর আবহ-সংগীত রচনা ক'রে দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় পদ্ধতিতে আবহ-সংগীত রচনা করা অসম্ভব নয়। অবশ্য আমাদের দেশের ছায়াচিত্রে এদিকে অল্পই দৃষ্টি দেওয়া হয়। বোম্বাই বর্ত্তমানে এ-বিষয়ে সজাগ হয়েছে, কিন্তু পাশ্চাত্যের অনুকরণ দোষে দুষ্ট।

১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪০।৪২ সাল পর্য্যন্ত বাংলাদেশের সংগীতের মান অত্যন্ত উঁচুতে উঠেছিল, কিন্তু আজ সেটা কোথায় নেমে গেছে ও কিভাবে সেটাকে উন্নত করা যায় সেদিকে বাংলার বর্ত্তমান শিল্পী, সুরকার ও গীতিকারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১৪। এই সময় আমি প্রথম প্লে-ব্যাকে গান গাই চারু রায় পরিচালিত 'পথিক' চিত্রে—খুব সম্ভবতঃ ১৯৩৭ সালে। এর পর প্লে-ব্যাকে গেয়েছি আমি অনেক ছবিতে—তটিনীর বিচার, অমর গীতি, পাষাণ দেবতা, হিন্দুস্থান হামারা, কয়েদি, মানুষ, চৌরঙ্গী, পরিণীতা, রামানুজ, সহধর্ম্মিণী, মিলন, ছদ্মবেশ, অশোক, কালিদাস, দ্বন্দ্ব, কবীর, যোগাযোগ, গৃহলক্ষ্মী, বিরাজ বৌ, বনফুল, নীলাঙ্গুরীয় প্রভৃতি।

'পাষাণ দেবতা'র গানের কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে, তখন খুব অর্থকষ্টের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছি। হঠাৎ রাস্তায় দেখা অনুপম ঘটকের সংগে। তিনি আমাকে তখনই নিয়ে গেলেন 'পাষাণ দেবতা'র গান গাইবার জন্য। হঠাৎ অর্থাগমে যা উপকার হয়েছিল তা ভোলবার নয়।

রবীন্দ্র-সংগীতের প্রতি আমার বরাবরই আকর্ষণ ছিল। ১৯৪০ সালে পাইকপাড়ার রাজবাড়ীতে আমাকে নিয়ে যান অনাদি দস্তিদার মশাই। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সামনে 'এই তো ভাল লেগেছিল আলোর নাচন' গানটি গাইবার সৌভাগ্য আমার হয়। এ-দিনটির কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। অনাদিবাবুই আমাকে নিয়ে আসেন 'গীতবিতানে'। রবীন্দ্র-সংগীতের শিক্ষক হিসাবে আমি যোগদান করি। ইতিপূর্ব্বে 'সংগীত সম্মিলনীতে'ও আমি শিক্ষকতা করেছিলাম। এই সময়

অতুলপ্রসাদের এক নিকট আত্মীয়া শ্রীমতী আচার্য্যের উৎসাহে ও আনুকুল্যে অতুলপ্রসাদের গান শেখবার সৌভাগ্যও আমার হয়। বেতারের বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে উচ্চাঙ্গ-সংগীতও শিখতে আরম্ভ করি। পরবর্ত্তী জীবনে আমি রবীন্দ্র-সংগীত ও অতুলপ্রসাদের গানই বিশেষভাবে গাইতে সুরু করি, সেই কারণে অনাদিবাবু ও শ্রীমতী আচার্য্যের কাছেও বিশেষভাবে ঋণী।

দীর্ঘদিন বাংলাদেশের সংগীত জগতের সংগে আমি জড়িত। ৺উমাপদ ভট্টাচার্য্য, অনুপম ঘটক, অনিল বিশ্বাস ও ৺হিমাংশু দত্তর উৎসাহ ও প্রেরণার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। আমার শিল্পীজীবনে এঁদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী।

সাবিত্রী ঘোষ

(১) আমার জন্ম হোয়েছে ঢাকায় ১৯২২ সালে।



সাবিত্রী ঘোষ

(২) আমার পিতা হলেন মালখানগড়ের শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর। আমি পিতার একমাত্র কন্যা। যদিও আমার জন্ম ঢাকায় কিন্তু শৈশবেই চলে আসি কলকাতায় এবং আমার বাল্যজীবন কাটে চেতলায়। খুব ছোটবেলা থেকেই আমি মা-র কাছে গান শিখতাম, তিনি বেশ ভাল গান জানতেন। আমার বয়স যখন সাড়ে চার বছর, অর্থাৎ ১৯২৬ সাল, তখন চেতলা স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে প্রথম জনসভায় আমি গান গাই। আমার গানের সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজিয়েছিলেন আমার জেড়তুত দাদা। ইনি ছোটবেলায় আমায় গান শেখায় খুব উৎসাহ দিতেন।

(৩) মা ছাড়া আমার প্রথম গানের শিক্ষক হলেন শ্রীশচীন বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর কাছে আমি প্রায় তিন বছর গান শিখেছিলাম। তারপর কয়েক বছর নিজে নিজেই গান শিখতাম বাড়ীতে।

(৪) ১৯৩২ সালে 'সঙ্গীত সঙ্ঘে' যোগদান ক'রে বিখ্যাত সুরশিল্পী শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাছে ক্লাসিক এবং বাংলা গান শিখতে আরম্ভ করি। আট মাস শেখার পর ঐ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রেডিও-প্রোগ্রামে প্রথম রেডিওতে রাগ-সঙ্গীত গাই এবং এর পর থেকে নিয়মিতভাবে 'সঙ্গীত সঙ্ঘের' রেডিও-অনুষ্ঠানে যোগদান করি। তখন আমি রেডিওতে রাগ-সঙ্গীত গাইতাম।

(৫) এরপর ইচ্ছা হলো গান "রেকর্ড" করবার। ১৯৩৪ সালে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে গেলাম রেকর্ড করবার জন্য। কিন্তু বাসনা ফলবতী হলো না। আমার গান শুনে অনুপম ঘটক বললেন—গলা অত্যন্ত কচি, রেকর্ড ভাল হবে না আর কিছুদিন যাক্। ফিরে এলাম ভগ্ন আশা নিয়ে। যাক্, কি আর করা যায়। নাই বা হলো রেকর্ড করা, ভাল করে গান শিখি তাহলেই হবে। নতুন আশা এবং উদ্দীপনা নিয়ে সুরু করলাম সঙ্গীত সাধনা। আমার এই সাধনায় অনুপ্রেরণা

দিতেন আমার মা এবং বাবা। ১৯৩৪ সালে সঙ্গীত সঙ্ঘের প্রোগ্রাম ছাড়া রেডিওতে আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রোগামে অংশ পেয়েছি।

(৬) ১৯৩৬ সালে প্রথম আমার গানের রেকর্ড হয়। হেম সোম মহাশয় এইচ, এম, ভি প্রতিষ্ঠানে আমার গানের রেকর্ড করান। গান দু'খানি ছিল—"নিশীথে চলে" এবং "বেদনাতে বিজড়িত গান"। গানের সুর দিয়েছিলেন স্বর্গতঃ হিমাংশু দত্ত সুরসাগর। দ্বিতীয় রেকর্ডটি হয় নজরুল-গীতিকা, এইচ এম ভি-তেই, সে-গানের কথা ছিল 'বিদেশী তরী এলো কোথা হতে'। কথা ও সুর কবি নজরুলের। ১৯৩৯ সালে বেলতলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করি এবং ঐ বছরেই আমার বিবাহ হয়। এরপর কিছুদিন সঙ্গীতচর্চ্চা বন্ধ রাখতে হয় টাইফয়েড রোগের জন্যে। রোগমুক্তি হওয়ার পর আবার যথারীতি গান গাওয়া সুরু করি। এই সময় আমি ঢাকা বেতার কেন্দ্রে এবং কলকাতা কেন্দ্র থেকে গান গাইতাম। আমার শ্বশুরবাড়ী ঢাকায় ছিল, সেইজন্যে ঢাকায় থাকতে হোত, এবং ঢাকা কেন্দ্র থেকে গান করবার সুবিধা ছিল।

১৯৪১ সালে আমি হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে যোগদান করি। এখানে আমার প্রথম রেকর্ড হলো "চির বিরহী"—সুর দিয়েছিলেন জ্ঞান ঘোষ। এরপর যেসব রেকর্ড করি সেগুলি হচ্ছে—দুর্গা সেনের সুরযোজনায়—"আমার বসন্ত যে যায়" এবং আর একটি হিন্দী গান। কালিপদ সেনের সুরে—"এই কি আমার সময় হলো গো"। অনুপম ঘটকের সুরে—'বল আঁধার নিবিড়ে'। আমার নিজের দেওয়া সুরে একটি গানের রেকর্ড করি তার কথা হচ্ছে—"মোর সিঁথির সিমন্ত"। ১৯৪৬ সালে হীরেন বসুর সঙ্গে পরিচয় হয় এবং তাঁর দেওয়া কথা ও সুরে একটি রেকর্ড করি, তার কথা হচ্ছে—"ওগো মৌশুমী পাখী গো"। অনুপম ঘটকের সুরে বর্ত্তমানে জনপ্রিয় রেকর্ড "কাঙালের অশ্রুতে" ছাড়া আরও কয়েকখানি গানের রেকর্ড করেছি।

উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত ভাল করে শেখবার জন্যে ১৯৪৩ সালে সুখেন্দু গোস্বামী এবং গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কাছে গান শেখা সুরু করেছিলাম। ১৯৪৪ সালে আমি 'গীতশ্রী' উপাধি লাভ করি। এই সময় আমি 'সঙ্গীত ভারতী' এবং 'গীত বিতানে' যোগদান ক'রে গান শেখাতে আরম্ভ করি। আজও এখানে শিক্ষকতা করছি।

(৭) সুর শিল্পীদের মধ্যে আমার প্রিয় হলেন—শচীনদেব বর্ম্মণ, অনুপম ঘটক, দুর্গা সেন, স্বর্গতঃ সুধীরলাল চক্রবর্ত্তী।

(৮) যে সমস্ত গীতিকারের রচনা আমার ভাল লেগেছে তাঁদের মধ্যে আছেন—স্বর্গতঃ অজয় ভট্টাচার্য্য, হীরেন বসু, শৈলেন রায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার প্রভৃতি।

আমার গান করা পেশা নয়, নেশা বলতে পারেন। অর্থাৎ গান আমার উপজীবিকা নয়, গান গেয়ে আমার জীবনধারণ করতে হয় না। সেইজন্যে গান নিয়ে আমি

র‍্যাকসাদারা করি না। গান আমার ভাল লাগে তাই গান গাই। শুধু ভাল লাগে বললে ভুল হবে, গান আমার জীবনের সঙ্গী, আমার চলার পথে এনে দেয় অনুপ্রেরণা। পথের কাঁটায় যখন পদতল হয় রক্তাক্ত, অন্তর যখন হয় বেদনার্ত্ত তখন একমাত্র গানই আমায় দেয় সান্ত্বনা, আমার ক্ষতে প্রলেপ। গান আমার সাধনার বস্তু। আজও আমি নিয়মিতভাবে অনুপম ঘটক মহাশয়ের কাছে সুরের সাধনা করি।

(১১) রেকর্ড কোম্পানীর শিল্পীর মূল্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে বলতে গেলে [illegible] যে—রেকর্ড কোম্পানীর যে [illegible] সব শিল্পীর বেলায় সমান এবং প্রযোজ্য, তার কোন তারতম্য নেই। রেকর্ড কোম্পানী ছায়াচিত্রের গানের জন্য রয়ালটি বা কমিশন দেন শতকরা পাঁচ টাকা আর অন্যান্য গানের জন্য (ছায়াছবির গান ছাড়া) দেন শতকরা সাড়ে সাত টাকা।

(১২) আমার কোন্ গানটি অথবা কোন্ রেকর্ডটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তা' বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে জনপ্রিয়তার দিক থেকে বলতে গেলে "আমার বসন্ত যে যায়" রেকর্ডটি এবং সাম্প্রতিক 'কাঙালের অশ্রুতে' রেকর্ডটি খুব জনসমাদর লাভ করেছে।

(১৪) আমি ছায়াচিত্রে প্রথম প্লে-ব্যাকে গান গেয়েছি ৺অজয় ভট্টাচার্য্য পরিচালিত "ছদ্মবেশী" ছবিতে। অজয় ভট্টাচার্য্য এবং শচীনদেব বর্ম্মণ-এর আগ্রহেই আমি "ছদ্মবেশী"তে প্লে-ব্যাকে যে গানটি গেয়েছিলাম তার কথা হলো—"আজিকে মধুবনে শ্যামল বধূ সনে"। সুর দিয়েছিলেন শচীনদেব বর্ম্মণ। আমি যে সমস্ত ছবিতে প্লে-ব্যাক করেছি তার মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য। "শ্রীতুলসীদাস", "বনঝাপে"—সুর-সংযোজনা করেন অনুপম ঘটক। "মন্ত্রমুগ্ধ"—সুর দেন রাইচাঁদ বড়াল। "সঙ্কল্পী"—সুর দুর্গা সেন। আমি প্লে-ব্যাক গান খুব বেশী করিনি। কারণ প্লে-ব্যাক করবার জন্যে কাউকে কোনদিন পেড়াপীড়ি অথবা খোশামোদ করিনি। যখন কোন সঙ্গীত-পরিচালক আমাকে প্লে-ব্যাক গান করতে বলেছেন তখনই সেখানে গান করেছি।



হিন্দী চিত্রজগতের একদার জনপ্রিয় তারকা
শ্রীমতী সুরাইয়া ঃ তাঁর অভিনীত অনেকগুলি
চিত্র বর্ত্তমানে মুক্তি-প্রতীক্ষায় আছে



ট এণ্ড ফিল্মস্ পরিবেশিত মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'মীমাংসা' চিত্রে
পিন মুখোপাধ্যায় ও প্রমীলা ত্রিবেদী

দিলীপকুমার রায়

১। ১৬ই বৈশাখ, ১৩২৪ (ইং ২৯শে এপ্রিল, ১৯০৭) সালে আমার জন্ম।

২। জন্মস্থান—ভালাবাড়ী, পাবনা; দেশ ফরিদপুর। কান্তকবি শ্রীরজনীকান্ত সেনের দৌহিত্র। পিতা শ্রীসত্য রঞ্জন রায় রসায়নবিদ। দি কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ কোং লিঃ-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

৩। সায়েন্স গ্রাজুয়েট। মিত্র ইন্সটিটিউসন থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিই এবং তারপর সেন্ট জেভিয়ার্স ও সিটি কলেজে অধ্যয়ন করি। পেশা—রাসায়নিক; আর নেশা—দেশ ভ্রমণ। সমস্তরকম খেলাধূলাতেই প্রগাঢ় অনুরাগ আছে। ছাত্রজীবনে ভাল খেলোয়াড় এবং ক্রীড়াবিদ ছিলাম।

৪। ছোটবেলায় মায়ের কাছে এবং দাদা শৈলেন্দ্র-নাথ সেন (জাপানী)-র কাছে সঙ্গীতের হাতেখড়ি হয়। শ্রীসুকৃতি সেনের কাছেই বিশেষভাবে শিক্ষাগ্রহণ করি। আমার সমস্ত খ্যাতির অন্তরালে আছে তাঁর শিক্ষা; এছাড়া কাজী নজরুল ইসলাম, ৺হিমাংশু দত্ত (সুরসাগর), সমরেশ চৌধুরী, বীরেন ভট্টাচার্য্য, শৈলেশ দত্তগুপ্ত প্রমুখ সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে আমি বহু গান এবং সঙ্গীতের টেকনিকের শিক্ষাগ্রহণ করেছি। এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি গভীরভাবে ঋণী।

৫। শ্রীসুকৃতি সেনের সহায়তায় সেনোলা রেকর্ড প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিচয় হয়। তারপর অডিশন দিয়ে কর্তৃপক্ষকে খুশী করে আমি রেকর্ড করবার অধিকার লাভ করি।

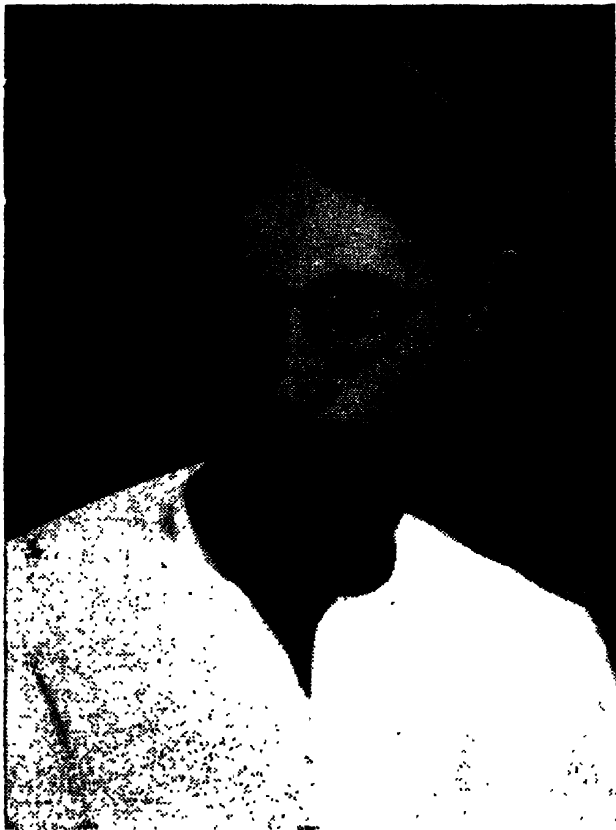
৬। শ্রীসুকৃতি সেনের পরিচালনায় সর্ব্বপ্রথম রেকর্ড করি।

৭। শ্রীসুকৃতি সেন এবং ৺হিমাংশু দত্ত (সুরসাগর)।

৮। ৺অজয় ভট্টাচার্য্য।

৯। সন্তোষ সেনগুপ্ত, সমরেশ চৌধুরী ও সুচিত্রা মিত্রকে।

১০। রেকর্ড শিল্পীদের সম্বন্ধে আমার সবচেয়ে বড় কথা এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা নিজস্ব ষ্টাইল বা ভঙ্গী রচনা করেন না। গতানুগতিক ঢং এবং অনেক সময়েই অন্তকারো অনুকরণ প্রবৃত্তিই বেশী প্রকট হয়ে পড়ে। অবশ্য সুরের এবং বাণীর একঘেয়েমিও তার জন্য অনেকাংশেই দায়ী—তবু শিল্পীদের নিশ্চেষ্টতাও কম দায়ী নয়। দ্বিতীয়তঃ মাইক্রোফোনে গান শ্রুতিমধুর শোনানোর জন্য তাঁরা স্বাভাবিক স্বরকে এত মৃদু করে



দিলীপকুমার রায়

আনেন যে অনেকক্ষেত্রে তাঁদের গান বিনা মাইক্রোফোনে মাত্র দু' হাত দূর থেকেও শোনা যায় না, যার ফলে স্বরে ক্রমশঃই বিকৃতি দেখা দিচ্ছে।

১১। কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত একটি নির্দ্ধারিত পারিশ্রমিক শিল্পীদের জুটতো, সে রেকর্ড একখানাই বিক্রি হোক আর একলাখ। টাকা যে সামান্য তা বলাই বাহুল্য বিশেষ করে নতুন শিল্পীদের [illegible] জনপ্রিয় অভিজ্ঞ শিল্পীরা অবশ্য ইচ্ছা করলে শতকরা ৫ টাকা হারে রয়ালটি পেতে পারতেন, তবে আধুনালুপ্ত 'শিল্পী-সমিতির' হস্তক্ষেপে শিল্পীরা এখন ৭-১১২% হিসাবে রয়ালটি দাবী করতে পারেন সে শিল্পী নতুনই হোন ব' পুরনোই হোন।

সাধারণতঃ মিষ্টি গলা, সুরে এবং তালে গাইবার ক্ষমতা থাকা চাই। তবে শিল্পীর নিজস্ব ঢং বা সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তির বিশেষ প্রয়োজন হয়ে থাকে। রেকর্ডে কণ্ঠের শ্রুতি-মধুরতা অবশ্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।

১২। জনপ্রিয়তা ও আয় উভয়দিক থেকে "তোমায় আমায় দেখা হবে, অশ্রু নদীর তীরে" গানটিই আমার শ্রেষ্ঠ গান।

১৩। চলচ্চিত্রের কথা বলতে পারবো না। কারণ গত দু'বছরের মধ্যে কি দেশী কি বিদেশী কোন ফিল্ম দেখবার সৌভাগ্যই আমার হয় নি। রেকর্ড সম্পর্কে বক্তব্য এই যে—রেকর্ডে আবহ-সঙ্গীত তার স্থান পরিবর্ত্তন করেছে। আগে ছিল গানকে শ্রুতিমধুর করা আবহ-সঙ্গীতের কাজ। এখন আবহ-সঙ্গীতই বড়ো। আসল গানকে পাদপূরণ করে চলেছে। বোধ করি চলচ্চিত্রের প্রভাবেই এমনটি হয়েছে।

১৪। উল্লেখযোগ্য এমন কিছু প্লে-ব্যাক করিনি, কারণ আসলে আমি একজন বেতার ও রেকর্ড শিল্পী এবং এদের সংশ্লিষ্ট পরিবেশই থাকতে বেশী ভালবাসি, তবে বহু পূর্ব্বে দু' চারটি বাংলা ও হিন্দী ছবিতে প্লে-ব্যাকে গেয়েছি, তার মধ্যে—'নিমাই সন্ন্যাস', 'চাম্বে-দি-কলি' উল্লেখযোগ্য। সুদূর অতীতে এন্-টির 'প্রতিবাদ' (বাংলা ও হিন্দী) ছবিতে প্লে-ব্যাক করেছি।

শচীন গুপ্ত

১। ১৯২২ সালের মে মাসে দক্ষিণ কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে আমার জন্ম হয়।

২। আমার বাবা ডাঃ বিজয়কৃষ্ণ গুপ্ত ভবানীপুর অঞ্চলের একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক। জনপ্রিয় অভিনয়-শিল্পী বিপিন গুপ্ত আমার আপন কাকা।

৩। পদ্মপুকুর ইন্সটিটিউসন থেকেই আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। পরে অবশ্য লেখাপড়া বেশীদূর

করার সুযোগ ঘটে নি। বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীতের প্রতি আমার একটা ঝোঁক ছিল। তখন অবশ্য ভাবতেও পারি নি যে ভবিষ্যতে এটাই আমার পেশা হয়ে দাঁড়াবে।

৪। সঙ্গীতশাস্ত্রে আমার হাতে-খড়ি হয় পিতার কাছেই। তিনিই আমাকে প্রথমে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। পরে নগেন দত্ত ও ওস্তাদ ছোটে খাঁর কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখি। উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত শিখলেও প্রতি রবিবার বেতারে সঙ্গীত শিক্ষার আসরে পঙ্কজবাবু যেসমস্ত আধুনিক গান ও ভজন শেখাতেন তাও আমি শিখতাম। আধুনিক গান আমি কোনো সঙ্গীতজ্ঞের কাছে শিখিনি, নিজের চর্চাতেই হয়েছে। আধুনিক গানে পঙ্কজবাবুকেই আমি 'সঙ্গীতগুরু' বলে মনে করি।

৫। সত্যি কথা বলতে কি, রেকর্ড-জগতে আসার জন্য আমি শিল্পী সত্য চৌধুরীর কাছে ঋণী। তিনিই আমাকে প্রথম রেকর্ড-জগতে নিয়ে আসেন। ১৯৪২ সালে হিজ মাষ্টার্স ভয়েস কোম্পানীতেই আমি প্রথম রেকর্ড করি।

৬। আমার প্রথম রেকর্ড হোল গোপেন মল্লিকের সুরযোজনায় 'তুমি কি উঠেছো চাঁদ' গানটি। এটি রচনা করেন প্রণব রায়।

৭। সুরকারদের মধ্যে যাঁদের সুর আমাকে মুগ্ধ করে তাঁরা হলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক, নৌসদ, রবীন চট্টোপাধ্যায়, অনুপম ঘটক ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

৮। গীতিকারদের মধ্যে আমার প্রিয় হলেন—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, শ্যামল গুপ্ত ও শৈলেন রায়।

৯। সমসাময়িক রেকর্ড-শিল্পীদের মধ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, উৎপলা সেন ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে আমার ভালো লাগে।

১০। রেকর্ড-শিল্পীদের সম্বন্ধে কিছু না বললে অন্যায় হবে। রেকর্ড-শিল্পীদের মূল্য ছেঁড়া কাগজের মত। সমস্ত অন্যায়-অবিচার নিরুপায় হয়েই তাঁদের সহ্য করতে হয়।

১১। রেকর্ড কর্তৃপক্ষ শিল্পীর মূল্য নির্দ্ধারণ করেন তাঁদের প্রাপ্তিযোগের অঙ্কের কথা বিবেচনা ক'রে। সেখানে সঙ্গীতশিল্প বা কণ্ঠমাধুর্য্য বা কৃতিত্ব নিতান্ত গৌণ। দৈবক্রমে বা ঘটনাচক্রে শিল্পীর রেকর্ড যে কোনও কারণেই হোক বেশী বিক্রী হলেই তিনি সবচেয়ে গুণী শিল্পী তাঁদের চোখে। কাজেই শিল্পীর গুণপনা ওঠে পড়ে। তাঁর বাজার দরের ওঠাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে। ব্যবসা ছাড়া কোম্পানী আর কিছুই বোঝেন না।

১২। আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রেকর্ড কোনটি তা' শ্রোতারাই বলতে পারেন। তবে আয় এবং জনপ্রিয়তা উভয়

দিক থেকেই 'সারা রাত জলে সন্ধ্যা প্রদীপ' গানটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

১৪। আমার প্রথম প্লে-ব্যাক হলো ১৯৪৬ সালে জনপ্রিয় সঙ্গীত-পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'পরভৃতিকা' কথাচিত্রে। এ ছাড়া আজ পর্য্যন্ত আমি যে সমস্ত চিত্রে প্লে-ব্যাক করেছি তার তালিকায় আছে—শৃঙ্খল, এ যুগের মেয়ে, বাঁকা লেখা, যুগদেবতা, অভিমান, দিগভ্রান্ত, মালা (হিন্দী), আজাদীকে বাদ (হিন্দী), ২৫শে জুলাই (হিন্দী), পণ্ডিতমশাই, নষ্টনীড়, বসু পরিবার, তুলসীদাস, অনন্যা, আলাদীন ও আশ্চর্য্য প্রদীপ, দিগন্তের ডাক, প্রতিবাদ, স্বপ্ন ও সমাধি, সাত নম্বর কয়েদী প্রভৃতি।

ভারতী বসু

[ভারতী বসুর উত্তর আমরা অত্যন্ত বিলম্বে পেয়েছি। কাজেই আমরা তাঁর বিরুদ্ধেনিরুত্তরতার যে অভিযোগ গোড়ায় করেছি তা' এখানেপ্রত্যাহৃত হচ্ছে]

১। আমার জন্ম ১৯২০ সালের ১৩ই অক্টোবর।

২। আমার পিতার নাম ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ মজুমদার। আমার জ্যেঠামহাশয় শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। ইনি কলিকাতা রেডিওর প্রথমদিকে প্রোগ্রাম-ডাইরেক্টর ছিলেন এবং একজন নামকরা ক্ল্যারিওনেট-বাদক। ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশানে পাঠকালে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়।

৪। সত্যিকারের গুরু আমি কাউকেই বলতে পারি না। আমার জ্যাঠামহাশয় রেডিওতে থাকায় তখনকার দিনের সব সঙ্গীত-পরিচালকই আমাদের মির্জ্জাপুরের বাড়ীতে আসতেন। তাঁদের সকলের কাছেই আমি গান শিখেছি। এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন শৈলেশ দত্তগুপ্ত, পঙ্কজবাবু ও রাইবাবু।

৫। আমাদের বাড়ীর সকলেরই গানের প্রতি খুব ঝোঁক ছিল। গান আমাদের স্বভাবের অঙ্গ ছিল। আমার যখন আট বছর বয়স তখন আমি প্রথম রেডিওতে গান গাই। আমার যখন তেরো বছর বয়স তখন আমি তৎকালীন বিখ্যাত সঙ্গীত শিক্ষালয় 'বাসন্তী বিদ্যা বীথি'তে ভর্ত্তি হই। সেই সময় থেকেই আমি সঙ্গীত-জগতে পরিচিত হই। ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ সালে 'নাহার' ও ভুপেন বোসের সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় কীর্ত্তন, ভজন, ভাটিয়ালি ও বাংলা গানে প্রথম হই। ক্লাসিকাল গান আমার বিশেষ ভালো লাগে না। সেজন্য কিছুদিন বাদেই ক্লাসিকাল গান ছেড়ে দিই। কীর্ত্তনই আমার সব থেকে ভালো লাগে। রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমি প্রথম কীর্ত্তন গান শিক্ষা করি। বিবাহের পর কিছুকাল গান বন্ধ রাখি। পরে ১৯৪৩ সালে বোম্বাই যাওয়ার পর পুনরায় এই লাইনে আসি।

৬। শৈলেশ দত্তগুপ্তর তত্ত্বাবধানে গান রেকর্ড করার ব্যবস্থা হ'লে আমি প্রথম কলম্বিয়ায় চারখানি ভাটিয়ালি ও কীর্ত্তন গান রেকর্ড করি। এই সময়ে আমার বয়স দশ থেকে এগারোর মধ্যে। প্রধানতঃ আমার জ্যেঠামহাশয়ের উৎসাহেই আমি রেকর্ড ও রেডিও-জগতে আসি।

৭। পঙ্কজবাবুকে সুরকার হিসাবে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে।

৮। শৈলেন রায়কে গীতিকার হিসাবে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে।

৯। সমসাময়িক রেকর্ড শিল্পীদের মধ্যে হেমন্ত

এমেচার ফটোগ্রাফী ঃ



আঁধার রজনী আসিবে এখনি মেলিয়া পাখা
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক পড়িবে ঢাকা

ফটো : গৌরবরণ ভট্টাচার্য্য

মুখোপাধ্যায় ও সুপ্রভা সরকারকে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে।

১০। কল্যাণী মজুমদার, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, গায়ত্রী বোস, সুচিত্রা মিত্র, সুপ্রীতি ঘোষ—এঁদের গানও আমার খুব ভালো লাগে।

১১। শিল্পীর মূল্য নির্দ্ধারণে রেকর্ড কর্তৃপক্ষের বিশেষ কোনো মানদণ্ড নেই। শিল্পী ইচ্ছানুযায়ী 'রয়াল্টী' অথবা 'ফ্ল্যাট পেমেন্ট' গ্রহণ করতে পারেন।

১২। আমার 'বাস্তুহারা' গানটি জনপ্রিয়তার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ গান। 'অভিনয় নয়' কথাচিত্রের 'অভিনয় নয়' গানটি আয় ও জনপ্রিয়তা উভয় দিক থেকেই শ্রেষ্ঠ।

১৪। বোম্বাই থাকাকালে আমি প্রথম প্লে-ব্যাক করি বাংলা 'বিচার' ছবিতে। "রূপোর খাটে ঘুমিয়ে ছিলাম" ও "চম্পাবতী" এই দুইখানি আমার প্রথম প্লে-ব্যাকের গান। তার পর থেকে আমি বহু ছবিতে প্লে-ব্যাক করেছি : (১) বিচার, (২) পরায়া ধন, (৩) সরাফৎ, (৪) ইন্‌কার (৫) কাদম্বরী, (৬) কালিদাস (৭) মীনা, (৮) লেডী ডক্টর, (৯) অভিনয় নয়, (১০) বিশ বছর আগে, (১১) তিলোত্তমা, (১২) রক্তের টান, (১৩) ১০৯ ধারা, (১৪) শ্যামলের স্বপ্ন, (১৫) রূপকথা, (১৬) কাঁকনতলা লাইট রেলওয়ে, (১৭) এ যুগের মেয়ে, (১৮) মহাসম্পদ, (১৯) সহসা, (২০) ছানাবাড়ী, (২১) কৃষ্ণকান্তের উইল, (২২) মাকড়সার জাল, (২৩) তরুণের স্বপ্ন, (২৪) সতী অহল্যা, (২৫) আবু-হোসেন, (২৬) মহারাজা নন্দকুমার, (২৭) [illegible] (২৮) পঞ্চায়েৎ, (২৯) সহযাত্রী, (৩০) সাধারণ মেয়ে, (৩১) জগন্নাথ (উড়িয়া), (৩২) অভিযোগ, (৩৩) সাহসিকা ও আরও অনেক ছবিতে প্লে-ব্যাক করেছি।

ছবির প্রচার ★ ★ ★

●●● ভবানী রায়

সাধারণ বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যাকে আমরা ইংরাজীতে বলে থাকি 'কমার্সিয়াল এ্যাডভারটাইজিং'— আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা অন্যান্য দেশের তুলনায় এখনও অনেকখানি পিছিয়ে আছেন। বিনা প্রতিবাদেই একথা মেনে নেওয়া যেতে পারে। সিনেমার ক্ষেত্রে একথা আরও ভয়াবহভাবে সত্য। যেদেশে পণ্যদ্রব্য-নির্মাতারা এবং বড় বড় ব্যবসায়ীরা এখনও বিজ্ঞাপনের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে আদৌ সচেতন নন, সে দেশের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা যে এর মূল্য একেবারেই অস্বীকার করবেন, সে বিষয়ে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অথচ আর পাঁচটা পণ্যদ্রব্যের (ইংরাজীতে যাকে আমরা বলে থাকি consumers goods) মতো চলচ্চিত্রও ঠিক একটি পণ্যদ্রব্য এবং চাহিদা ও সরবরাহের প্রাথমিক নিয়মের দ্বারা চলচ্চিত্রের চাহিদা ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। পণ্যদ্রব্য অনেক সময় পাইকারীভাবে বিক্রী হয়ে থাকে, কিন্তু ছবির ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। কাজেই চলচ্চিত্রে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা কিম্বা এর যথাযথ মূল্যকে স্বীকার না করা মানেই চলচ্চিত্রের একটি বিশেষ দিককে উপেক্ষা করা। আজকের দিনে আমাদের দেশে এই শিল্পটি যে-স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখানে একদিকে রয়েছে যেমন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে দর্শকচিত্তে আবেদন সৃষ্টি করার অপরিহার্যতা এবং সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত প্রচার-ব্যবস্থা ভিন্ন চলচ্চিত্রকে জনপ্রিয় করে তোলার আর কোনো উপায় নেই। ছবির জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করা মানেই এর চাহিদা বৃদ্ধি করে দেওয়া।

যে-দেশে সাধারণ কমার্শিয়াল বিজ্ঞাপনই সবে মাত্র তার শৈশবের অপরিণত অবস্থা অতিক্রম করে কিছু ষ্ট্যাণ্ডার্ড অর্জন করেছে সেদেশে সিনেমার বিজ্ঞাপন যে [illegible] ও অবজ্ঞাত হবে তাতে আমি খুব বিস্ময় বোধ ... আমার বিস্ময়ের কারণ সেইখানেই যেখানে দেখি চিত্র-ব্যবসায়ীগণ এই প্রয়োজনীয় বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে একেবারে উদাসীন থাকেন। তাঁদের এই ঔদাসীন্যকে আমি criminal negligence বলতে পারি এবং এরকম কঠিন কথা বলার হেতু এই যে তাঁরা যদি গোড়া থেকে সিনেমার বিজ্ঞাপনের প্রকৃত গুরুত্বকে অবহেলা না করতেন তাহলে ভারতের চলচ্চিত্রশিল্পটির বিজ্ঞাপনের দিকটা আরও উজ্জ্বল ও সার্থক হতে পারতো। এর মধ্যে অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়, তবে সে ব্যতিক্রম এমনই স্বল্প এবং তার পরিকল্পনার ক্ষেত্র এমনই সংকীর্ণ যে সর্বভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রগতিতে তার প্রতিক্রিয়া আমরা খুব সামান্যই উপলব্ধি করতে পারি। অথচ তাঁরা এ কথাটা ভুলে যান যে যদি বিজ্ঞাপনের দিকটা, প্রচারের দিকটা ঠিকমতো গড়ে উঠতে পারতো তাহলে হয়তো ভারতীয় চিত্রের জন্য বিদেশেও চাহিদা সৃষ্টি করা যেতে পারতো এবং লাভ ও মর্যাদার দিক থেকে সেটা বড় কম কথা নয়। ভারতের ছবি ভারতের বাইরে প্রদর্শিত হবার পক্ষে অন্যান্য বাধার মধ্যে সবচেয়ে বড় বাধা তো এইখানেই—এই বিজ্ঞাপন-ব্যবস্থা ও প্রচার-নীতির সংকীর্ণতার মধ্যে। কোনো ভারতীয় প্রযোজকই আজ পর্যন্ত সিনেমার বিজ্ঞাপনকে যথার্থ বিজ্ঞাপন হিসেবে দেখতে চাইলেন না। খণ্ডিত ভারতে ভারতীয় চিত্রের প্রদর্শন তো সীমাবদ্ধ। এমন অবস্থায় ব্রহ্মদেশ, সিংহল, দক্ষিণ পূর্ব এসিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় চিত্র প্রদর্শনের যে সুযোগ রয়েছে তাকে আরও কার্যকরী করে তুলতে পারে একমাত্র সুপরিকল্পিত প্রচার ব্যবস্থা। প্রদর্শনের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করে তুলতে না পারলে, ভারতীয় চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতি সুদূরপরাহত। হলিউডের দৃষ্টান্তকে আমাদের চোখের সামনে রেখে, সিনেমার বিজ্ঞাপনের এই দিকটা সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করবার দিন আজ এসেছে বলেই আমার মনে হয়।

বর্তমান পৃথিবীতে প্রচারবিজ্ঞানের অমোঘ শক্তি সর্বত্র স্বীকৃত। দৈনন্দিন জীবনের এমন একটি ক্ষেত্র নেই যেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিজ্ঞাপন তার কাজ না করে চলেছে। বিভিন্ন শিল্পের জয়রথ ছুটে চলেছে এই

বিজ্ঞাপনকে ইসারথী করে—এ কথা আজ আর আমাদের প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। একদেশের পণ্য অন্য দেশের বাজার দখল করেছে একমাত্র বিজ্ঞাপনের দৌলতেই। এককথায়, বিজ্ঞাপন ভিন্ন আজকের দিনের পৃথিবী অচল, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অচল। কাজেই প্রচার-বিজ্ঞান আজ আর অবহেলার জিনিষ নয়, বাজে খরচ বলে অবজ্ঞাত হবার বিষয় নয়—আজকের দিনের বিজ্ঞাপন এককথায় ইনভেস্টমেণ্ট, ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেণ্ট বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রচার-বিজ্ঞানের নানাদিক আছে এবং বর্তমানে তা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছে। যেমন পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের রীতি-নীতির পরিবর্তন ঘটছে, পণ্যদ্রব্য ব্যবহারের রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটছে, তেমনি পরিবর্তন ঘটছে বিজ্ঞাপনের ধারায়, এর ষ্টাইলে ও টেকনিকে। বর্তমানের মানুষের জীবনে যদি কোনো বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকে, তবে তা হলো বিজ্ঞাপন। আজকের দিনের মানুষের প্রতিদিনের গতিবিধি পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এর দ্বারা — এমনি অমোঘ অথচ অদৃশ্য শক্তিশালী এই প্রচার-বিজ্ঞান।



চিত্রভারতীর প্রথম নিবেদন 'ভোর হ'য়ে এলো' ছবিতে মধ্যবিত্ত সংসারের লাঞ্ছনাময় জীবন-নাট্যের হৃদয়াবেদনময় রূপায়নে অভি ভট্টাচার্য্য ও প্রণতি ঘোষ

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপনের এই রূপটির সঙ্গে পরিচিত হয়েও একে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। সাধারণ বিজ্ঞাপনদাতাদের কথা আমার আলোচনার বিষয় নয় — সিনেমার বিজ্ঞাপনের কথাই আমার বক্তব্য। এখনকার দিনে আমরা দেখতে পাই যে চিত্র-প্রযোজকরা চিত্র নির্ম্মাণে এত বেশী খরচ করে বসেন যে একটা ছবি থেকে কি পরিমাণ লাভ হবে সেটা জানবার আগেই এই খরচের বোঝা গিয়ে পড়ে চিত্র-পরিবেশকদের ঘাড়ে।

এই অবস্থায় চিত্র-পরিবেশকের সামনে এ[illegible] পথই খোলা থাকে—সে পথ ব্যাপকতম প্রদর্শনের পথ। এবং এর জন্যে দরকার বৃহত্তম প্রদর্শনের ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্র সকল ছবির পক্ষে হয়ত সুলভ নয়—কিন্তু

সুপরিকল্পিত প্রচারকার্য্যের সহায়তায় তার অনেকটাই যে সহজলভ্য হতে পারে—একথা পরিবেশকরা যতদিন না ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারছেন, ততদিন প্রযোজকের দায় পরিবেশককে বহন করতেই হবে এবং তার ফল কি দাঁড়াতে পারে, চলচ্চিত্রের বর্তমান দুরবস্থাই তার সাক্ষ্য বহন করছে। ব্যাপকতম ক্ষেত্রে চিত্রের পরিপূর্ণ প্রদর্শন সম্ভব একমাত্র সুষ্ঠু বিজ্ঞাপনের সাহায্যে। এখন এই বিজ্ঞাপনের এই নূতন ধারাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করার মানে ব্যবসার প্রসারকে নষ্ট করে দেওয়া। ছবির নিজস্ব দোষ-গুণ থাকবেই—যেমন সব পণ্যদ্রব্যেরই থাকে। কিন্তু বিজ্ঞাপনের সাহায্যে সেই ছবির দোষগুণ কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে—কি উপায়ে ছবিকে দর্শকচিত্তে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দেওয়া যেতে পারে—সেটার ওপরই নির্ভর করছে আজকের দিনের চলচ্চিত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ। অনেক প্রযোজকের একটা ভুল ধারণা আছে এই যে ছবির বিজ্ঞাপন গতানুগতিকতাবর্জিত হবে না—একই ধাঁচে চলবে। কিন্তু সব ছবির বিষয়বস্তু যেমন এক রকমের নয়, তেমনি সব ছবির বিজ্ঞাপনও একধাঁচের হতে পারেনা এবং হওয়া উচিতও নয়। একই শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের মধ্যে ব্যবসার ক্ষেত্রে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমরা লক্ষ্য করি, তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষ্য করি তাদের বিজ্ঞাপনের ধারার মধ্যে। ছবির বেলাতেও এই নীতি সর্বাংশে প্রযোজ্য।

আসল কথা ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখেই ছায়াছবির প্রচার-ব্যবস্থা সম্পর্কিত নীতি আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং প্রত্যেকটি ছবির বিজ্ঞাপনের ধারাকে উন্নততর করতে হলে সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে একে দাঁড় করাতে হবে। তা নইলে বর্তমানে যে ধারার ছবির বিজ্ঞাপন চলেছে, এই ধারা যদি আর কিছুকাল চলে, তবে ছবির বাজারে ছবির ক্রেতা অর্থাৎ উৎসাহী দর্শক ভবিষ্যতে খুব যে সুলভলভ্য হবে না, এ কথা আমি জোরের সঙ্গেই বলতে পারি। ভারতীয় ছবির মান উন্নত হয়েছে, কিন্তু তার প্রচার ব্যবস্থার মান উন্নত হওয়া দূরে থাক—স্ট্যাণ্ডার্ড বলে কোনও জিনিষই নেই।

আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলবার আছে। ছবিকে যখন বলা হয় চলচ্চিত্র অর্থাৎ motion picture তখন বুঝতে হবে এ জিনিষটা অত্যন্ত গতিশীল এবং যে জিনিস গতিধর্মী, তার প্রচার-ব্যবস্থাও গতিধর্মী অথাৎ dynamic হওয়া উচিত। কিন্তু প্রভাতী সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠাব্যাপী সিনেমা-বিজ্ঞাপনগুলি এমনই static মনে হয় যে, দর্শক-চিত্তে সেসব প্রচুর ব্যয়বহুল বিজ্ঞাপন না পারে কৌতূহলের সৃষ্টি করতে, না পারে আবেদন জাগাতে। ফলে, বিজ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, এই দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন হয়েই, বর্তমানে সিনেমা বিজ্ঞাপনের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন যে একান্ত আবশ্যক, সেকথা আমরা যতশীঘ্র বুঝতে পারি, এই শিল্পের পক্ষে ততই মঙ্গল। চিত্র-নির্মাতারা যে পরিমাণ অর্থ শিল্পীদের জন্য ব্যয় করে থাকেন, সেই অনুপাতে তাঁরা ছবির বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হন। শুধু কুণ্ঠিতই নন গতানুগতিকতার পথ ছেড়ে, প্রচার-বিজ্ঞানের আধুনিক টেকনিকে বিজ্ঞাপন করা সম্পর্কে তাঁরা আদৌ আগ্রহ প্রকাশ করেন না। অথচ পুরাতন ধারা বর্জন করে নূতন ধারায় ছবির বিজ্ঞাপন করতে পারলে যে লাভ বই লোকসান হয় না, তারও দৃষ্টান্ত দু'-একটি ছবির বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে। কাজেই চলচ্চিত্রকে আরও অর্থকরীভাবে সফল করে তুলতে হলে, এর প্রচারের দিকটাকে আরও সবল করে তুলতে হবে।



⁘ চতুরঙ্গ ⁘

চিত্রজগতের রূপসজ্জার বাইরে বিচিত্র বেশে ও ভঙ্গীতে
বাংলা চিত্রজগতের নবীনা নটীর দল ঃ

নীলিমা দাশ, মঞ্জু দে,
অনুভা গুপ্তা ও দীপ্তি রায়

ফটো : ইউনিভার্সাল আর্ট গ্যালারি



দীপ পিকচার্সের প্রাথমিক চিত্র নিবেদন 'প্রতীক্ষা'য়
মতী সিপ্রা দেবী

মার্লিন ডিয়েট্রিক

(১১২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

জার্ম্মানী আর আমেরিকা—দু'টি যেন বিভিন্ন জগৎ—দু'টি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। শান্ত সমাহিত জীবনে অভ্যস্ত মার্লিন সহসা ছিটকে এসে পড়ে তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত উচ্ছৃঙ্খলতার মাঝে। তবু তারই ভেতরে বাইরের কল-কোলাহিত জগতের বেষ্টন এড়িয়ে ওর শিল্পী-মন রচনা করে সুন্দর একটি পরিবেশের নিভৃতি।

হলিউডে মার্লিনের প্রথম ছবি—'মরক্কো', গ্যারী-কুপারের সঙ্গে, স্টার্ণবার্গের পরিচালনায়। আবার গুরু-শিষ্য সম্মেলন। অদ্ভুত দ্রুতির মাঝে কাজ এগিয়ে চলে। অতুল অধ্যবসায় আর চরম পরিশ্রমের ভারে দুস্ত দিন-গুলো। তবু কিন্তু ভালো লাগে মার্লিনের, ভালো লাগে সকাল থেকে রাত অবধি একটানা কাজের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে। আজ তার জীবনের পরম পরীক্ষা। নতুন জগৎ আর অনাপন পারিপার্শ্বিকে সফল ক'রে তুলতে হবে তার শিল্প-সৃষ্টি, অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে গুরুর মহিমা।

আর ও শুধু অক্ষুণ্ণই রাখে না বহুগুণ বর্দ্ধিত ক'রে তোলে পূর্ব্ব-গৌরব, 'মরক্কো'-র মার্লিন আমেরিকার শোণিত কণিকায় জাগায় এক অপূর্ব্ব স্পন্দন। একটি ছবিতে গোটা দেশখানা মুখর হোয়ে ওঠে মার্লিনের স্তুতিতে। আর সে স্তুতি আর প্রশংসার ক্রমবর্দ্ধমান ঢেউয়ে ঢেউয়ে এগিয়ে চলে ওর জীবনের শিল্প-সৃষ্টি সার্থক-তার তীর্থে—'ডিজঅনার্ড', 'ডিজায়ার', 'ডেষ্ট্রি রাইডস্ এগেন'—চিত্রের সোপানে সোপানে উন্নিতির উচ্চতম শিখরে ওঠে ওর খ্যাতি। অয়ন পরিক্রমায় প্রতিভার সমুজ্জ্বল সূর্য এসে দাঁড়ায় মধ্য গগনে……

মার্লিন! মার্লিন! মার্লিন! সরব গুঞ্জনে ব্যতিব্যস্ত মার্লিন। অণুপরমাণুর মত সংখ্যাহীন গুণ-গ্রাহী ভক্তের ভীড়ে উদভ্রান্ত মার্লিন। ভোজ আর পার্টি, নিমন্ত্রণ আর আলাপনের আতিশয্যে রুদ্ধশ্বাস মার্লিন। ও যেন হাঁপিয়ে ওঠে ব্যবহারিক জগতের অজস্র ঝামেলায়। দীর্ঘশ্বাসে আকুল হোয়ে ওঠে ওর শান্তিস্পৃহ গৃহগত প্রাণ সমাজ জীবনের এই সৌজন্যরক্ষার বিড়ম্বনায়। অমিতাচার ওর কাছে ঘৃণ্য পরিমিতির মাঝে মনের বিস্তৃতিকেই ও পছন্দ করে—আর এইখানেই ও সাধারণ শিল্পী থেকে ভিন্ন। মার্লিনের বহিরাবরণটাই উর্ব্বশী, অন্তরে ও সাবিত্রী। বহু পুরুষের সংস্পর্শে ও এসেছে, অসংখ্য জনের আসঙ্গে ওর কেটেছে বহু রোমাঞ্চক রাত্রি—আজও তবু ওর স্বামীর অনুরক্তি অনুপম। আজও ওর মনের মুকুরে সীবায়ের

কোথায় আনন্দ ! ★ ★ ★

● ● ● ফণীন্দ্র পাল

শ্রাবণের বর্ষণোন্মুখ আকাশ যেন আমার ঘরের জানালার ওপর এসে ঝুঁকে পড়েছে। রাত্রি ক্রমশঃই গভীরতর হয়ে চলেছে।

কত কি যে ভাবছি, হাতে কলম নিয়ে। কলম এক একবার ঝুঁকে পড়ছে কাগজের ওপর, এই বুঝি আমার চিন্তার সূত্র ধরে ঝাঁকে ঝাঁকে কথার ফোয়ারা ছুটবে কাগজের ওপর! কিন্তু তা হ'তোস্মি! কোথায় তলিয়ে গেল আমার চিন্তার সূত্র! গত তিন দিন তিন রাত্রি এমনি করেই হাতে কলম নিয়ে কেটে গেছে সময়। বিষয় থেকে বিষয়ে এলোমেলোভাবে ছুটে বেড়িয়েছে মন। বাঙলা সিনেমার কত সমস্যা পোষাকী সাজে সেজে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। 'বাংলা ছবি ও লোকশিক্ষা', 'সিনেমা ও রাষ্ট্র' 'শিল্পী ও শিল্প', 'জনসাধারণ ও আমাদের ছবি' 'বাঙলা ছবির ভবিষ্যৎ'—এমনি সব কত চিন্তা-ভাবনা কাগজের ওপর গুরু গাম্ভীর্য্যে রচিত হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু মনের দুয়ারে যারা ভীড় করে এসে দাঁড়াল, কলমের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসবার আহ্বানে তাদের কাছে থেকে পেলাম না সাড়া। গত তিন রাত্রি এমনি করেই শ্রাবণের কয়েকটি রাত্রির নিদ্রা আমার কে যেন অপহরণ করে নিল। শেষ শ্রাবণের বর্ষণের শব্দে কি যেন এক ব্যাকুলতা, যেন বিংশ শতাব্দীর সকল বিজ্ঞান সকল কাব্যের গতি ছন্দে অভিশাপের কশাঘাত অস্পষ্ট গুঞ্জনে মর্ম্মরিত হয়ে উঠছে।

একটানা সুখের সন্ধান কখনও আমরা পাইনি, অন্ন-বস্ত্রেরও আরও হরেক রকম অভাব অনটনের সম্মুখে নিত্য স্বচ্ছলতার সান্ত্বনা দিয়ে আশা ও আনন্দে কেউ আমাদের মাতিয়ে তুলতে পারেনি, সংগ্রাম ও আতঙ্কে জর্জ্জরিত হয়ে থেকেছে আমাদের প্রতিদিনের জীবন, অপব্যয় অসংযম [illegible] বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে আমাদের জীবন [illegible]র প্রতিটি তরঙ্গ তবু এতদিন কঠোর নিষেধ-বাধায় [illegible] নির্ব্বাপিত [illegible]রের অন্ধকারে বসে সুদূর নক্ষত্রের দিকে চেয়ে দেখেছি আলোর স্বপ্ন, পরাধীনতার শৃঙ্খলশব্দে বাজিয়েছি বিপ্লবের গান---সেদিন তো শেষ শ্রাবণ রাত্রির আকাশের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে থেমে যায়নি আমার লেখনী।

কোন্ অভিশাপে পঙ্গু হয়ে গেল আমার লেখনী, কোন্ শূন্য হ'তে এলোমেলো হাওয়া এসে রুদ্ধ করে দিচ্ছে আমার চিন্তা ভাবনার দুয়ার।

হে কমলদলবিহারিণী তুমিই কি আমার কোন অপরাধে ফিরিয়ে নিলে তোমারই দেওয়া শক্তি! না কোন অলক্ষ্য শত্রু রামায়ণ মহাভারত বর্ণিত কোন সম্মোহন-আয়ুধ প্রয়োগ করে অপহরণ করে নিল আমার অতিরিক্ত এই চেতনা!

সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি নানা সমস্যার নগ্ন সঙ্গীনগুলি আমাদের বিদ্ধ করতে এগিয়ে আসছে, কিন্তু প্রতিরোধ করবার চেতনা আমরা হারিয়েছি, প্রতিবাদের ভাষা আমাদের মূক হয়ে গেছে, আলোচনা করবার উৎসাহ পর্য্যন্ত নেই। কেন এই জড়তা, কে ডেকে আনল এই অভিশাপ!

আমার দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে অন্ধকারের মধ্যেও কার অস্বস্তির সচকিত ভাব আমাকে চমকিত করে তুলল। এই গভীর রাত্রে আমার একা জাগরণের সঙ্গী হ'তে কে আবার এল! কোথায় ছিল সে এতক্ষণ আত্মগোপন করে? সে কি অশরীরী! এমন সময়ে অকস্মাৎ মেঘের ফুটো সামিয়ানার ফাঁক দিয়ে চাঁদের এক টুকরো স্তিমিত আলো ঠিকরে পড়ল আমার ঘরে। সেই সামান্য আলোয় চিনেছি আমার অসামান্য সঙ্গীটিকে। স্তম্ভিত বিস্ময়ে উপলব্ধি করেছি আমাদের এই বিরাট ব্যর্থতার পিছনের পরিচালকটিকে। আমার নীরব ঘরশত্রুটির বিস্তৃত পরিচয় আপনাদের কাছে দিতেই হবে। আমাদের দেশের লোক সে, বহুরূপী সেজে কখনও মাড়োয়ারী, কখনও মাদ্রাজী, কখনও বাঙালীর সমাজে সে ঘুরে বেড়ায়। আরও অনেক জাতির রূপসজ্জায় বহুবার তার দেখা পেয়েছি জীবনে।

বাইরের শত্রু যখন আমাদের ক্ষতি করে ফাঁকি দেয় তখন প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠা যতখানি সহজ, ঘরের শত্রু

আমাদের বঞ্চিত করলে আমরা ততখানি নিরুপায় হয়ে পড়ি। এই ঘরশত্রুর দলই মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের প্রতিদিনের জীবন থেকে প্রতিদিনকেই কেড়ে নিয়েছে। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজন হয় স্বপ্নরচনার উপলক্ষ্য, চাই অনাগত ভবিষ্যতের আশাময় ইসারা, সংগ্রাম-ক্ষত মনের জন্য মাঝে মাঝে সান্ত্বনার প্রলেপ আর আনন্দ আনে প্রাণবন্যা। সে আনন্দ আজ কোথায়!

যে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী বাঙলা দেশের সিনেমা-শিল্পকে বাঁচায়, হতাশার অন্ধকারে তারা মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে রয়েছে। আজ আনন্দ কেনবার মত সঙ্গতি নেই তাদের। তাই দেখতে পাই দোকানী সাজিয়ে রেখেছে নব নব সম্ভার কিন্তু খরিদ্দার নেই, জুয়াড়ীর নেশা ফিকে হয়ে আসছে দিনের পর দিন।



চিত্রভারতীর নির্মীয়মান 'ভোর হয়ে এলো' চিত্রের আর একটি প্রণয়সিক্ত দৃশ্যে অভি ভট্টাচার্য্য ও প্রণতি ঘোষ

দীপালোক সজ্জিত হোটেল ও ক্লাবে সুরার বোতল-গুলি ছিপিবন্ধ অবস্থায় গুমরে গুমরে উঠছে, সুরাপাত্রগুলি শুকনো ঠোঁট নিয়ে বসে বসে ভাবছে কোথায় গেল অসংযমীর দল। ঘরে ঘরে কি হঠাৎ বেড়ে গেল কৃপণের সংখ্যা, বেদনা ও ক্লান্তি কি পৃথিবীর রাজ্য থেকে নিল বিদায়। অপব্যয়ের দীক্ষা পেয়েছে যারা, অসংযমের উপবীত ধারণ করেছে যারা, তারা ঋণ করতে ভয় পায়না—তারা এতদিন সমস্ত মাসের মাহিনা এক শনিবারেই রেসের মাঠে রেখে এসেছে, অম্লানবদনে বাড়ী দিয়েছে বন্ধক, সম্পত্তি তুলেছে নীলামে, স্ত্রীর অলঙ্কার করেছে বিক্রয়, কাবলিওয়ালা'র কাছে হ্যাণ্ডনোট কেটে চড়া সুদে করছে ধার। যে মহাজনদের কাছে এই বিপুল সম্পত্তি ও অর্থ গিয়ে জমা পড়েছে তারা যক্ষের মত সতর্ক হয়ে উঠেছে। সেই যক্ষের দলের জন্য এইদেশেই, তারাই আমাদের ঘর-শত্রু। তারা প্রতিদিনের জীবনের প্রয়োজনগুলি নিয়ে এমন ব্ল্যাকমার্কেট ফাঁদ পেতেছে যার ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত আজ একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেছে।

জুয়া খেলে বা ব্যসন ও বিলাসে এই বিরাট মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজ হারায়নি তাদের সহজ জীবন নির্বাহনের রসদ—তবে আজ তাদের জীবনে অভাব-অনটনের প্রচণ্ড ধাক্কা এসে লাগছে কেন? তবুও শোনা যায় নাকি সকলের উপার্জ্জনের পরিমাণ চতুর্গুণ

হয়ে গিয়েছিল। সেই inflation-এর সময়ে মাথাপিছু প্রতি মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে যে বেশী অর্থ এসে পৌঁছেছিল, সে সময়ে জিনিষপত্রের দুর্ম্মূল্যতায় সে অর্থ সেদিনই খরচ হয়ে গেছে, সাধারণ মধ্যবিত্তসমাজ যুদ্ধের বাজারে সঞ্চয় করতে পারেনি বরং সেই বাজারেই সৃষ্টি হয়েছে মধ্যবিত্ত সমাজকে শোষণ করবার জন্যে নতুন ধরণের ফাঁদ—ব্ল্যাক-মার্কেট।

দেশের শ্রমিকদের জন্যে দেশে ও বিদেশে অনেক সহানুভূতিশীল ও সংগ্রামমুখর ব্যক্তি ও সঙ্ঘের সৃষ্টি হয়েছে, ধনীদের কোন বন্ধুর প্রয়োজন হয়না—অর্থই তাদের বন্ধু কিন্তু মধ্যবিত্তের ও নিম্ন মধ্যবিত্তের জন্য কারও কি এতটুকু মাথাব্যথা আছে?

আমাদের দেশের যারা শ্রমিক তাদের শ্রমিক রূপে গড়ে তুলতে তাদের ওপর কোনরকম investment নেই। কিন্তু মধ্যবিত্তসমাজে জন্মালে কিছুটা লেখা-পড়া শেখাতেই হয়। তাদের ছেলেদের উপার্জ্জনক্ষম করে তুলতে জনপিছু স্কুল-কলেজের মাহিনা, স্পোর্টসের চাঁদা, জামা-কাপড়-জুতো, ট্রাম-বাস ভাড়া, পরীক্ষার ফিজ্, বই-খাতা-পেন্সিলে প্রায় বিশ হাজার টাকা ব্যয় হয়। তার পর সেই ছেলে মাসে ষাট টাকার চাকরীও জোটাতে পারেনা। যদি বলেন ব্যবসা করেনা কেন, তাহলে কথা ওঠে মূলধনের। আর সবাই ব্যবসা করতে গেলে পৃথিবীর অন্যান্য লেখাপড়ার কাজগুলো করে কে? সুতরাং এমনি-ভাবে সংসার ও জীবনসমস্যার চাপে পড়ে মধ্যবিত্তদের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে আসছে। এতদিন তারা মনে করেছিল পরাধীন দেশে তাদের জীবনের এই বিড়ম্বনা ঘুচবেনা। স্বাধীনতা নিশ্চয় তাদের কাছে আনবে নতুন আশা। কিন্তু সেই সম্ভাবনার আলো আজ তাদের চোখের সামনে থেকে নিভে গেছে। তার ওপর ব্ল্যাক-মার্কেটের ফাঁদে এখনও মানুষ অন্নবিত্তের শোষিত হয়ে চলেছে।

এরপরে আছে বাঙলাদেশের জীবনে কঠিনতম সমস্যা, [illegible]নের প্রা ৩৬

নির্ব্বাপিত ঝড়ের

আজকের স্বাধীন রাষ্ট্র, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার মাঝখানে ক্রমশঃ ম্রিয়মান মধ্যবিত্ত সমাজের মনে আনন্দ কোথায়, আনন্দ কেনবার শক্তি কোথায়!

কেউ কেউ নাক উঁচু করে বলেন, বাঙলা ছবি আবার ছবি। যেমন ছবি তেমনি তার বিক্রী হবে তো! এঁদের জবাব আমরা বিদেশী প্রতিনিধি যাঁরা গত ফিল্ম ফেষ্টি-ভেলে এসেছিলেন তাঁদের মুখ দিয়ে দিয়েছি। পঞ্চাশ লক্ষ টাকা তোলায় হিন্দী ছবি আমাদের দুলক্ষ টাকায় তোলা হিন্দী ছবির কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। আমাদের তোলা 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'রত্নদীপ', 'কার পাপে', 'জিঘাংসা', '৪২', 'মাইকেল মধুসূদন', 'হানাবাড়ী', 'মেজ-দিদি', 'বাবলা', 'বরযাত্রী', 'পারবর্ত্তনের' মধ্য দিয়ে ছায়াছবি দেখার আনন্দে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছি। তবু কি বাঙলা ছবিকে দূরছাই করবেন!

তবু বাঙলা ছবির ব্যবসায়ের সামনে একটি বৃহৎ হতাশার বিভীষিকা দুলছে। তার জন্যে বাঙলা ছবির প্রযোজকদের দায়ী করা চলে না। দেখবেন মধ্যবিত্ত মানুষের মনে যেদিন আবার আনন্দ ফিরে আসবে, সেদিন বাঙলা ছবির ভাগ্যও সুপ্রসন্ন হবে। একথা সুনিশ্চিত, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের মুখে হাসি না ফোটাতে পারলে, দেশের স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে।

সংগ্রাম ছাড়া পৃথিবীতে কিছু পাওয়া যায় না। আজ মধ্যবিত্তসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে তাদের নিতান্ত বাস্তব জীবনের কাহিনী শোনাতে ছায়াছবির মাধ্যমে। ইতিহাসের না-দেখা কাহিনী বই পড়ে জানবো, ছবিতে দেখতে চাইনা; কোন্ মহাপুরুষ কবে কোনকালে মানব-সমাজের কি কল্যাণ করেছিলেন কি তাঁর জনৈক কোন দেবতা বা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছিল সে-কাহিনীর ছবি আজ নিতান্তই অবান্তর, কোন্ আন্দোলনে আমরা কি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম করেছিলাম কি হবে তা আর একবার করে ছবিতে দেখবার। আমাদের আজকের জীবনের সমস্যা সকল সাধারণ মানুষের জীবনের সমস্যা কিনা তা ছবি তুলে জানবার ও জানাবার চেষ্টা করার দিন এসেছে।

কমলাকান্তের প্রত্যাবর্ত্তন

সম্পাদক মহাশয়,

একদা ১২৯২ সালে আপনাকে শেষ পত্র লিখিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, বিদায় হইলাম, আর লিখিব না। বনিল না। আপনার সঙ্গে বনিল না, পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে বনিল না, এ সংসারের সঙ্গে আমার বনিল না, আমার আপনার সঙ্গে বনিল না! আর কি লেখা হয়? বেসুরে কি এ বাঁশী বাজে? বাঁশী বাজি বাজি করে, তবু বাজে না—বাঁশী ফাটিয়াছে। আবার বাজে। দেখি—হৃদয়ের বংশী!

হায়, বাঁশী, তোমার দিন গিয়াছে। আর তোমার বাজিয়া কাজ নাই—ভাঙ্গা বাঁশে মেঠো আওয়াজে আর কুকুর-রাগিনী ভাঁজিয়া কাজ নাই। আর সে বসন্ত নাই—এখন গলা-ভাঙ্গা কোকিলের কুহুরব কেহ শুনিবে কি?

তাই তো বলিতেছি, তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আর যখন শারদীয় 'চিত্রবাণী' প্রকাশের কর্ম্মব্যস্ততার সময় শ্রাবণের ধারায় সম্পাদকের মস্তিষ্ক-চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে বিজ্ঞাপন-সংগ্রাহকেরা কাক ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা মাজা কালো কালো দুলালী ধরণের শরীরখানি কোথায় থাকে? সেইজন্যই তো ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সাহেব শ্যামল তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া নীরব বিস্ময়ে তাকাইয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়েন—Shall I call thee bird! হায় কোকিল, তুমি bird নহ, তুমি bard মাত্র!

হে সম্পাদককুলশ্রেষ্ঠ! আপনাকে স্বরূপ বলিতেছি—কমলাকান্তের আর সে রস নাই। আমার সে নসীবাবু নাই—অহিফেনের অনটন—সে প্রসন্ন কোথায় জানি না, তাহার সে মঙ্গলা গাভী কোথায় জানি না। মিল্ক-পাউডার ও সলিল সংযোগে অহিফেনের নেশা আর জমে না।

তবু লাইনে দাঁড়াইয়া আমি তো আফিঙ্গ কিনিয়াছি। খোরাকি বাবদ আপনি যে অর্থ দিয়াছিলেন, তাহার সবটুকু দিয়াই তো আফিঙ্গ কিনিয়াছি। শুধু কিনি নাই, বহুদিনের নেশার জোয়ারে আসিয়া সে আফিঙ্গ একসঙ্গে সেবন করিয়া বুঁদ হইয়াছি।

কিন্তু পূজার সময় কে আমাকে এত আফিঙ্গ চড়াইতে বলিল। আমি কেন আফিঙ্গ খাইলাম! আমাকে কেন আফিঙ্গ সেবন করাইয়া ফিল্ম-লাইনের দুয়ারে পৌঁছাইয়া দিলেন? এ কুহকে কেন ঠেলিয়া দিলেন? কেন? কেন?

আপনি তো জানেন, বিগত শতাব্দীতে অহিফেন সেবন করিয়া বিড়ালাদির সহিত বাক্যালাপ চালাইয়াছি, কখনও বেচাল হই নাই; কোকিলকে কোকিল বলিয়াই জানিয়াছি, ভেলায় চড়িয়া অনন্ত কালস্রোতের সহিত সবেগে ভাসিয়া গিয়াও দুর্গা-প্রতিমাকে ঠিকই জানিতে পারিয়াছি। তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে সুবর্ণমণ্ডিতা, মৃন্ময়ী, মৃত্তিকারূপিণী, অনন্ত রত্নভূষিতা

সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমাকে চিনিয়াছি! কিন্তু আজ বিশ্ব-মাতৃকা 'লারেলাপ্পা' গাহিয়াও যখন 'দাঁও লাগাই'তে অনুরোধ করেন, তখন তো তাঁহাকে চিনিতে পারি না। মা, মা, মাগো, চামুণ্ডে! কমলাকান্তকে তুমি একি করিলে? মাগো একবার স্বরূপ প্রকাশ করো!

হ্যাঁ মা, তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। তুমি মাগো ফিল্ম লাইনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দশভুজা প্রসারিত করিয়া বুড়ি দেখাইয়া দিতেছ, ফাঁকি মারিবার দশদিক উজ্জ্বল-করা পথ; তোমার ডানদিকে তোমার কন্যা কুন্দেন্দু, তুষার হার, শ্বেতপদ্মাসনা, শুভ্রবসনাবৃতা বাগদেবী, বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী—তিনি জানাইতেছেন এই জগতে বিদ্যার কোনও দাম নাই: তোমার বামপার্শ্বে লক্ষ্মীর ঝাঁপি হস্তে নবীন ধানের মঞ্জরী লইয়া সর্ব্ব-আরাধ্যা লক্ষ্মী—তিনি অর্থই অনর্থ জানাইতেছেন। সিদ্ধিদাতা গণেশ হস্তীমুণ্ড-শোভিত হইয়া প্রকাশ করিতেছেন 'যেথায় হস্তীমুণ্ড সেথানেই সিদ্ধি', আর কার্ত্তিক জানাইতেছেন—আজ চিত্র-শিল্পে কার্ত্তিক (চট্টোপাধ্যায়)-ই বিজয়ী! চারিদিকে অসুর ও সিংহ, ইঁদুর ও ময়ূর।

মাগো! এ কেমন হইল? আজীবন অহিফেন সেবন করিয়াও তোমার একান্ত কমলাকান্ত যে অবস্থায় পৌঁছাইতে পারে নাই, এই কয়দিন ফিল্ম লাইনে থাকিয়া তাহার কেন এ অবস্থা হইল? ফিল্ম লাইনের নামেই নেশা কেন ঘোর হইয়া আসে, কেন অহিফেনের আর প্রয়োজন হয় না? এই কালান্তক ব্যাধি হইতে রক্ষা কেমনে লাভ করিব?

কি বলিলে মা? একটি সিনেমা-পত্রিকা প্রকাশ করিতে বলিতেছ? বলিতেছ সিনেমার পত্রিকা-সম্পাদনা, কিংবা নিদেন পক্ষে বিজ্ঞাপনের বিলের তাগাদায় ঘুরিলে আমার উপকার হইবে? মাগো, একি সত্য? এ যুগে কি এমন যে তোমার আরাধনা না করিয়া চিত্র-তারকার আরাধনা করিলেই সমস্ত দুর্দ্দশা দুঃখের নিরসন হয়? মাগো, কবে তোমার এই সংসারের পরিবর্ত্তে কাঠামোর উপরে চিত্র-তারকাদের বসাইয়া অকাল বোধন সুরু হইবে? সে আর কতদূর?

কিন্তু কি যেন বলিতেছিলাম? আফিঙের মাত্রা একটু চড়াইলে কেন আমার মন হারাইয়া যায়? আমার মন কোথায় গেল? কে লইল? কই, যেখানে আমার মন ছিল, সেখানে ত নাই। যেখানে রাখিয়াছিলাম, সেখানে নাই। কে চুরি করিল? কই, সাত পৃথিবী খুঁজিয়া ত আমার "মনচোর" কাহাকেও পাইলাম না! তবে কে চুরি করিল?

বুঝিয়াছি, লঘুচেতাদিগের মনের বন্ধন চাই, নহিলে মন উড়িয়া যায়। আমি কখন কিছুতেই মন বাঁধি নাই—এজন্য কিছুতেই মন নাই। তাই কি মা, তুমি একটি সিনেমা-পত্রিকা প্রকাশ করিতে বলিয়াছিলে?

কি আশ্চর্য্য! এতক্ষণ তো এই হারানো সূত্রটিকেই খুঁজিয়া ফিরিতেছিলাম। বলিতেছিলাম, ফিলিম পত্রিকার সম্পাদক অথবা বিলের তাগাদাদার হইয়া বৎসর দুই টিকিতে পারিলে (টাঁসিয়া যাইবার সম্ভাবনাই বেশী) আমি তুরীয়ানন্দ অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা, মান-অপমান সব জাহান্নমে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত মনে সম্পাদক অথবা বিলের তাগাদাদার হইয়া বসিতে পারিব।

আমিও ত ইহাই চাহিয়াছিলাম। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনেকগুলি চৌকাঠ পার হইয়া

ভাবিয়াছিলাম, বিদ্যাই যখন অর্জ্জন করিয়াছি তখন আর কেরাণীগিরি করিব না, সম্পাদক বনিব। কেরাণী হইলে সরকারী বইতে কবিতা লিখিতে পারিব না, আপিসের চিঠিপত্রের উপর স্বনামধন্য ফিলিম ষ্টারদের বচন তুলিয়া রাখিতে পারিব না, বিল-বহির পাতায় অনাদায়ী টাকার অঙ্ক লিখিয়া রাখিতে পারিব না। সম্পাদক হইলে এইসব করিতে পারিব। ফিলিম ষ্টারদের জীবনী লিপিবদ্ধ করা অপেক্ষা রোমাঞ্চকর কার্য্য আর পৃথিবীতে কি আছে? সম্পাদক হইবার দুর্ব্বুদ্ধি আমার মস্তিষ্কে কে প্রবেশ করাইয়াছিল, জানি না—কিন্তু ইহা যে সদ্ বুদ্ধি মাতৃ-আদেশের পরও তাহা প্রতীয়মান হইতেছে না। সম্পাদক অদ্যাবধি না হইয়াও সম্পাদকদের দেখিতেছি। দেখিয়া মনে হইতেছে মিথ্যাই বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌবনের শ্রেষ্ঠ কাল অপচয় করিয়াছি। সাহিত্য, দর্শন, সেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ, মোপাসাঁ, শরৎচন্দ্রকে লইয়া বিনিদ্র রজনী যাপন না করিয়া যদি লোক ঠকাইতে শিখিতাম, তবে আজ আর অর্থ উপার্জ্জনের দুশ্চিন্তায় আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিতে হইত না, টিপ সহি দিয়া মাসান্তে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতাম!

নেশাটি কি বেশী হইয়াছে? নচেৎ পৃথিবীকে মাঝে মাঝে চতুষ্কোন মনে হইতেছে কেন? কেন মাঝে মাঝে পৃথিবীকে কমলালেবু মনে করিয়া খোসা ছাড়াইয়া খাইতে ইচ্ছা করিতেছে? স্মরণ হইয়াছে, শুধু তো অহিফেন সেবন করি নাই, অহিফেনের সহিত মৌতাত করিয়া গঞ্জিকা সেবনও যে করিয়াছি!

পাঠক-পাঠিকা! কোনদিন গঞ্জিকা সেবন করিয়াছ? বুঝিতেছি, পাঠিকা, তুমি তোমার দন্ত-কৌমুদী দ্বারা নিম্নাধর চাপিয়া বৃথাই হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছ। সত্য কথা বলিতে কি আমিও ইহার পূর্ব্বে কোনওদিন গঞ্জিকা সেবন বা ভক্ষণ করি নাই।

কিন্তু আজই বা কেন এই দুষ্কার্য্য করিতে গেলাম? কেন এই দুর্ম্মতি হইল? সহসা মনে পড়িল আমি আজ সন্ধ্যাবেলায় 'পল্লীসমাজ' ছবিটি দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিয়াছি রমার ভূমিকায় সিদ্ধেব কালো পাড়ের শাড়ী-পরিহিতা সুনন্দা দেবীর অঙ্গুলীতে স্বর্ণাঙ্গুরীয়ের আলোকের ঝলকানি। পাঠক! আমিই কি পাগল? দেখিলাম নির্বীর্য্য বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকায় মিনমিনে রমেশকে! আহা! তাহার লাঠিখেলা দেখিয়াই তো পাগল হইয়া গেলাম!

বলি নাই, লাঠি, তোমার দিন গিয়াছে? হায়, লাঠি, বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে তোমার যখন হামানদিস্তার ডাঁটির মত নিগ্রহ হইয়াছিল, তখন কি তোমার পোড়া চক্ষুতে জল আসে নাই? তখনই যে কি হইল বুঝিতে পারিলাম না! মনে হইল আমি যেন স্বপ্ন দেখিতেছি—সুধীর

বন্দ্যোপাধ্যায় যেন রমা সাজিয়াছেন, জহর গঙ্গোপাধ্যায় জ্যাঠাইমা, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় বেণী ঘোষাল, রঞ্জিত—রঞ্জিত, হাঁ৷ রঞ্জিত রায় সাজিয়াছেন যতীন, রমেশ সাজিয়াছেন মলিনা দেবী, যিনি অনেক দেবীর মহিমায় নিজেকে দাসী মনে করিতেই গর্ব্ব অনুভব করেন, রাজলক্ষ্মী সাজিয়াছেন গোবিন্দ গাঙ্গুলী—এইরূপ সব তালগোল পাকাইতে লাগিল!

বাহির হইয়া আসিলাম! হায় শরৎচন্দ্র, তুমি কি মরিয়াছ? তোমার রমেশ কি তারকেশ্বরে রমার পিছু ছুটিয়া গিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল: তুমি এখানে? শরৎচন্দ্র! তুমি কি কোনদিন তোমার 'পল্লীসমাজ' পড়িয়াছ, না সজনীকান্তের উপর ভাল করিয়া পড়িবার ভার অর্পণ করিয়া নীরবে সরিয়া দাঁড়াইয়াছ?

চলিতে চলিতে গাঁজার দোকানের সম্মুখে কখন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি জানি না। আ-মস্তক ভরিয়া গঞ্জিকা সেবন করিলাম। এইবার সব স্পষ্ট হইল! মনে হইল আমি যেন এক দীপ্তিময় পরিচালক। এক অভিনেত্রী-প্রযোজিকা আমাকে তাঁহার ছবি করিতে দিয়াছেন। আমি তাঁহাকে এমন ডুবাইয়াছি যে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে তিনি আমাকে তাঁহার গজদন্ত প্রহারে জর্জ্জর করিয়া সকলের সম্মুখে এমন অপদস্থ করলেন যে লজ্জায় ইট-কাঠ পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল। অভিমানে আমি এরূপ কয়টি ছবি তুলিলাম যে নিজেই পটল তুলিবার দাখিল। সেই অভিনেত্রী-প্রযোজিকা আরও কয়জন পরিচালকের নিকট ভাল ছবি পাইয়া আবার আমার নিকট ছুটিয়া আসিল। এবার শুধু আমি পরিচালক নই, সঙ্গীত পরিচালকও। একটি ছবি মুক্তিলাভ না করিতেই তাঁহার জন্য আর একটি ছবিও করিতেছি!

কিন্তু কেন এ কল্পনা ? ফিলিম-লাইনে সন্ধান করিলে আমার মত অর্ব্বাচীন পরিচালকের মত কি সত্য সত্যই নাই ? অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে।

ঘুরিতে ঘুরিতে গঙ্গার ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আকাশে দিকে তাকাইলাম। চন্দ্রমা তখন নীল আকাশে হেলান দিয়া তামাকু টানিতেছিল। আমাকে দেখিয়া লজ্জায় তামাকু সরাইয়া একবার হাসিল।

হাসিতে সমস্ত পৃথিবীতে আলো ছড়াইয়া পড়িল। মনে হইল চন্দ্র যেমন ফিলিমের একমাত্র গ্ল্যামার গার্ল, তারকারা সব সুপারের মতো চারিপাশে ঘিরিয় নাচিতেছে।

চন্দ্র ! তুমি হাসিও না। তোমার ভালগার হাসিতে সেন্সর বোর্ড আপত্তি জানাইতে পারে। মেঘের অঞ্চলে তোমার সেক্স-আপীল হাসি ঢাকিয়া ফেল ! নীল আকাশের দিকে তাকাইয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম।

মধুর স্বপ্ন। ভূত ভবিষ্যৎ একাকার হইয়া গিয়াছে, দুই অমর দত্ত 'এক হইয়া দন্তহীন অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন করিতেছেন, স্মৃতিরেখা বিশ্বাস নব রূপে নতুন খেলা দেখাইতেছেন এবং তাজ্জব বনিয়া বিকাশ রায় প্রণতি ঘোষের কানে কানে কি বলিতেছেন, নার্গিস হঠাৎ রাজকাপুরকে চিনিতে পারিতেছেন না, অশোককুমার নলিনী জয়ন্তের হাতে ভি, ডি (Virendra Desai) দেখিয়া আৎকাইয়া উঠিতেছেন এবং দূর হইতে কার পাপে ঘোষ (K. P.Ghosh) তাহা দেখিয়া প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, গ্রেগরী পেক সুরাইয়াকে মদত করিতে ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথমে সুরাইয়া এবং পরে নানীকে দেখিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, শরৎচন্দ্র সুনন্দা-কাননকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সুনন্দাকে 'চরিত্রহীনে' সাবিত্রী এবং কাননকে 'বিপ্রদাসে' বন্দনা হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছেন এবং ইহারা নিজ নিজ বয়স বিবেচনা করিয়া তাহা করিতে অসম্মত হইতেছেন। মনে হইল এরূপ মধুর স্বপ্ন বুঝি দেখিনাই, দেখিব না। হঠাৎ দুইটি

এ্যামেচার ফটোগ্রাফী ঃ



আমায় কে নিবি গো কিনে ! ফটো : প্রবোধকুমার সেন

বিজাতীয় মূর্ত্তি আমার সন্নিকটস্থ হইতেছে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম। ইঁহাদের কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল। কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই ইহাদের মধ্যে একজন রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করিলেন: তুমি ফিলিম লাইনের লোক? চমকাইয়া উঠিয়া ভাবিতেছিলাম অস্বীকার করিব কিনা, প্রশ্ন কর্ত্তা আবার খেঁকাইয়া উঠিলেন। বুঝিলাম ভীত হইলে অবস্থার অবনতি হইবে অতএব সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিলাম: আপনাদের তো ঠিক চিনিতে পারিলাম না।

'কিন্তু আমি তোমাকে চিনি, তুমি বছরাত অনর্থক নষ্ট করিয়া আমার পুস্তক পাঠ করিয়া মিথ্যা ভাবিয়াছ যে যথেষ্ট বিদ্যা সঞ্চয় করিয়াছ। কিন্তু এ প্রসঙ্গ থাক। আমার নাম সেক্সপীয়র এবং ইহার নাম হ্যামলেট। জিজ্ঞাসা করি তোমরা হঠাৎ আমাদের পেছনে লাগিলে কেন?'

জিজ্ঞাসু নেত্রে সেক্সপীয়রের পানে তাকাতেই তিনি বলিলেন: তোমাদের কিশোর সাহু হ্যামলেটের কী জানেন'যে তাহাকে 'খুনে না হক্' করিবে বলিয়া শাসাইতেছে?

বিনীতভাবে প্রশ্ন করিলাম: আমরা যদি রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে 'খুনে না হক্' করিতে পারি তবে সেক্সপীয়রকে করিতে পারিব না কেন?

'তোমরা ভারতীয়, তোমরা সব করিতে পার। আমরা হইলে তোমাদের রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে কখনই 'খুনে না হক' করিতাম না বিবেচনা করিয়া দেখ তোমাদের মনীষী-দের আমরাই সম্মান দিয়া জগতের সাথে পরিচয় করাইয়াছি। তোমরা কেন আমাদের সম্মান করিবে না? তোমাদের কিশোর সাহু, যাঁহার 'স্বপ্না' দেখিয়া তোমরাই তাজ্জব বনিয়া গিয়াছ, সে কেন 'হ্যাম.লট' করিবার স্পর্দ্ধা রাখে? ইহার দিকে তাকাইয়া দেখ, কিশোর সাহু কী ইহার চরিত্র সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবে?

হ্যামলেটের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, বিগত যৌবন, কেশহীন কিশোর সাহু এবং তাহার স্বপ্নার কথাও ছিল। অতএব হঠাৎ জবাব দিতে পারিলাম না। আমাদের অগতির গতি আমার সহায় হইলেন যিনি কিশোর সাহুকে আচার্য্য বানাইয়াছেন শান্তারামকে বৃদ্ধ্ বানাইবার তালে আছেন, সেই 'ফিলিম ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক বাবুরাও প্যাটেলের ঠিকানা এক টুকরা কাগজে লিখিয়া সেক্সপীয়রের হাতে দিয়া, বোম্বে মেলের সময়, ভাড়া ইত্যাদি বাৎলাইয়া এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম।

সেক্সপীয়র মিলাইল তবু স্বপ্ন টুটিল না।

অনুগত, স্বগত: এবং বিগত
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

চিত্রবাণী প্রেস—৫, হাজরা লেন, কলিকাতা: ২৯ (ফোন: সাউথ ১১১১) হইতে নিতাই চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং চিত্রবাণী কার্য্যালয় হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদনা ও পরিচালনায় : গৌর চট্টোপাধ্যায় এম এ
সম্পাদনায় সহযোগী : লালচাঁদ দত্ত
কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-সজ্জায় : রামকৃষ্ণ দত্ত
কর্ম্মাধ্যক্ষ ও বিজ্ঞাপন-সচিব : নিতাই চট্টোপাধ্যায়
বিজ্ঞাপনে সহকারিতায় : গৌরবরণ ভট্টাচার্য্য

—চিত্রবাণী—

সূচীপত্র

কার্ত্তিক, ১৩৫৬

ছ বি র পা তা য়



জন্ম : ১২ই আগষ্ট, ১৯০৩ : : মৃত্যু : ৮ই নভেম্বর, ১৯৫২

স্বর্গতা প্রভা দেবী

প্রভা দেবীর মৃত্যু বাংলা ছায়াছবির জগতে এক স্মরণীয় ঘটনা। একাধারে মঞ্চ ও ছায়াছবির জগতে এই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী যে আসন দখল করেছিলেন আজকের দিনের অন্য কোনো অভিনেত্রীর পক্ষে সম্ভব হবে না সেই শূন্য আসনকে পূর্ণ করা।

এই অভিনয়-শিল্পীর প্রতিভার প্রথম বিকাশ দেখা যায় নৃত্য ও গীতে অতি ছোট বেলা থেকেই। কিন্তু তাই ব'লে যে তিনি উত্তর জীবনে অভিনয়-শিল্পকেই জীবনের সঙ্গী আর ব্রত হিসাবে গ্রহণ করবেন তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। মাত্র ন' বছর বয়সেই অভিনয়-জীবনের প্রথম পদক্ষেপ তাঁর হলো মঞ্চের মাধ্যমে। স্বর্গীয়া তিনকড়ি সুন্দরীর প্রচেষ্টায় তৎকালীন থেসপিয়ন থিয়েটারে তিনি প্রথমে যোগদান করলেন। সেখানে 'নূরমহল' নাটকে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। পরে নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর অধীনেও মঞ্চাভিনয় চালিয়ে যান। শিশিরসম্প্রদায়ের সঙ্গে থেকে আমেরিকায় গিয়েও অভিনয় করে এসেছেন। মঞ্চাভিনয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ছায়া-ছবিতে অংশ গ্রহণ করেন। তখন চলছিল নির্ব্বাক ছবির যুগ। ১৯২১ সালে ছায়াছবিতে অভিনয় সুরু করে প্রায় ষোলো-সতেরোটি ছবিতে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। নির্ব্বাক যুগে প্রথম প্রধান ভূমিকায় সুযোগ পান 'বিষবৃক্ষ' ছবিতে। তারপর এলো সবাক ছবির যুগ। শিশিরবাবু তখন নিউ থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠানে ছবি তুলছিলেন। সেখানে তিনি প্রথম অভিনয় করেন 'পল্লীসমাজ' ও পরে 'সীতা' ছবিতে। সেই থেকেই তিনি চিত্রজগতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেন। অদ্যাবধি তিনি শতাধিক ছবিতে স্বীয় অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

চিত্রবাণী
নাট্য, চিত্র ও শিল্পকলার
সচিত্র মাসিক পত্রিকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য—১২৲ (সাধারণ ডাকে): ১৫॥০ (রেজিষ্ট্রীডাকে)
পঞ্চম বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৫৯ | দ্বিতীয় সংখ্যা

বাংলা ছবির স্বর্ণযুগ

ভারতীয় চিত্রজগতে বাংলার হৃত নেতৃত্ব ফিরে আসার দিন সমাগত একথা আমরা আগেই বলেছি। তার পর থেকে গত দু'মাসের মধ্যে বাংলা ছবির ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে যাকিছু ঘটেছে এবং ঘটছে তা আমাদের এই বিশ্বাসকেই দৃঢ়তর করছে। নিত্য-নতুন ছবির মুক্তি হ'য়ে মাত্র দু'এক সপ্তাহ চলার পরেই তার আয়ু শেষ হ'য়ে যাওয়া যেমন সেই ছবির পক্ষে সুস্থ লক্ষণ নয় সমগ্র চিত্রশিল্পের পক্ষেও ঐ কথাই খাটে। কিন্তু ইদানীংকালে আমরা দেখেছি কয়েকখানি ছবি মুক্তিলাভের পর বেশ কয়েক সপ্তাহ ধ'রে চলেছে দর্শকসমাগমের সংখ্যা সমানভাবে অব্যাহত রেখে। কয়েকখানি ছবি আবার রজত-জয়ন্তী-সপ্তাহ উদযাপনের পথেও অগ্রসর হয়েছে। দর্শকচিত্তে আবেদনসৃষ্টি করা ব্যতিরেকে, দর্শকদের আকর্ষণ করার শক্তি না থাকলে কোনো ছবির পক্ষেই রজত-জয়ন্তী সপ্তাহ উদযাপন করা কখনই সম্ভব হয় না, বিশেষতঃ আর্থিক অনটন ও দুশ্চিন্তা যে-সময় আপামর সকলকেই ঘিরে ধরেছে। এইজন্য আমরা দ্বিগুণভাবে উৎসাহিত বোধ করছি যে বাংলা ছবি আজ সকল শ্রেণীর দর্শকের স্নেহ-অর্জ্জনে ধন্য হয়ে উঠেছে।

সাম্প্রতিককালে বাংলা ছবির সাফল্য যেমন বাংলা চিত্রশিল্পকে শক্তিশালী করে তুলছে তেমনি সেসব ছবির প্রযোজককেও শক্তি এবং সাহস সঞ্চয়ে সাহায্য করছে। এতে তাঁরা পরবর্ত্তী ছবি তৈরীর কাজে ভীত বা পশ্চাৎপদ হবেন না। ব্যক্তিগত মালিকানা বা যৌথ প্রতিষ্ঠান যাঁরাই ছবি প্রযোজনা করুন না কেন ছবির সাফল্য তাঁদের তথা সমগ্র চিত্রশিল্পের ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতিতে সাহায্য করবে। বাংলা ছবি যেমন আজ দর্শকসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহযোগিতা ও স্নেহলাভে সমর্থ হয়ে চিত্রশিল্পকে শক্তিশালী করে তুলছে, চিত্রশিল্পসংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যক্তিরও আজ উচিত নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বজায় রেখে বাংলা চিত্রশিল্পকে সমগ্র বিশ্বে গরীয়ান ও মহীয়ান ক'রে তোলা। চিত্রশিল্পের বিভিন্ন বিভাগে—প্রযোজনা, পরিবেশনা ও প্রদর্শন—পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে একযোগে কাজ করা। একটি বিশেষ শিল্পের সঙ্গে জড়িত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে অপরকে বাঁচাবার মনোভাব না থাকলে তা' কারও পক্ষেই হিতকর হয়না। প্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শক—চিত্রশিল্পের এই তিনটি সম্প্রদায়কে হতে হবে একাত্ম—বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলে বাংলা চিত্রশিল্পকে উৎকর্ষের চরম শীর্ষে তুলে ধরতে হবে। কেবলমাত্র প্রযোজক একার চেষ্টাতে এতবড় একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে পরিপুষ্ট

করতে পারেন না। বাংলা দেশের প্রযোজকদের মধ্যে আজ আমরা লক্ষ্য করছি,—কি কাহিনীগত, কি কলাকৌশলগত—সর্ব্ববিষয়ে উন্নত চিত্রনির্ম্মাণের সাধনায় তাঁরা ব্রতী হয়েছেন। সাহিত্য-রসপুষ্ট কাহিনী দিয়ে, জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশাকে বাস্তবধর্ম্মী ছবিতে ফুটিয়ে তুলে, দর্শকসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্ত প্রযোজকরা সচেষ্ট হচ্ছেন—পরিবেশক ও প্রদর্শকদের সহযোগিতা ব্যতীত প্রযোজকদের সে-উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হওয়া সম্ভব নয়। ছবির মুক্তিপথে কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি করা, অন্তায়ভাবে অকারণে কোনো ছবির সাফল্যকে দুর্ব্বল করে দেওয়া—এসব মনোভাব পরিহার করতে হবে। আজ চিত্রশিল্পসংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি সম্প্রদায় ও ব্যক্তির উচিত একযোগে কাজ ক'রে এই শিল্পকে সুষমামণ্ডিত করে তুলতে সাহায্য করা এবং এইটাই আমরা আশা করি। বাংলা ছবি নিজ বৈশিষ্ট্যে ও নিজ গুণে বাংলা চিত্রশিল্পকে পরিপুষ্ট করতে সক্ষম হচ্ছে—এদেখে আজ যেমন আমরা উৎসাহিত ও আশান্বিত হচ্ছি, অচিরেই যে বাংলা ছবি এক আদর্শ স্থাপন করবে সেটাও তেমনি আমরা কামনা করি। ইতিমধ্যে বিশ্বের দরবারে বাংলা দেশে তোলা বাংলা ছবি প্রশংসা-লাভে ধন্ত হয়েছে। এইসব নানাবিধ কারণে আমাদের এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে, বাংলা চিত্রশিল্প একটা যেন স্বর্ণযুগের ইঙ্গিত করছে এবং সেই স্বর্ণযুগে পৌঁছোবার জন্ত সকলেই একযোগে কাজ করবেন এইটাই আমরা দেখতে চাই।

পরলোকে প্রভা দেবী

গত ৮ই নভেম্বর শনিবার প্রত্যুষে লোকান্তরিতা হলেন বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও ছায়াচিত্রলোকের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী প্রভা দেবী। কি মঞ্চে কি পর্দ্দায় তাঁর অভিনয়দীপ্ত প্রতিটি ভূমিকা দর্শকচিত্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো কাহিনীতে বর্ণিত চরিত্রের নিখুঁত প্রতিকৃতিরূপে। তাঁর অভিনয়ে দর্শকরা হতেন মুগ্ধ। বিশেষ করে, করুণ ভূমিকার অভিনয়ে দর্শকদের নয়ন হয়ে উঠতো অশ্রুসজল। কি বাচনভঙ্গীতে, কি ভাবপ্রকাশে অত নিখুঁতভাবে অভিনীত চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হতো একমাত্র তাঁর মতো শিল্পীরই পক্ষে। অভিনয়শিল্পীর জীবন তাঁর সুরু হয়েছে অতি অল্প বয়সেই। মঞ্চাভিনয়ের মধ্য দিয়েই তাঁর অভিনয়-জীবনের বনিয়াদ সুদৃঢ় হয়ে উঠেছিল—এমনকি সাগরপারে গিয়েও তাঁর সেই কৃতিত্বের পরিচয় তিনি দিয়ে এসেছেন। বাংলার রঙ্গমঞ্চের বিভিন্ন নটগুরুর অধীনে তাঁর নাট্যচর্চ্চা পরিপূর্ণ সাফল্যের স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল। মঞ্চাভিনয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন চলচ্চিত্রজগতের সঙ্গে। সেও আজকের কথা নয়। নির্ব্বাক যুগের চিত্রগুলিতে যেমন তিনি অভিনয়-দক্ষতা দেখিয়েছেন সবাক চিত্রের যুগেও ঠিক তেমনিভাবেই প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছিলেন স্বীয় অভিনয়-কুশলতার পরিচয় দিয়ে। তাঁর এই আকস্মিক তিরোধানে একাধারে বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও চিত্রজগতে যে ক্ষতি হলো তা অপূরণীয়। কারণ তাঁর অভিনয়-ধারা ছিল অনন্তসাধারণ। বাংলা দেশ তথা সমগ্র ভারতে তাঁর মতো শক্তিশালী অভিনেত্রী একেবারেই বিরল। এমনকি, তিনি বিদেশের মঞ্চের বা ছায়াচিত্রজগতের যে কোনো অভিনেত্রীর সমকক্ষ একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তাঁর স্মৃতি জড়িয়ে থাকবে যেসব ছবিতে তাঁকে ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে তারই মাধ্যমে। দর্শকদের হৃদয়ে যে-পরিতৃপ্তি তিনি দিয়ে গেছেন তা প্রতিটি দর্শকের কাছেই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি, তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে জানাই অন্তরভরা সমবেদনা।

নতুন ছবি

কপালকুণ্ডলা

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জনপ্রিয় এবং বহুজনপরিচিত উপন্যাসরাজির মধ্যে কপালকুণ্ডলা অন্যতম। এই উপন্যাসের কাহিনীবিন্যাস এবং ঘটনাবলীর স্থান নির্ব্বাচন ইত্যাদি সাধারণ পাঠক-পাঠিকাকে অতি সহজেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। কয়েকটি অসাধারণ চরিত্রসৃষ্টিও এই উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উপরন্তু চলচ্চিত্রের দিক থেকে বলতে গেলে বলা যায়, ছায়াছবির নির্ব্বাক যুগ থেকেই সুরু হয়েছে এর চিত্ররূপদানের প্রচেষ্টা এবং আজ পর্য্যন্ত বারকয়েক এটির চিত্ররূপ দেখা গেছে এমনকি হিন্দীতে পর্য্যন্ত।

বর্ত্তমান চিত্ররূপটি দিয়েছেন আজ প্রোডাকসন্স। বিচিত্র কাহিনীমূলক 'কপালকুণ্ডলা' চিত্রটি স্বভাবতঃই দর্শকদের আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু এই কাহিনীর মধ্যে যে ঐতিহাসিক পরিবেশের কিছু কিছু সমাবেশ রয়েছে তা' সর্ব্বক্ষেত্রে যাথাযথ না হওয়ায় দর্শকচিত্তকে ক্ষুণ্ণ করে। ছবির গতি বেশ স্বচ্ছন্দ, কৌতূহল ও আবেগ ফুটিয়ে তোলার জন্য নাটকীয়তারও সৃষ্টি হয়েছে বহু দৃশ্যে, কিন্তু, তবুও ছবিটি আগাগোড়া সর্ব্বত্র সমানভাবে দর্শকমনকে আবিষ্ট করে রাখতে সক্ষম হয়নি।

অভিনয়ের দিক থেকে কপালকুণ্ডলার ভূমিকায় প্রণতি ঘোষের অভিনয় দর্শকচিত্তে রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছে—কিন্তু উপন্যাসে বর্ণিত নায়িকার সঙ্গে সর্ব্ববিষয়ে সমন্বয় রেখে আকৃতিগত মিল যেন হয় নি। নবকুমারের ভূমিকায় সমীরকুমারের অভিনয় এবং অভিব্যক্তি একান্ত নৈরাশ্যজনক। কাপালিকের অংশে নীতিশ মুখোপাধ্যায় একটি দৃশ্যে তাঁর কৃতিত্ব বিশেষভাবে প্রকাশে সক্ষম হয়েছেন—যেখানে কাপালিক পড়ে গিয়ে আহত হচ্ছেন। তাছাড়া অন্যান্য অংশেও তাঁকে মানিয়েছে বেশ এবং তাঁর অভিনয়ও উপাদেয়। মতিবিবির ভূমিকায় সন্ধ্যারাণীর সাফল্যলাভের প্রচেষ্টা লক্ষ্যনীয়, কিন্তু সম্ভবতঃ সুযোগের অভাবেই তিনি আশানুরূপভাবে চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন নি। অন্যান্য ভূমিকার অভিনয় যথাযথ হয়েছে।

সঙ্গীতাংশে উল্লেখ করার মতো কিছু নেই। চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণ মোটামুটি ভালই হয়েছে। ইদানীং বহু ব্যর্থ ছবির পরিচালক অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় এই ছবিতে কিছুটা সংযমের পরিচয় দিয়ে বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন।

বিন্দুর ছেলে

আর সব দিকের দৈন্য সত্ত্বেও কাহিনী-মাধুর্য্য এবং সু-অভিনয়গুণে ছবি কতটা হৃদয়গ্রাহী হয়ে জনপ্রিয় হতে পারে তার নিদর্শন হলো "বিন্দুর ছেলে"। বড় জা-য়ের ছেলে অমূল্যর ওপর সন্তানহীনা বিন্দুর অবিরাম দুর্ব্বার স্নেহ এবং সেই স্নেহকে ঘিরে ছোট-খাটো মান-অভিমান ও ভুল বোঝাবুঝির মধ্য দিয়ে গ্রামের একটি মধ্যবিত্ত সংসারে যে বিপর্যয়ের ছায়াপাত হবার উপক্রম হয়েছিল তারই আবেগচঞ্চল কাহিনী 'বিন্দুর ছেলে'।

'বিন্দুর ছেলে'র কাহিনী বাংলার পাঠক ও দর্শক-সমাজের কাছে চিরপরিচিত। তাই কাহিনীর পরিচয় নতুন করে দেবার প্রয়োজন নেই। কাহিনীর আবেদন থাকলেও যথাযথভাবে তার চিত্ররূপ দেওয়া কঠিন কাজ। চিত্রনাট্য-রচয়িতা মূল কাহিনীকে অনুসরণ করেই চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। চিত্রনাট্য সম্বন্ধে কাহিনীকে অনুসরণ করে যে তার যথাযথ নাট্যরূপ দিতে পেরেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। চিত্ত বসুর পরিচালনায়ও যথেষ্ট



মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া গেছে। আজ পর্য্যন্ত চিত্ত বসু যে ক'টি ছবি পরিচালনা করেছেন তার মধ্যে 'বিন্দুর ছেলে' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। চিত্রনাট্য, পরিচালনা, অভিনয় এবং আঙ্গিক সকল দিক দিয়েই ছবিটি শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে'র সার্থক চিত্র-রূপায়ণ হয়েছে।

অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে বিন্দুর ভূমিকায় সন্ধ্যারাণীর সংযত ও সুষ্ঠু অভিনয়। তাঁর সাবলীল অভিনয়গুণে এই চরিত্রটি সার্থক ও প্রাণবন্ত হয়েছে। এ ছবিতে তাঁর অভিনয় বহুদিন মনে থাকবে। বড়-জা অন্নপূর্ণার ভূমিকায় মলিনা দেবীর অভিনয় খুবই সুন্দর হয়েছে। এ ধরণের চরিত্র-রূপায়ণে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নেই বললেই চলে। এর পরই নাম করতে হয় অমূল্যর ভূমিকায় মাঃ বিভুর অপূর্ব্ব অভিনয়ের কথা। কাহিনীর প্রধান আকর্ষণ হলো বালক অমূল্য। এই ভূমিকাটি মাঃ বিভুর অভিনয়গুণে সার্থক হয়ে উঠেছে। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে 'যাদবে'র ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল ও 'মাধবে'র ভূমিকায় অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় যথাযথ। 'পূজারী'র ভূমিকায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ও প্রশংসনীয়। কুচক্রী ননদিনী 'এলোকেশী'র ভূমিকায় রেণুকা রায়ের অভিনয়ও মনে রাখবার মতো।

রামানন্দ সেনগুপ্তের আলোক-চিত্রগ্রহণ মন্দ নয়। শব্দগ্রহণে শব্দযন্ত্রী সত্যেন চট্টোপাধ্যায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শিল্প-নির্দ্দেশনা ও সম্পাদনার কাজও সুন্দর হয়েছে। এজন্য শিল্প-নির্দ্দেশক সুনীল সরকার ও চিত্র-সম্পাদক রবীন দাস ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

সঙ্গীত-পরিচালনায় কোথাও নতুনত্বের ছাপ নেই। সঙ্গীত পরিচালক কালিপদ সেন আমাদের হতাশ করেছেন। ছবিতে একখানা গান ছিল তাও মোটেই শ্রুতিমধুর হয় নি।

পল্লীসমাজ ঃ অনিবার্য্য ঃ শ্যামলী

এই তিনখানি ছবিই একই জাতের এবং একই ধাতের। না টেকনিক্যাল দিক দিয়ে, না নাটকীয়তা সঞ্চারের দিক দিয়ে, না গল্প বলার আঙ্গিক ও ভঙ্গীর দিক দিয়ে তিনখানি ছবিই কোনোরূপে দর্শকের উপভোগের পর্য্যায়ে আসতে পারে নি। 'পল্লীসমাজ' ছাড়া বাকী ছবিগুলি কাহিনী ও বিন্যাস পরিকল্পনার দিক দিয়ে দৈন্যভারজর্জ্জরিত। 'পল্লী-সমাজ' শরৎচন্দ্রের নাটকীয়তাবহুল বহুপঠিত হৃদয়-বেদনের বর্ণাঢ্যচিত্র কাহিনী। কিন্তু সে কাহিনীও পরি-চালকের সাহিত্য ও কাণ্ডাকাণ্ডবোধহীন সস্তায় বিস্তিমাতের সুলভ প্রচেষ্টায় চিত্রপদবাচ্য হয়ে উঠতে পারে নি। শরৎচন্দ্রের এই কাহিনীর ওপর এই জাতীয় অন্যায় অবিচার এবং শিশু-সুলভ ধৃষ্টতা আমরা পরিচালক নীরেন লাহিড়ীর কাছ থেকে আশা করতে পারিনি। ভবিষ্যতে শরৎচন্দ্রের কাহিনী নিয়ে ছবি করার সময় তাঁর দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত থাকবেন আশা করি।

'পল্লীসমাজে'র কাহিনী চিত্ররসিক প্রতিটি দর্শকেরই অতি প্রিয় এবং পরিচিত—তাই কাহিনীর পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

চিত্র-নাট্যরচনায় সজনীকান্ত দাসের অক্ষমতার পরিচয় আরও একবার পাওয়া গেল। অভিনয়ে প্রায় প্রতিটি শিল্পীই ব্যর্থ হয়েছেন। ছবির প্রধান চরিত্র রমেশের ভূমিকায় বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের নির্ব্বাচন হাস্যাস্পদ। তাঁর প্রাণহীন অভিনয়ে রমেশ চরিত্রের ব্যক্তিত্ব, দেশসেবায় আত্মনিয়োগকারী প্রগতিশীল মনো-ভাব মোটেই ফোটে নি। রমার ভূমিকায় বিগতযৌবনা সুনন্দা দেবী সম্পূর্ণ বেমানান। একমাত্র জ্যাঠাইমার ভূমিকায় মলিনা দেবীর অভিনয়ই মনে রেখাপাত করে। আঙ্গিকের দিকে উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। আলোকচিত্র এবং শব্দগ্রহণ যথাযথ। নীরেন লাহিড়ীকে এতদিন চিত্র-পরিচালক হিসেবেই দেখেছিলাম। সঙ্গীত পরিচালকের নতুন পদ তিনি গ্রহণ করেছেন এই ছবিতে। ছবিটির সঙ্গীত বলতে কিছুই নেই।

চিত্রনাট্যের অক্ষমতা, ভূমিকাবণ্টনের যথেচ্ছাচারিতা আর পরিচালকের খামখেয়ালীপনা সব মিলিয়ে ছবিটি এ বছরের ব্যর্থ ছবির তালিকা বৃদ্ধি করেছে।

'অনিবার্য্য' চিত্রের কাহিনী হলো এই—মনোজ অন্য-লোকের হাতগুণে তাদের ভাগ্যের কথা জানিয়ে দেয় কিন্তু নিজের ভাগ্য ফেরাতে পারে না। বাড়ীওয়ালার মেয়ে মিনতির সঙ্গে তার ভালবাসা আছে। মিনতির বাবা শরৎবাবু মনোজের অফিসের ম্যানেজার এবং মালিক বোস-সাহেবের সোদরপ্রতীম বন্ধু। পাটনায় কোলিয়ারির মালিকানা নিয়ে গোলমাল বাধায় বোসসাহেব শরৎ-বাবুকে নিয়ে গেলেন কিন্তু ফেরবার পথে রেল দুর্ঘটনায় শরৎবাবু মারা গেলেন। পাটনায় যে-ব্যক্তি বোসসাহেবকে ফাঁকি দেয় তারই ছেলের সঙ্গে বোসসাহেবের মেয়ে মঞ্জুর বিয়ের কথা ছিলো। ফিরে এসে বোসসাহেব মঞ্জুকে সে সংস্রব ত্যাগ করতে হুকুম দিলেন। মঞ্জু সে-হুকুম অমান্য ক'রে গৃহত্যাগ করলো। মন ভেঙ্গে যাওয়ায় বোস-সাহেব মনোজকে অফিসের ম্যানেজার করেছিলেন এবং

তাঁর সম্পত্তিও মনোজও মিনতিকে দেবার জন্যে উইল করলেন। ওদের বিয়ে হলো। ফুলশয্যার রাত্রে আকস্মিকভাবে মনোজ নিজের হস্তরেখায় হত্যার লিখন আবিষ্কার করলো। বিভ্রান্ত হয়ে সে হাত দেখা ছেড়ে দিলো। ওদিকে বোসসাহেবের সম্পত্তি দখল করার চেষ্টা করতে লাগলো দুর্বৃত্ত দালাল বসন্ত। ষড়যন্ত্র করে সে মনোজকে লম্পট প্রমাণ করিয়ে বোসসাহেবের কোপে ফেলে দিলো। মনোজ চাকুরী ছেড়ে দেয়। তারপর সাংসারিক দুঃখ-দুর্দ্দশা এবং নিজের হাতের রেখায় অখণ্ড লিখনের কথায় উন্মাদপ্রায় হয়ে গৃহত্যাগ করলো। এই সুযোগে বসন্ত বোসসাহেবের আরও ঘনিষ্টতা অর্জ্জনে সক্ষম হলো। আগে-লেখা উইল বদলে সম্পত্তি হাতাবার জন্যে সে তারই রক্ষিতা লাকিকে নিঃসঙ্গে বোসসাহেবের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করলো। উইল নকল করে সে বোসসাহেবকে হত্যা করা ঠিক করলো। হত্যাকাণ্ড হয়ে যায় আরকি ঠিক সেই সময়ে উন্মাদ মনোজও এসে পড়লো বোসসাহেবকে হত্যার উদ্দেশ্যেই, কিন্তু সামনে পড়ে গেলো তারই ভাই সরোজ আর ছুরি বিঁধলো সরোজেরই বুকে। বসন্তরা পালালো কিন্তু স্বেচ্ছায় মোটর দুর্ঘটনা ঘটিয়ে আত্মহত্যা করলো। সরোজ অবশ্য প্রাণে বেঁচে মনোজকে খুনের দায় থেকে রেহাই দেয়।

তিনটি পরিবারের মাধ্যমে এই কাহিনী শোনানো হয়েছে। মূল প্রতিপাদ্য বিষয়কে পরিস্ফুট করার জন্য নানা অপ্রাসঙ্গিক ঘটনার সমবেশে রচিত এই কাহিনীটি একান্তই দুর্ব্বল। কিন্তু তা আরও দুর্ব্বলতর হয়ে প্রতিভাত হয়েছে চিত্রনাট্য-রচনা ও সম্পাদনার জন্য। এই চিত্রের নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছেন অনুভা গুপ্তা। দর্শকমনে কোন আকর্ষণই তিনি সৃষ্টি করতে পারেন নি। নায়কের চরিত্রে বিমানও তাই। ভিলেনরূপে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় চালিয়ে গেছেন মাত্র। অপরাপর ভূমিকার মধ্যে একমাত্র তুলসী চক্রবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য। কলাকৌশলের দিক থেকে এই চিত্রের অসাফল্যের প্রধান কারণ—আলোকচিত্রগ্রহণ। কোন কোন দৃশ্য এতই অস্পষ্ট যে, খুব বেশী পরিচিত পাত্র-পাত্রীদেরও নিতান্ত অপরিচিত বলে মনে হয়।

ইদানীংকালের অন্যতম ব্যর্থ ছবি হিসেবে 'শ্যামলী' বেশ সহজেই নাম করে নিতে পারে। কাহিনী, চিত্রনাট্য, অভিনয় বা অন্যান্য কলাকৌশলের কাজ—কোনো দিক দিয়েই ছবিখানি বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারে নি। এই আর্থিক বিপর্য্যয়ের দিনে অর্থহীন কতকগুলি ব্যর্থ ছবি তুলে প্রযোজক হবার বাসনা চরিতার্থ না করাই ভালো। এইসব ছবির প্রযোজকরা যদি সেই টাকাটাকে অকারণে এইভাবে নষ্ট না করেন তবে প্রযোজকরা নিজেরাও যেমন উপকৃত হবেন তেমনি উপকৃত হবে চিত্রশিল্প। শিল্প-প্রসারের চেষ্টা করতে গিয়ে দুর্ণাম সংগ্রহ করার পরিবর্ত্তে সেই টাকাটা সত্যকার কোনো জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে দান করলে টাকাটার যথার্থ সদ্ব্যবহার হতে পারে।

মহিষাসুর বধ

শ্রীশ্রীচণ্ডী অবলম্বনে 'মহিষাসুর বধ' চিত্রটি প্রযোজনা করেছেন নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স। মহামায়া শক্তির পূজাকে কেন্দ্র করে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তাকে অবলম্বন করেই এর চিত্ররূপ গড়ে উঠেছে।

'মহিষাসুর বধে'র কাহিনী সর্ব্বজনবিদিত তাই তার বিশদ বিবরণদানে বিরত থাকলাম। ছবিতে

যে-রূপটিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে তা একান্ত মঞ্চঘেঁষা। ছবির সংলাপও ঐ পথকেই অনুসরণ করেছে তার ওপর 'সোনায় সোহাগা'র মতো হয়েছে অধিকাংশ মঞ্চশিল্পীদের বিভিন্ন ভূমিকায় নির্ব্বাচন—তাতে ছায়াছবির আবেদন এ-ছবিতে কোথাও ফুটে ওঠে নি। ছবির কোনো দৃশ্যই মনে রেখাপাত করে নি। দেবতাদের ওপর অসুরের অত্যাচার আর তার পরে দেবতাদের অসহায় অবস্থা আমাদের বাস্তব জীবনের উদ্বাস্তুদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এতে দেবতাদের যে চরিত্রগুলির রূপ দেওয়া হয়েছে তাতে দেবতাদের চরিত্র ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। অভিনয়ের দিক থেকে একমাত্র কমল মিত্রের অভিনয়ই উল্লেখযোগ্য। ছবির দৃশ্যপট হয়েছে বিসদৃশ এবং এ-বিষয়ে অর্থব্যয়ের কার্পণ্য বেশ চোখে পড়ে। অন্যান্য কলাকৌশলের কাজ অনুল্লেখ্য।

ভুলের শেষে

প্রাচীন সংস্কারপন্থী উগ্র প্রভুত্বপরায়ণ হৃদয়বিশিষ্ট জমিদার স্বামীর হাতে সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তিসম্পন্না বিচার-বিবেচনাশীলা স্ত্রীর নিগ্রহের কাহিনীই এই চিত্রে ফুটে উঠেছে।

বাপ মা-হারা হৈমবতী তার দাদার স্নেহ-যত্নে বড় হয়ে ওঠে। লেখাপড়া, গান-বাজনা সবকিছুই সে শিখেছে। একদিন পুকুরে স্নান করার সময় জমিদার রায় বাহাদুরের নজরে পড়ে সে এবং পরে তাঁর সঙ্গে হিমুর বিয়ে হয়। হিমুর একটি ছেলে হয়। এই সময় হিমুর দাদা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই তিনি হিমুর সঙ্গে দেখা করতে পারেন না। রায় বাহাদুর ভুল বুঝলেন হৈমবতীকে তিনি যেতে দেন না তার দাদার কাছে। এক রাত্রে হিমু ছেলেকে নিয়ে লুকিয়ে চলে যায় দাদার সঙ্গে দেখা করতে। রায় বাহাদুর ক্রুদ্ধ হয়ে ছোটেন সেখানে —ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন, কিন্তু স্বামীগৃহে হৈমবতীর প্রবেশ বন্ধ হয়ে যায়। দাদার মৃত্যুর পর হৈমবতী ভরণপোষণের জন্য নার্সের জীবিকা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। এক সহৃদয় চিকিৎসকের চেষ্টায় সে এক ক্লিনিকের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার সুযোগ পায়। কিন্তু সেই চিকিৎসকের অনুপস্থিতির সুযোগে সেই ক্লিনিকের মালিক তাকে উপভোগ করার চেষ্টা করে। সেই সময় হৈমবতী তাকে এক ফুলদানী দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করে পালিয়ে যায় এবং আত্মগোপন করে থাকে। পরে এক কৌতূহলী ঘটনার মধ্য দিয়ে হৈমবতী তার স্বামী আর পুত্রের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পায়।

অভিনয়, কলাকৌশলের কাজ, সঙ্গীতাংশ সব কিছুতে উন্নত মান বজায় রাখা সত্ত্বেও ছবিখানি ব্যর্থ এবং বিড়ম্বিত হয়েছে একমাত্র দুর্ব্বল ও বিন্যাসকৌশলবর্জ্জিত কাহিনীর দোষে।

অভিনয়ের দিক থেকে কমল মিত্র ও ভারতীদেবী যথাক্রমে নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় প্রাণস্পর্শী অভিনয় করেছেন। ছোট-খাটো ভূমিকাগুলির মধ্যে অমর মল্লিক, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও তুলসী লাহিড়ীর অভিনয় ভালই হয়েছে। সঙ্গীতের মধ্যে আবহ-সঙ্গীতের অংশটিই বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে তবে কণ্ঠসঙ্গীতের মধ্যে একমাত্র 'ও শ্যামলী' গানটি ছাড়া অপর গানগুলি মোটেই শ্রুতিসুখকর হয় নি। শব্দগ্রহণ, চিত্রগ্রহণ ও শিল্প-নির্দ্দেশনার কাজ ভালই হয়েছে।

নেভার টেক নো ফর এ্যান আন্সার

জীবনের নৈরাশ্যকে কখনো মেনে নিতে নেই, এই আপ্তবাক্যকে একটি ছোট অনাথ ছেলে আর তার

একমাত্র সঙ্গী একটি গাধার গল্পের মধ্য দিয়ে মনোজ্ঞ নাটকীয়তার মধ্যে ফুটিয়ে তোলো হয়েছে।

পেপিনো ও তার বাহন ভায়োলেটার (একটি গর্দ্দভের নাম) মধ্যে ভীষণ অন্তরঙ্গতা—কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। কিন্তু একদিন ভায়োলেটার হলো অসুখ। ডাক্তার ডাকলো পেপিনো—তিনি একটি ইন-জেকসন দিয়ে গেলেন কিন্তু জানিয়ে গেলেন ভায়োলেটার অবস্থা ভাল নয়। দৈবের ওপর পেপিনোর ভীষণ বিশ্বাস; সে ঠিক করলো সেণ্টফ্রান্সিসের সমাধিতে পেপিনোকে নিয়ে গিয়ে তার রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করবে, কারণ সে শুনেছিল সেণ্ট ফ্রান্সিস মূকদের ভালবাসেন। ফাদার ডোমিকো জানালেন,—সেণ্ট ফ্রান্সিসে যেতে হলে পোপের অনুমতি চাই। কিন্তু একটি ছোট্ট ছেলের পক্ষে তা কি সম্ভব! কিন্তু তাও সম্ভব করে তুললো পেপিনো তার বিশ্বাসের জোরে।

সমস্ত ছবিখানিই ইতালীতে তোলা আর সেইসঙ্গে পোপের আবাসস্থল ভ্যাটিক্যানোর অংশও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখানো হয়েছে। অত্যন্ত প্রতিভাবান ইতালীয় বালক ভিটোরিও ম্যানুনতোর অভিনয় দর্শকমাত্রকেই মুগ্ধ করে। বৃটিশ চিত্রশিল্পের এ একখানি অনবদ্য সৃষ্টি। আলোকচিত্র ও অন্যান্য কলাকৌশলের দিকেও এবছরের একটি বিশিষ্ট শিল্প-কৃতিত্ব। মরিস ক্লক ও র‍্যালফ স্মার্টের যুগ্ম-পরিচালনায় তোলা হয়েছে। নিউ এম্পায়ারে সম্প্রতি এই ছবিটি দেখানো হয়েছে।

ষ্টোরী অব্ রবিনহুড

কার্টুন ছবির জন্য প্রখ্যাত হলেও ওয়াল্ট ডিসনে মানুষ নিয়ে ছবির প্রযোজনায় ইতিমধ্যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং রূপবিন্যাসে তাঁর একটি নিজস্ব ধারা আছে। অপূর্ব্ব একটা কাব্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করে দেন তিনি তাঁর ছবিগুলিতে।

ফরেষ্টের বিখ্যাত দস্যু রবিনহুডের দুর্দ্ধর্ষ কীর্ত্তি এই ছবিখানিতেও তিনি মিঠে রূপকথার আমেজ এনে দিয়েছেন। রবিনহুডের উপাখ্যান আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে সুপরিচিত। বিশেষতঃ [illegible] কাছে এ-কাহিনীর আবেদন চিরন্তন। গল্প পড়তে পড়তে পাঠকের মনে রবিনহুড সম্পর্কে যে ধারণার সৃষ্টি হয় ওয়াল্ট ডিসনে তাতে রং ফলিয়েছেন তাঁর প্রতিভার স্পর্শে—তাই গল্পের মতই চিত্রটি মনোরম হয়ে উঠেছে ছায়াছবিতেও।

কাহিনীর পটভূমিকায় শেরউড ফরেষ্টে ছবিখানির অধিকাংশ গৃহীত হওয়ায় বাস্তবতার দিক থেকে এর যেমন একটা আবেদন সৃষ্টি হয়েছে, মধ্যযুগীয় চারণদের গানে তা পেয়েছে তেমনি প্রাণের স্পন্দন এবং সেই অনুপাতে প্রতিটি অভিনেতা-অভিনেত্রী তাঁদের চরিত্রগুলি ঐকান্তিক আগ্রহের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। যে কোন দর্শক এ ছবি দেখে আনন্দ পাবেন। সম্প্রতি লাইট-হাউসে প্রদর্শিত হয়েছে এই ছবিটি।

"ষ্টোরি অব রবিনহুড"-এর সঙ্গে দেখানো হয় "ওয়াটার বার্ডস" নামক প্রাকৃতিক জীবনের একখানি অপূর্ব্ব ছবি। নানাজাতের জলা-পাখীদের বিচিত্র জীবনধারাকে দেখানো হয়েছে এতে। এ এক পরম বিস্ময়কর সৃষ্টি বলে প্রতীয়মান হবে।

ক্রিষ্টিন চার্টারিস-এর

হলিউড ডায়েরী



এবারে এখানকার খবর পাঠাবার কথা বলতেই প্রথমে মনে পড়ে ভারতীয় চিত্রশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে যে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদলটি যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শনে এসেছেন তাঁদের কথা।

৮ই অক্টোবর তাঁরা এখানে এসে পৌছলেন। মার্কিন চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতির সভাপতি ফ্র্যাঙ্ক ফ্রীম্যান, পরিচালক ফ্র্যাঙ্ক কাপরা ও চিত্র-জগতের অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানান। মিঃ ফ্রীম্যান ও পরিচালক কাপরা তাঁদের এক ভোজসভায়ও আপ্যায়িত করেন। এই ভোজসভায় পশ্চিম-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও উপস্থিত ছিলেন আর তিনি একটি ছোট্ট ভাষণও দিলেন।

এখানকার সাংবাদিকেরা প্রতি-নিধিদলের নেতা মিঃ চণ্ডুলাল শাহকে ঘিরে ধরলেন—ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্বন্ধে নানান তথ্য জানবার জন্য বহু প্রশ্ন তাঁরা করলেন—মিঃ শাহ সেসব প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এক প্রশ্নের উত্তরে মিঃ শাহ জানালেন ভারতীয় ছবিতে ভারতবাসীর জীবন, ইতিহাস ও সংস্কৃতির যথার্থ রূপটিই ছবিতে দেখাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়।

মেট্রো-গোল্ডউইন-মায়ার এবং টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স ষ্টুডিও দুটি তাঁরা পরিদর্শন করেন। এখানে পরিচালক ড্যারিল এফ. জ্যানুক এক ভোজসভায় প্রতিনিধিদলটিকে আপ্যায়িত করেন। মিঃ জ্যানুক বলেন যে, ভারতে চিত্রগ্রহণ করার জন্যে একটি দলকে সেখানে পাঠাবার ইচ্ছা তাঁর আছে এবং সেখানে ভারতীয় চিত্র-শিল্পের কর্মী ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সহযোগিতা আশা করেন।



ছবিটা উল্টো নয়—ছবিতে উল্টে রয়েছেন হলিউডের নবীনা চিত্রতারকা [illegible]

এর পর ইউনিভার্সাল ইন্টারন্যাশনাল ষ্টুডিওর প্রেসিডেন্ট মিঃ মিল্টন র‍্যাকমিল এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করলেন ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদলটিকে। তার-পর ষ্টুডিওর বিভিন্ন বিভাগে তাঁদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখানো হলো। তাঁরা ষ্টুডিওর সেট ও বহির্দৃশ্যগ্রহণের বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থাগুলি দেখে প্রীত হন এবং বিস্ময়বোধ করেন,—কারণ এমন বিরাট ব্যবস্থা নাকি তাঁদের দেশের ষ্টুডিওতে নেই—তার ওপর মেক-আপ করার পদ্ধতি ও মাল-মশলা দেখেও তাঁরা চমৎকৃত হন। তাঁরা এদেশের কলাকুশলীদের কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন।

এখানে বেশ একটা মজার ব্যাপারও হলো। ভারতীয় চিত্রতারকাদের মাথায় 'বিন্দি' দেখে এখানকার চিত্র-তারকারা খুব আকৃষ্ট হলেন। একজনের মাথা থেকে সেটা নিয়ে এ্যান শেরিডানের কপালে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো—এই ব্যাপারে সকলেই বেশ কিছুটা আনন্দ উপ-ভোগ করলেন। মার্কিন মহিলা চিত্রতারকারা যেসব গহনা ইত্যাদি পরেছিলেন তা দেখে ভারতীয় চিত্রতার-কারা নেচে উঠলেন—তাঁদের প্রিয়জনকে উপহার দেবার জন্যে সেসব জিনিষ কেনার জন্যে তখুনি তাঁরা দৌড়োন আরকি!

এই সভা উপলক্ষ্যে ষ্টুডিওটি ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা ও নিশান দিয়ে সাজানো হয়েছিল।

শুনলাম এখানে এঁদের ভ্রমণপর্ব্ব শেষ হওয়ার পর দেশে ফেরার পথে মিঃ বীরেন্দ্রনাথ সরকার জাপানে যাবেন ওখানকার চিত্রশিল্প ও চলচ্চিত্রের বাজার সম্বন্ধে খবরাখবর জানতে। শ্রীমতী অরুন্ধতী মুখার্জ্জী যাবেন লণ্ডনে তাঁর স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে। মিঃ মুখার্জ্জী চিত্র-ব্যবসায় ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্যে কিছুদিন আগে লণ্ডনে গেছেন। দলের অন্যান্য শিল্পীরা চলে গেলেন হাওয়াই দ্বীপের হনোলুলুতে। এঁরা এই পথে ফেরাই স্থির করলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় ওঁরা বললেন যে, তাঁরা 'ওয়াইকিকি' স্থানটি দেখতে চান—

ও-জায়গাটি নাকি বেড়াবার পক্ষে ভারী চমৎকার। পরে আমার কাছে খবর এসেছিল যে, সেখানে তাঁরা পৌছলেন রাত্রে এবং সে-রাত্র কাটিয়ে পরের দিনে ভোর-বেলাতেই স্থানটি পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়েন। সেখানে মিঃ জে জে ওয়াতুমল তাঁদের নিয়ে ঘুরিয়ে সব জায়গাটি দেখান। মিঃ ওয়াতুমল একজন ওখানকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং তিনি একজন ভারতবাসী। 'ওয়াতুমল ফাউণ্ডেশান' তাঁরই অর্থে পুষ্ট।

সেখানে ঘুরে বেরাবার সময় নববিবাহিত প্রেমনাথ-দম্পতি হনোলুলুর বাজারে গিয়ে আলোহা সার্ট আর সেইসঙ্গে জাঁকালো রং-এর এক 'সারং' কিনে ফেলেন। 'সারং' হলো ওদেশবাসিনীদের বহির্বাসের নাম।

বিগত বিশ্ব-সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতার ছ'জন প্রতিযোগিনী একটি ছবিতে একই ধরণের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিকায় মানে একেবারে সুপারের অংশে অভিনয় করছেন। ইউ-নিভার্সাল ইণ্টারন্যাশনাল-এর 'মিসিসিপি গ্যাম্বলার' ছবিতে এঁদের দেখা যাবে। এই ছবিতে নায়িকার বিবাহ-দৃশ্যে এঁদের দেখা যাবে।

'কিং সলোমন'স্ ওয়াইভস্' নামে এখানে একখানি ছবি তোলার উদ্যোগ চলছে। ছবির স্যুটিং সুরু হবে ১৯৫৩ সালের গোড়ার দিকে। বাইবেলে আছে রাজা সলোমনের ৭০০ স্ত্রী আর ৩০০ পুত্রকন্যা ইত্যাদি ছিল। এতে হলিউডে যত সুন্দরী আছে তাদের অবশ্য ছবিতে কাজ দিতে বেশ কিছুটা সুবিধা হবে।

ওয়াল্ট ডিসনে নবতর পরিকল্পনায় একখানি ছবি তুলছেন। এটির নাম 'হিয়াওয়াথা'। 'স্লিপিং বিউটি'র পরে তিনি এই ছবি তোলার কাজে হাত দেবেন—ইতি-মধ্যে অবশ্য প্রাথমিক কাজ সুরু হয়েছে। সঙ্গীতাংশ হবে এই ছবির অন্যতম সম্পদ। আজ পর্য্যন্ত সঙ্গীতপ্রধান যত ছবি ডিসনে তুলেছেন তার মধ্যে এই ছবিটি এক নবতম বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করবে। সঙ্গীতজগতের কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞকে তিনি এই ছবিতে নিয়োগ করবেন বলে প্রকাশ।

'টারজান'কে কেন্দ্র ক'রে অধুনাতম যে-ছবিটি তোলা হচ্ছে সেটি হলো 'টারজান এ্যাণ্ড দি শি ডেভিল'। এই ছবিতে টারজানের প্রণয়িনীর ভূমিকায় থাকছেন জয়েস ম্যাকেন্জীকে—ইনি হলেন ১৬ নম্বরের 'মিসেস টারজান'। এই ছবিতে টারজনও হলেন পঞ্চম 'টারজান'—লেক্স বার্কার।

ব্রিটেন থেকে



লিখছেন মলি স্কট

বিটেনের চলচ্চিত্রজগতের দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য খবর প্রথমেই জানিয়ে দিই। চার্লি চাপলিনের অধুনাতম কৌতুক-চিত্র 'লাইমলাইট'-এর শুভমুক্তি উপলক্ষ্যে চাপলিন স্বয়ং এসেছেন লণ্ডনে। ১৬ই অক্টোবর তারিখে এটির প্রথম প্রদর্শনী হয় এবং এটির প্রথম প্রদর্শনীলব্ধ সমস্ত অর্থ সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে খরচ করা হবে। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের ভগ্নী শ্রীমতী মার্গারেট এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন এবং চার্লি চাপলিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ছবিটির কাহিনী চাপলিনের নিজেরই রচনা এবং এটির চিত্রনাট্য সম্পূর্ণ করতে তাঁর আড়াই বছর সময় লেগেছে।

দ্বিতীয় খবর হলো, হলিউডে যাবার পথে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদলের লণ্ডন পরিভ্রমণ। লণ্ডনের ডরচেষ্টার হোটেলে আর্থার র‍্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এক ভোজ-সভায় এঁদের সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়।

উপস্থিত এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে ছবি তোলা হচ্ছে সেটি হলো 'মৌলিন রোগ'। লণ্ডন ফিল্ম ষ্টুডিওতে এ-ছবি তোলা হচ্ছে আর পরিচালনা করছেন হলিউডের চিত্র-পরিচালক জন হাষ্টন। ফরাসী শিল্পী তুলো-লত্রেক্-এর জীবনীকে কেন্দ্র ক'রে এ-ছবি তোলা হচ্ছে।

●

বিশ্ববিখ্যাত আইস-স্কেটিং শিল্পী বোলটাকে এবার এক ছায়াছবিতেও দেখা যাবে। 'ইনভিটেশান টু দি ডান্স' ছবিতে এঁর প্রধান ভূমিকায় অবতরণ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। জেন কেলী এ-ছবির পরিচালক আর কাহিনী রচনা করা ছাড়া নিজে অভিনয়ও করছেন। লণ্ডনে এটি তোলা হচ্ছে আর এটি হবে রঙীন ছবি। সঙ্গীত-প্রধান এই ছবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এতে কোনো সংলাপ থাকবে না—অথচ সঙ্গীত আর নৃত্যের মধ্য দিয়েই চারটি কাহিনীকে ফুটিয়ে তোলা হবে। এ ধরণের ছবি হিসেবে এটিই সর্ব্বপ্রথম ছবি বলা যায়।

এস কে তাটিয়া জানাচ্ছেন

বোম্বাই-বার্তা

এখানকার ছবির বাজার বিশেষ সুবিধার নয়। হিন্দী ছবির কাহিনীবিহীন একঘেয়েমি আর দর্শকরা ভালভাবে নিতে পারছে না। তার ফলে প্রায় সমস্ত ছবিই এখন প'ড়ে প'ড়ে মার খাচ্ছে। বড় বড় তারকা, পরিচালক বা সঙ্গীত-পরিচালকের মোহ আর দর্শকদের নেই।

সাধারণতঃ ছুটি-ছাটার সময় বা বোনাস পাবার পর কিছুদিন এখানকার ছবিতে দর্শকসংখ্যা বেড়ে যায়; কিন্তু এবার তারও ব্যতিক্রম দেখা গেল। বোনাসের পর শ্রমিকেরা বিশেষ ছবি দেখে নি, দশহরা বা দেওয়ালীর ছুটিতেও ছবির বাজার আগেকার মতই মন্দা রয়ে গেল; যদিও দশহরার চেয়ে দেওয়ালীতে ছবির বাজার সামান্য ভাল বলে মনে হয়েছে। কিন্তু তা' এত সামান্য যে চিত্র-শিল্পে ভয় ধরে গেছে।

কেন আজ বোম্বাইয়ের চিত্রশিল্পের এই অবস্থা—এ কথা সকলেই আজ প্রশ্ন করছেন! ভারতীয় জীবনবাদকে অস্বীকার ক'রে মার্কিন সংস্কৃতিকে আজ বোম্বাইয়ের ছবি ভারতের বুকে চালাতে চেষ্টা করছে, যার গ্ল্যামার আছে, অথচ প্রাণ নেই—এইটুকু আর দর্শকে মেনে নিতে পারছে না। তারা আজ ভারতীয় ছবিতে চেনা-জানা জীবনের ছাপ চায়, চায় এমন কাহিনী যা নিজের বলে মেনে নিতে তাদের বাধবে না।

শুধু এই কারণেই বিমল রায়ের 'মা' ছবির এত জন-সাফল্য, 'রত্নদীপ' বা 'যাত্রিক' এত সম্বর্দ্ধিত, দত্ত ধর্ম্মাধি-কারীর মারাঠি ছবির হিন্দীরূপ 'নান্হে মুন্নে'র এই জন-প্রিয়তা! দর্শকের আত্ম-সচেতনতায় অনেক প্রযোজককেই সমাজ-সচেতন হ'তে হচ্ছে। ছবির কাহিনী নির্ব্বাচনে একেবারে বিপ্লব সুরু হয়ে গেছে। বিমল রায়ের পরবর্ত্তী ছবি হচ্ছে সর্ব্বহারাদের কাহিনী 'দো বিঘা জমিন্', রাজ কাপুরের জুতো-পালিশকরা ছেলেদের জীবনী 'বুটপালিশ', দিলীপকুমারের কয়লা-খনির শ্রমিকদের ইতিহাস 'কালা আদমি', ডি ডি কাশ্যপের 'নয়া ঘর', জিয়া সারহাদির 'ফুটপাথ', রমেশ সায়গলের 'শিকাস্ত' প্রভৃতি।

চিত্রশিল্পের এই দুর্য্যোগে কিন্তু একটা সুফল ফলেছে। দুর্য্যোগ যখন আসে তখন শুধু প্রযোজকই একা ঘা খায় না, পরিবেশক ও প্রদর্শককেও ঘা দিয়ে যায়। এই দুর্য্যোগে তাই পরিবেশক বা প্রদর্শকেরাও কম ক্ষতিগ্রস্ত হন নি। তার ফলে একদল পরিবেশক হঠাৎ স্থির করেছেন যে, যে-যে প্রদর্শক সোজা ব্যবসা না করবেন, তাঁদের সঙ্গে এঁরাও কোনও সম্পর্ক রাখবেন না। সাদা কথায়, পরি-বেশকেরা বলতে চান 'ব্ল্যাক মানি' নেওয়া চলবে না, 'হাউস প্রোটেকশান' বলে কোনও কথা থাকবে না; টিকিট বিক্রীর শতকরা একটি ভাগ যদি প্রদর্শক নিতে চায় তো ছবি দেব, নয়ত ছবির মুক্তিই দেওয়া হবে না।

একে ভাল ছবির অভাব, তারপর পরিবেশকদের এই ধনুক-ভাঙা পণ, তার ফলে প্রদর্শকেরা কেউ কেউ নীচে নেমে আসছে। এইসব সর্ত্তেই যে শুধু তারা রাজী হচ্ছে তা নয়, অনেক পরিবেশকের বাড়ীতে তারা ধর্ণা দিতেও সুরু করেছে।



বম্বে টকীজের কর্ম্মী সংঘের প্রথম ছবি 'সমঝদার'-এর মহরৎ উৎসবে কিষণচাঁদ জনাব আবদুল খাম চাচাকে মাল্যভূষিত করেন। আবদুল খাম চাচা এই প্রতি-ষ্ঠানের সবচেয়ে পুরানো কর্ম্মী। এই উৎসবে ইনিই পৌরোহিত্য করেন।

হলিউড-ফেরৎ ফিল্ম-ডেলিগেশন-এর সভ্যদের নিয়ে এখানে বেশ হৈ চৈ পড়ে গেছে। প্রত্যেকেই প্রায় বিভিন্ন ভোজসভায় আমন্ত্রিত হচ্ছেন আর হলিউডে তাঁদের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা সবিস্তারে বর্ণনা করছেন। তবে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে চিত্রশিল্পের অসন্তোষের সীমা নেই। যাঁরা নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই অবাঞ্ছিত ছিলেন। এই ব্যাপার নিয়ে এখানকার চিত্রশিল্পে যথেষ্ট তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে।

আই, এম, পি, পি,. এ'র সভ্যদের মধ্যেও এই ব্যাপারে দলাদলির সূত্রপাত হয়েছে। একদল সভ্য প্রকাশ্যেই আই, এম, পি, পি, এ'র সভাপতি শ্রীযুত চণ্ডুলাল শাহের বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব আনার চেষ্টা করছেন। এবারে সভাপতি নির্ব্বাচিত হচ্ছেন জৈমিনী দেওয়ান। সম্ভবতঃ শ্রীযুত শাহ নিজেই পদত্যাগ করবেন। আই, এম, পি, পি, এ'র এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হলিউডে যে ডেলিগেশন গেছে তার সভ্য নির্ব্বাচনের ব্যাপারে তাঁদের কোন হাত ছিল না। আরও শোনা যাচ্ছে যে এই নির্ব্বাচন এবং প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যাপারে আই, এম, পি, পি-কে নিমন্ত্রণই করা হয় নি। আই, এম, পি, পি, এ-র মধ্যে দুই দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব সুরু হতে আর খুব বেশী দেরী নেই বলেই মনে হয়।

এখানকার অধিকাংশ অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক ও পরিচালকের মতে যাঁদের যাওয়া উচিত ছিল তাঁদের অনেককেই এই দলে নেওয়া হয় নি। এক সাক্ষাৎকারে শ্রীযুত কিশোর সাহু তো সেদিন এই ব্যাপারে তাঁর মতামত স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করলেন। তাঁর মতে এই প্রতিনিধিদলকে কোনমতেই ভারতের চিত্রশিল্পের সত্যকার প্রতিনিধি বলা চলে না। যিনি এই দলের নেতা সেই চণ্ডুলাল শাহ-কে ব্যক্তিগতভাবে নিমন্ত্রণ করা হয় নি। আই, এম, পি, পি, এ-র সভাপতি হিসেবেই তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়। কাজেই তাঁর পক্ষে যাকে-তাকে নিয়ে দলভারী করা উচিত হয় নি। তিনি আরও বলেন যে, এটা সত্যিই দুঃখের ব্যাপার যে আই, এম, পি, পি, এ-র সভাপতির এত বড় গুরুদায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি সেই পদমর্য্যাদাকে নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির কাজেই ব্যবহার করলেন।

সম্প্রতি প্রায় ডজনখানেক ছবির মহরৎ হলো। মহরৎগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অমিয় চক্রবর্ত্তীর প্রযোজনা ও পরিচালনায় 'পতিতা', লতা মঙ্গেশকরের প্রযোজনায় 'সুবিলী', সি, রামচন্দ্রের প্রযোজনায় 'লাহিরে', এইচ, জি, ফিল্মসের 'বাজ', অজিতের 'বিরলা', বিমল রায় প্রোডাকসনের 'দো বিঘা জমিন', অশোককুমার প্রোডাকসনের 'পরিণীতা' অশোককুমার ও আলুওয়ালীয়ার যুগ্ম-প্রযোজনায় 'ফিরদাউস', হিন্দুস্থান চিত্র প্রতিষ্ঠানের 'খুন-এ-নাহক' এবং আরও কতকগুলি ছবি। তবে এই ছবিগুলির কাহিনীগত একটা বিশেষত্ব যা চোখে পড়ে তা হলো প্রায় প্রত্যেকটি ছবির কাহিনীই গড়ে উঠেছে দীন মজুর, নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনকে কেন্দ্র ক'রে। তবে এতগুলি ছবির একসঙ্গে মহরৎ হলেও পূর্ব্বের মহরৎ-সম্পন্ন প্রায় ডজন-খানেক ছবির কাজ বন্ধ হয়ে আছে। এর কারণ হলো এখান কার অধিকাংশ চিত্রতারকাদের বিদেশ ভ্রমণের হুজুগ। এই ব্যাপারে প্রযোজকদের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি ও অসুবিধা



বাংলা চিত্রের নবীনা নৃত্যপটিয়সী শিল্পী জয়শ্রী সেন

ভোগ করতে হচ্ছে। এখানে একজন তারকাই একসঙ্গে প্রায় আট-দশটি ছবিতে কাজ করেন। কাজেই কোন কারণে যদি তিনি বাইরে যান তো একসঙ্গে প্রায় ডজন-খানেক ছবির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। দেব আনন্দ সম্প্রতি ভিয়েনা যাওয়ায় প্রায় ছ'টি ছবির কাজ বন্ধ হয়ে ছিল। তাঁর প্রত্যাগমনের পর অবশ্য সে ছবিগুলির স্যুটিং যথা-রীতি চলছে। তবে হলিউডে ফিল্ম ডেলিগেশন যাওয়ার ফলে বোম্বাই-এর ছবির কাজকর্ম্ম প্রায় একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। বীণা রায় ও প্রেমনাথ কাজ করছিলেন 'আউরৎ', 'গহর', 'শোলে', 'প্রিন্স সেলিম ও আনারকলি', 'সৈয়দ' 'মেহমান', 'দর্দ-এ-দিল' ছবিগুলিতে। তাঁদের বিদেশ ভ্রমণ-কালে এই ছবিগুলির স্যুটিং বন্ধ ছিল। নার্গিস ও



এম, জি, এম-এর মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'কুয়ো ভেডিস্' ছবিতে রবার্ট টেলর ও ডেবোরা কার

ব্যাপারে গীতাবালীর ভগ্নীরও কিছু অংশ আছে। এই ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন গীতাবালী অন্যান্য ভূমিকায় আছেন রাম সিং ও কে, এন, সিং, সুর দিচ্ছেন ও, পি, নায়ার।

●

এখানে চলচ্চিত্রশিল্পের বিভিন্ন বিভাগে নিয়োজিত কর্ম্মীরা নিজেদের সমিতি গড়ে তোলার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছেন। প্রায় প্রত্যেক বিভাগেরই নিজস্ব সমিতি ছিল, ছিল না কেবল শব্দযন্ত্রীদের। এবারে তাও হ'ল। এখানকার শব্দযন্ত্রীরা এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি ফেমাস সিনে ল্যাবরেটরীতে মিলিত হন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে শব্দযন্ত্রীদের অভাব অসুবিধা দেখার জন্য সমিতির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং শব্দযন্ত্রীদের একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য আবেদন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মুকুল বসু।

রাজকাপুরের অনুপস্থিতির জন্যও 'আঃ', 'পহেলী সাদী', 'ধুন' ও 'পাপী' ছবির কাজ বন্ধ ছিল। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের কারণে-অকারণে বিদেশভ্রমণ অন্ততঃ যতদিন ছবিগুলি না উঠছে ততদিন পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা উচিত।

●

অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের প্রযোজক হবার সখ দেখা গিয়েছিল। এবারে এখানকার প্রযোজকদের একজনকে অভিনেতারূপে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যাবে। 'বাজী' ও 'জাল' ছবির স্বনামধন্য প্রযোজক ও পরিচালক গুরু দত্ত তাঁর পরবর্ত্তী 'বাজ' ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। এই ছবিটির প্রযোজনার

অতীতের সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকেই নানাপ্রকার মানসিক ব্যাধিতে ভুগছেন। অতীতে তাঁরা একদিন জনপ্রিয় তারকাই ছিলেন এবং যশ ও অর্থ দুই প্রচুর পেয়েছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁদের দু'একজনের অবস্থা খুবই খারাপ। এঁদের মধ্যে স্নেহপ্রভা স্নায়ুদৌর্ব্বল্যজনিত ব্যাধিতে আক্রান্তা হয়েছেন এবং চিকিৎসার জন্য তিনি এখানের এক নার্সিং হোমে আসেন ও প্রায় মাস খানেক ধরে সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করেন। ডাক্তারের অভিমত হল এই যে অতিরিক্ত চিন্তার জন্যই তাঁর এই অসুখ দেখা দিয়েছে। বনমালারও মানসিক রোগ হয়েছে।

তাঁর মনে সব সময়েই এক ভীতির সঞ্চার হয়ে রয়েছে। তাঁর মনে মৃত্যুভয় ঢুকেছে। তিনি অভিনয়ে অর্জ্জিত অর্থ ব্যবসায়ে খাটাতে গিয়ে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন এবং অনেকের মতে সেই থেকেই তাঁর এই মানসিক বিকার দেখা দিয়েছে। একদিন যাঁরা চিত্রশিল্পকে সেবা করেছেন দর্শকদের চিত্রের মাধ্যমে আনন্দ দিয়েছেন তাঁদের শিল্প-সাধনার এই দুঃসহ পরিণতিতে চিত্রানুরাগীমাত্রই দুঃখিত হবেন।

●

ভূতের মুখে রামনামের মত না হলেও প্রায় অনুরূপই ঘটনা সেদিন হয়ে গেল। কিশোর সাহু প্রযোজিত ও পরিচালিত 'খুন-এ-নাহক' ছবির মহরৎ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে বোম্বাই রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি ও বোম্বাই সহরের প্রাক্তন মেয়র শ্রীযুত এস, কে, পাতিল এক অভিভাষণে চিত্রশিল্পের ওপর সরকারের অন্যায় প্রমোদকর বসানো নিয়ে অনেক কথা বলেন। তিনি প্রাদেশিক সরকারসমূহের কঠোর সমালোচনা করে বলেন যে, চিত্রশিল্পের ওপর তাঁদের এতটুকুও দরদ নেই এবং এ সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন, যা চিত্রশিল্পের পক্ষে বিশেষ ভালো নয়। সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তঃ-প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রীদের যে সম্মেলন হয়ে গেল তার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, চলচ্চিত্র অনুসন্ধান কমিটি বিভিন্ন রাজ্যে এক হারে এবং শতকরা বিশ টাকা করে কর বসানোর জন্য যে সুপারিশ করেছিলেন তা বাতিল হয়েছে। তাঁর মতে অর্থমন্ত্রীরা প্রমোদকর নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা করেন নি। যদি তাঁরা একটু ভেবে দেখতেন তাহলে তাঁরা বুঝতে পারতেন যে প্রমোদকর কমিয়ে দিলে টিকিটের দামও কমে এবং তার ফলে ছবির দর্শকের সংখ্যাও বেড়ে যায়। এতে সরকারের আয়ও বেশী হয়। ছবির সেন্সর-ব্যবস্থারও তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁর মতে ভারতে ছবির সেন্সর-ব্যবস্থায় যথেষ্ট গলদ আছে। যাঁরা ছবি সেন্সর করেন ছবি সম্বন্ধে তাঁদের কোন জ্ঞানই নেই। তাঁরা ব্যক্তিগত ভাল লাগা না লাগার ওপরই গুরুত্ব দেন। বছরে হয়ত তাঁরা দু'-একটি ছবি দেখেন এবং তা দেখেই মনে করেন যে ছবি সম্বন্ধে তাঁরা সবজান্তা হয়ে গেল। পরিশেষে তিনি জানালেন যে পার্লামেন্টের আগামী অধিবেশনে প্রমোদকর নিয়ে আলোচনার জন্য তিনি প্রস্তাব উত্থাপন করবেন।

চিত্রগ্রহণের অন্তরালে



'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণের প্রাক্কালে পাহাড়ী সান্যালকে দেখা যাচ্ছে।
ফটো : নির্ম্মল মল্লিক

●

সেদিন প্রখ্যাতা প্লে-ব্যাক শিল্পী লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জানতে পারলাম যে তিনি শীঘ্রই লণ্ডনে যাচ্ছেন। ক্লাসিকাল মিউজিক্যাল সোসাইটি অব ইংলণ্ড তাঁকে ইংলণ্ড ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং তিনি তা'

গ্রহণ করেছেন। বিদেশ ভ্রমণের ফলে তাঁর ছবির প্রযোজনার কাজ ব্যাহত হবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে সে-ব্যাপারে কোন অসুবিধা হবে না। কারণ তিনি যে-ছবিটি প্রযোজনা করছেন সে-ছবিটি হবে সঙ্গীত-প্রধান এবং তার জন্য স্যুটিং খুব বেশীদিন বন্ধ যাবে না। তিনি আরও জানালেন যে আগামী বছরের গোড়ার দিকে বোম্বাইতে একটি অপেশাদার সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করছেন। কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত উভয়েরই ব্যবস্থা এতে থাকবে এবং বিজয়ী সঙ্গীতজ্ঞদের পুরস্কারও দেওয়া হবে।

কুলদীপ কাউরকে শীঘ্রই প্রযোজক হিসাবে দেখা যাবে। তিনি পরিচালক রমেশ সায়গলের সঙ্গে যুগ্ম-প্রযোজনায় একটি ছবি করছেন। এই ব্যাপারে বেশ একটা মজার কাহিনী শোনা যাচ্ছে। কুলদীপ কাউর অসৎ উপায়ে টাকা জাল করতে গিয়ে প্রায় ১ লক্ষ টাকা নষ্ট করেছিলেন। তিনি সে টাকার আশা ছেড়েই দেন। এই সময় একদিন রমেশ সায়গল তাঁকে এই বলে আশ্বাস দেন যে তাঁর টাকা ফেরৎ পাবেন। তখন কুলদীপ তাঁকে বলেন যে, তিনি যদি সে টাকা সত্যিই ফিরে পান তো সেই টাকা তাঁর ছবিতেই নিয়োগ করবেন। এক সপ্তাহ পরে কুলদীপ কাউরের মামলার নিষ্পত্তি হয় এবং তিনি তাঁর অপহৃত টাকা ফিরে পান এবং তাঁর পূর্ব্ব অঙ্গীকারমতো রমেশ সায়গলকে পুরো টাকাটাই দেন। ছবিটির নামকরণ হয়েছে 'সি কাস্তে'।

●



মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'প্রতীক্ষা' চিত্রে স্মৃতিরেখা ও সিপ্রা

এখানে সান্টা ক্রুজ বিমানঘাঁটিতে বাংলার একজন কর্ম্মোৎসাহী অভিনেতাকে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। কলকাতা আর বোম্বাইতে একই সঙ্গে কয়েকটি ছবিতে ইনি অভিনয় করছেন। সেজন্য এঁকে বিমানযোগেই যাতায়াত করতে হচ্ছে। ইনি হলেন অভি ভট্টাচার্য্য। চণ্ডু ষ্টুডিওর 'নয়না' ছবিতে ইনি গীতাবালীর বিপরীত ভূমিকায় অভিনয় করছেন। ছবিটি পরিচালনা করছেন রবীন্দ্র দাভে। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন নিরু, বিমান ব্যানার্জ্জী ও রমেশ প্রভৃতি। ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিয়েছেন গোলাম মহম্মদ।

চণ্ডু ষ্টুডিওতে আরও দুটি ছবি তোলার তোড়জোড় চলছে। একটি হলো 'সচ', অপরটি 'মুসৌরী'। প্রথমটির কাহিনী লিখেছেন প্রবীণ চিত্রনাট্য-রচয়িতা নিরঞ্জন পাল। এন, আর আচার্য্য ছবিটি পরিচালনা করবেন। একটি প্রধান চরিত্রে নিরুপা রায়কে দেখা যাবে—তাছাড়া নবাবিষ্কৃত এক কিশোর অভিনেতাকে এই ছবির নায়কের ভূমিকায় দেখা যাবে—তার বয়স মাত্র ছ'বছর। 'মুসৌরী' ছবিটি তোলা হচ্ছে নানাভাই ভাট-এর পরিচালনায়—দিওয়ালীর দিন থেকে এটির চিত্রগ্রহণ সুরু হয়েছে।



ভারতের রাষ্ট্রমঞ্চের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রীজওহরলাল নেহরু ও ভারতের বিগত যুগের রঙ্গলোকের সর্ব্বাধিক পরিচিতা অভিনেত্রী শ্রীমতী দেবিকারাণীর কালিম্পং-এ সাক্ষাৎকার

ফটো : নীরোদ রায়







অভিনেতা-অভিনেত্রী সম্মেলন



মার্কিন রাষ্ট্রমঞ্চের শ্রেষ্ঠতম অভিনেতা প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সকাশে ভারতের বর্ত্তমান রঙ্গলোকের সর্ব্বজনপরিচিতা নটী শ্রীমতী নার্গিস্



আমেরিকায় ভারতীয় চিত্রতারকাবৃন্দ



★

হলিউড পরিভ্রমণকালে মেট্রো-গোল্ড্‌উইন ষ্টুডিওতে ভারতীয় ফিল্ম ডেলিগেশনের সম্বর্দ্ধনা : বাঁদিক থেকে দেখা যাচ্ছে : ওয়াল্টার পিজিয়ন, রাজকাপুর, নার্গিস্‌, চণ্ডুলাল শা ও গ্রীয়ার গার্সন

★



★

হলিউড পরিভ্রমণকালে এম্‌-জি-এম্‌ ষ্টুডিওতে ভারতীয় ফিল্ম ডেলিগেশন : বাঁদিক থেকে : জিন সিমন্স, ষ্টুয়াট গ্র্যাঞ্জার, পরিচালক জর্জ্জ সিডনী এবং ভারতীয় চিত্রজগতের সর্ব্বজন-পরিচিত অভিনেতা ডেভিড

★

কালবৈশাখীর দুরন্ত ঝড়ের অনুরূপ
হৃদয়াবেগের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে
বাংলার চিত্রমানের প্রবর্দ্ধন-প্রয়াসী
আর একটি গরীয়ান এম. পি নিবেদন

আঁধি

শ্রেঃ দীপ্তি রায়
রাধামোহন · বিভু

পরিচালনা: অগ্রদূত

কাহিনী : সৌরীন্দ্র মোহন :: :: সুর: দুর্গা সেন

১৪ই নভেম্বর থেকে উত্তরা · পূরবী · উজ্জ্বলা ও

অজন্তা, বেহালা : শ্যামাশ্রী, হাওড়া : মায়াপুরী, শিবপুর
পারিজাত, শালখিয়া : নিউ তরুণ, বরানগর : মাণা, পানিহাটী
উদয়ন, শেওড়াফুলি : শ্রীকৃষ্ণ, বালী : নৈহাটি সিনেমা
রূপালী, চুঁচুড়া : জ্যোতি, চন্দননগর

জয়শ্রী সেন জানাচ্ছেন

কলকাতার খবর

ভারত থেকে যে চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদলটি আমেরিকায় গিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই স্বদেশে ফিরে এসেছেন। এই দলের দু'জন সভ্য বাদে সকলেই গত ২৩শে অক্টোবর রাত্রি ন'টার পর বিমানযোগে কলকাতায় এসে পৌঁছোন। এই দলে ছিলেন—নার্গিস, রাজকাপুর, প্রেমনাথ, বীণা রায়, গহর, চণ্ডুলাল শাহ, সূর্য্যকুমারী, মিনু কাতরাক্, আচারেকার, ডেভিড এবং কে, সুব্রহ্মণ্যম্। শ্রীযুত সরকার স্বদেশে ফেরার পথে এক সপ্তাহকাল জাপানে ভ্রমণ করে এসেছেন। শ্রীমতী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমানে লণ্ডনেই তাঁর স্বামীর সঙ্গে অবস্থান করছেন। দমদম বিমানঘাঁটিতে ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসেস-এর তরফ থেকে তাঁদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। বিমান-ঘাঁটিতে চিত্র-সাংবাদিক, চিত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

দলের নেতা শ্রীযুত চণ্ডুলাল শাহ বলেন যে, আমেরিকায় তাঁরা যেখানেই গেছেন সেখানেই বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হয়েছেন। এই ভ্রমণের ফলে উভয় দেশের চিত্র-সংশ্লিষ্টদের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ়তর হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, আমেরিকা সবসময়ই ভারতকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে। তারা ভারতকে জানতে ও বুঝতে চায়। প্রতিনিধিদলের প্রত্যেকেই আমেরিকার প্রশংসা করেন। প্রেমনাথ জানান যে, তিনি ওখানে ছবিতে অভিনয়ের জন্য আহ্বান পেয়েছিলেন। কিন্তু বোম্বাইতে তাঁর অসমাপ্ত ছবিগুলি শেষ না করে এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন না। দক্ষিণ ভারতের অভিনেত্রী সূর্য্যকুমারী এক প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, হলিউডে অভিনয়ের জন্য তিনিও আমন্ত্রিত হন তবে তিনি এখনও সঠিক কিছু স্থির করেন নি। প্রায় পনেরো দিন তাঁরা হলিউডের বিভিন্ন ষ্টুডিও ও চলচ্চিত্র-শিল্পের কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। ওখানকার চলচ্চিত্র-শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান থেকেই তাঁদের আপ্যায়িত করা হয়। হলিউডের প্রায় প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁদের মধ্যে আলাপ-আলোচনাও হয়। কলকাতায় রাত্রিযাপনের পর ২৪শে অক্টোবর প্রত্যুষেই তাঁরা বিমানযোগে বোম্বাই যান।

এই দলেরই অন্যতম সভ্য শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ সরকার গত ২৮শে অক্টোবর বিমানযোগে জাপান থেকে কলকাতায় এসে পৌচেছেন।

চিত্রসাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর আমেরিকা ও জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, এই ভ্রমণের ফলে উভয় দেশের মধ্যে সখ্যতার সম্পর্ক আরও দৃঢ়তর হয়েছে। ভারতকে

চিত্রগ্রহণের অন্তরালে



চিত্রগ্রহণের প্রাক্কালে 'রোশেনারা' ছবির একটি দৃশ্যে মহড়া দিচ্ছেন দেববালা ফটো : নির্ম্মল মল্লিক

আমেরিকা আজ বন্ধুভাবে পেতে চায়। তিনি হলিউডের প্রত্যেক ষ্টুডিওই ঘুরে দেখে এসেছেন এবং দেখে এটা বুঝেছেন যে, ওখানকার ষ্টুডিওর প্রত্যেকটি কর্ম্মীই নিয়মানুবর্ত্তী ও অত্যন্ত কর্ম্মনিষ্ঠ। ছবি তোলার আগে তারা সব বিষয়ই ভালোভাবে পর্য্যালোচনা করে তবে ছবি তোলার কাজে হাত দেয়। আমেরিকায় সকল দেশের ছবি সম্বন্ধেই একটা আগ্রহ আছে। ভালো ছবি হলেই তা' তারা গ্রহণ করে। ভালো ছবিকে যে কোন দেশের হলেই হলো তা সে জাপানী বা ইতালীয়ই হোক্ আর ভারতীয়ই হোক্। তবে ভারতীয় ছবিকে সব দিক দিয়েই ভালো হতে হবে। শ্রীযুত সরকারের মতে ছবি সুসম্পাদিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ছবির দৈর্ঘ্য সাধারণ আমেরিকান ছবির মত হওয়া চাই এবং ইংরাজীতে সাব-টাইটেল জুড়ে দিতে হবে।



এম জি এম-এর টেকনিকলারে রঙীন ছবি 'কুয়ো ভেডিস'-এ রবার্ট টেলর ও ডেবোরা কার

আমেরিকার ছবির বাজার সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ওখানকার বাজার ক্রমশঃই খারাপের দিকে যাচ্ছে। ছবি তোলার খরচ কমানোর দিকে প্রযোজকদের দৃষ্টি পড়েছে। আমাদের দেশের মত ওখানে বড় বড় অভিনেতা ও অভিনেত্রীরাই ছবির প্রযোজক হচ্ছেন। শ্রীযুত সরকার বলেন ওখানে রঙীন ছবি তোলার একটা হুজুগ পড়েছে। অধিকাংশ ছবিই টেকনিকলারে তোলা হচ্ছে।

জাপানের চিত্রশিল্পের অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে জাপানী চিত্রশিল্পের অবস্থা বেশ ভালোই ছিল কিন্তু যুদ্ধের পর আঙ্গিকের দিক থেকে জাপানী ছবির মান অনেক নেমে গেছে। কয়েকটি ভালো ছবি দেখেই জাপানী ছবির বিচার করা চলে না। ওখানেও অনেক খারাপ ছবি তোলা হয়। ভারতীয় ছবি সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ আছে তবে তা' ভালো ছবির বেলায়। ওখানে ছবি তোলার খরচা পড়ে গড়পড়তা আড়াই লক্ষ টাকা।

সম্প্রতি কয়েকটি ছবির সেন্সরের ব্যাপারে কলকাতার আঞ্চলিক সেন্সর কর্ত্তৃপক্ষের খামখেয়ালী ও যথেচ্ছাচারিতার পরিচয় পাওয়া গেছে। স্থানীয় চিত্রশিল্পসংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যক্তিই এতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। 'বিন্দুর ছেলে' ছবিটির ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। ছবিটিতে একটি দৃশ্য ছিল যাতে দু'বছরের ছেলে অমূল্যকে চুম্বন করছেন তার ছোট মা বিন্দু। দৃশ্যটি ছিল সশব্দ।

সেন্সর কর্তৃপক্ষ দৃশ্যটি বাদ্ দিতে বলেন। ছবিটির আর একটি দৃশ্যে 'শালা' শব্দের ব্যাবহার ছিল। যে দৃশ্যটি থেকে ঐ শব্দটিও বাদ দেওয়া হয়। ছবিটির কর্তৃপক্ষ অনেক বাদ-প্রতিবাদের পর সেন্সরের নির্দ্দেশ মেনে নিয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো যে কেন্দ্রীয় সেন্সর কর্ত্তা (সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যান) শ্রীযুত আগরওয়ালা বি, এম, পি, এ'র সেক্রেটারীর এক পত্রের উত্তরে জানিয়েছেন যে মা-র সন্তানকে চুম্বন-দৃশ্য আপত্তি-কর নয়।

●

শ্রীযুত আগরওয়ালা এই ব্যাপারে চিত্রসাংবাদিকদের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হন এবং সেন্সরের ব্যাপায় নিয়ে আলাপ-আলোচনাও করেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুত আগরওয়ালা জানান যে 'বিন্দুর ছেলে' ছবিটির 'চুম্বন দৃশ্য'টি কাটবার কারণ হলো বিসদৃশ শব্দ। যাইহোক, ছবির সেন্সর ব্যাপারে সেন্সর-কর্তৃপক্ষের খাম-খেয়ালীপনা বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বোম্বাইয়ে বাঙলার অভিনেতাদের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে বলে মনে হয়। বাঙলার অধিকাংশ অভিনেতাই বোম্বাইয়ের ছবিতে অভিনয়ের জন্য আমন্ত্রণ পাচ্ছেন। ইতিমধ্যে অনেকে একাধিক ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তি-বদ্ধও হয়েছেন।

প্রথিতযশা অভিনেতা অভি ভট্টাচার্য্য বোম্বাই-এর একাধিক ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল মুকুল রায় প্রোডাকসন্সের 'সৈলাব' ছবিটি। এ ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন গীতাবালী। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন স্মৃতিরেখা বিশ্বাস আর আগা। ছবিটি পরিচালনা করবেন [illegible]। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন মুকুল রায় স্বয়ং। বর্তমানে অভি ভট্টাচার্য্য কলকাতায় চিত্রভারতীর 'ভোর হ'য়ে এলো' ছবিতে অভিনয় করছেন। এই ছবিতে অভি-নয়ের সময়েই তিনি বোম্বাই-এর এই ছবিটিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। তিনি সম্প্রতি বোম্বাইয়ে অভিনয়ের জন্য গিয়েছিলেন। স্যুটিং শেষ হলেই আবার তিনি বিমানযোগে কলকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন।

জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা অসিতবরণও বোম্বাই চললেন। তিনি অশোককুমার প্রোডাকসন্সের 'পরিণীতা' ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। তিনি 'কবি চন্দ্রাবতী' ছবিটি শেষ করে বোম্বাই যাবেন।

বাঙলার আর একজন অভিনেতাও শীঘ্রই বোম্বাই যাচ্ছেন। তিনি হলেন হাস্যরসাভিনেতা জহর রায়। তিনি বিমল রায় প্রোডাকসন্সের 'দো বিঘা জমিন' ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। যাক তবু ভালো যে বোম্বাই এতদিনে বাংলার অভিনেতাদের কদর বুঝতে পেরেছে।

●

অভিনেতা বিকাশ রায়কে হয়তো এবার পরিচালকের নতুন পদে দেখা যেতে পারে। তিনি স্বর্গতঃ ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর উপন্যাস 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' ছবিটি পরিচালনা করতে পারেন।

●

প্রযোজক-পরিচালক দেবকীকুমার বসু সম্প্রতি তাঁর নিজস্ব চিত্রপ্রতিষ্ঠান দেবকী বসু প্রোডাকসনের হয়ে 'পথিক' ছবিটির মহরৎ সুসম্পন্ন করেন। এরপর তিনি তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন 'শ্রীচৈতন্যদেব'-এর জীবনী অবলম্বনে একটি ছবি তুলবেন। এ ছবিটি তিনি অনেকদিন পূর্ব্বেই তুলবেন স্থির করেছিলেন। কিন্তু কতকগুলি কারণে তিনি এ ছবিটির তুলতে দ্বিধা করছিলেন। কিন্তু তিনি এখন এ ছবিটি তোলা একরকম স্থির করেছেন। তবে ছবিটি পূর্ব্বের পরিকল্পনা মতো হিন্দী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই তোলা হবে।

চার্লি চ্যাপলিনের

★ কর্ম্মপদ্ধতি ★

চলচ্চিত্রের ইতিহাসে গত তিরিশ বছর ধ'রে যে-মানুষটি অফুরন্ত হাসির খোরাক জুগিয়ে এসেছেন তিনি হলেন চার্লি চাপলিন। লক্ষ লক্ষ দর্শক এই হাস্তরসিক ভাঁড়'টিকে চার্লি, শার্লোট, কার্লিটস্ বা কারলিনো বলে জেনে এসেছেন এবং হাস্তকৌতুকরসাভিনেতা হিসেবে ইনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু ইনি যখন কোনো ছবি তোলার কাজে ব্যাপৃত থাকেন সে সময়কার কর্ম্মচাঞ্চল্যের পরিচয় কেউই জানেন না। ছবি তোলার সময় প্রতিটি মুহূর্ত্তকে কাজে লাগিয়ে কারও কোনো কিছু অনুকরণ না ক'রে, অতিশয় গোপনীয়তা অবলম্বন ক'রে চার্লি তাঁর ছবি তোলার কাজ সেরে নেন—পত্র-পত্রিকাদি বা জনসাধারণের কোনো প্রতিনিধিরই সেখানে প্রবেশের কোনোরকম উপায় নেই। তাঁর সহকর্ম্মীরা ছাড়া খুব কম লোকই তাঁর ছবি তোলার সময় উপস্থিত থেকেছেন।



চার্লি সম্প্রতি যে ছবিটি তুলেছেন সেটি একখানি বিয়োগবিধুর-মিলনান্ত ছবি। এ-ছবির নাম হলো 'লাইমলাইট' এবং এটি তাঁর ৮১তম ছবি এবং এটির মুক্তিও সমাসন্ন। তিনি এই সর্ব্বপ্রথম তাঁর ছবির সেটে গিয়ে একজন ফটোগ্রাফারকে খুশীমতো ছবি তোলার অনুমতি দিয়েছেন। যিনি ফটো তুলতে গিয়েছিলেন তাঁকে পাঁচদিন চার্লির বাড়ীতে আর ষ্টুডিওতে কাটাতে হয় এবং বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে ষ্টুডিওতে তাঁর কার্য্যাবলীর বহু ঘটনা ফুটিয়ে তুলেছেন।

আজ চার্লির বয়স ৬৩ বছর—পক্ককেশবিশিষ্ট সৌম্যমূর্ত্তি বেঁটে-খাটো মানুষটি এখনও চলে-ফিরে বেড়ান ঠিক সেই ভাঁড়টির মতোই এবং এখনও আগেকার মতোই তাঁর সেই চিরাচরিত অঙ্গভঙ্গী করেন।

তাঁর কর্ম্মপদ্ধতি, তাঁর অসাধারণ কর্ম্মক্ষমতা, একাদিক্রমে কাজ করে যাওয়ার যে ক্ষমতা, তার কাছে অল্পবয়স্ক অনেক যুবকও পিছিয়ে পড়বে আর হাঁপিয়ে উঠবে। 'লাইমলাইট' ছবির তিনি একাধারে প্রযোজক, কাহিনীকার, সংলাপ-রচয়িতা, গীতিকার, কোরিওগ্রাফার, পরিচালক, সম্পাদক এবং অভিনেতা। অভিনয়-শিল্পীদের পোষাক-পরিচ্ছদের পরিকল্পনাও তিনি দিয়েছেন—সেইসঙ্গে ছবির



মধ্যেকার বহু ভূমিকার মেক-আপ করার কাজেও তিনি স্বয়ং হস্তক্ষেপ করেছেন।

চার্লির অপরিসীম কর্ম্মক্ষমতার মতোই তাঁর প্রতিটি ছবির আবেদনও অসীম। চার্লির তোলা কোনো ছবিতেই কোনো আর্থিক ক্ষতি হয়নি। 'তাঁর অতি-পুরানো' ছবিও আজও বিদেশের বাজারে বেশ জনপ্রিয়তার সঙ্গেই চলে। মার্কিন টেলিভিশন প্রতিষ্ঠানসমূহ বহুবার চার্লির ছবিগুলির চিত্রস্বত্ব বহু টাকার লোভ দেখিয়ে কিনে নেবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তা ফলবতী হয়নি। তাই চার্লিও বলেন, 'জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আমি ছবি তৈরী করবো। আমার আন্তরিক ইচ্ছা, শেষ ছবি যা আমি তুলবো তাই যেন আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ছবি হয়।' 'লাইমলাইট' ছবির সেটে প্রযোজক-পরিচালক চার্লি চাপলিনকে সর্ব্ববিষয়েই নজর রেখে যেতে হয়েছিল। সেটগুলির যেসব নমুনা আঁকা-অবস্থায় ছিল সেগুলি সম্বন্ধে তিনি বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন, প্রত্যেক শিল্পীর সাজ-পোষাক নিজে দেখে নিয়েছেন, ছোট-খাটো ভূমিকাতে যেসব শিল্পী অভিনয় করেছেন তাঁদেরও তিনি পরীক্ষা করে দেখে নেন, আলোকসম্পাত ও অন্যান্য দৃশ্যাদির খুঁটি-নাটি সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করে নিয়েছেন। ফ্লোর-এর মধ্যে উঁচু পাটাতন থেকে দেখা গেছে পক্ককেশ-বিশিষ্ট 'বব'-ছাঁটকরা চার্লির মাথাটি মঞ্চের চতুর্দ্দিকে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, ক্যামেরার মধ্যে দিয়ে দেখছে, কৌতুক-ভূমিকাভিনেতাদের অংশ যাতে আরও উন্নত করা যায় তার চেষ্টা করছে, সেট-এর অদল-বদল করছে, বব এলড্রিশের পাশে এসে খানিকক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিচ্ছে—ইনিও একজন বেশ কর্ম্মঠ সহকারী পরিচালক। চার্লি বলেন —'আমি যদি এই কাজে আনন্দ না পেতাম তাহলে নিজে এতটা পরিশ্রম করতাম না। আমি সব জিনিসই শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে চাই। পশুদেরও সেরকম কোনো স্বভাব নেই যে তাদের যা করবার আছে সেই কাজ তার হ'য়ে অন্য কেউ করে দেবে।'

সত্যি কথা বলতে কি চার্লির এই ছবির কাজ সুরু হয়েছিল প্রায় আড়াই বছর আগে। এটির চিত্রনাট্য রচনার কাজ আরম্ভ হয় সেই সময়ে। একটি সৎ-উদ্দেশ্যমূলক কাহিনী হিসেবে এটির সুরু হয়েছিল এবং সোজাসুজিভাবেই তার পরিণতি হয়। চার্লি বললেন—'সোজাসুজি জিনিষ-টাই এত সোজা নয়।' তিনি নিজে হাতে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে সমস্ত চিত্রনাট্যটি লিখলেন, তারপর টুকরো টুকরো অংশগুলিকে একত্রিত ক'রে তাঁর একজন সেক্রেটারীকে দিলেন টাইপ করার জন্য। চার্লি নিজে হাতে যে খসড়াটি লিখেছিলেন সেটি দাঁড়িয়েছিল ৭৫০ পৃষ্ঠায়। এই কাহিনীতে যে-চারটি প্রধান চরিত্র আছে তাদের সম্পূর্ণ জীবনী চার্লি লেখেন আর তাতে তাদের শৈশব-কাল বা পারিবারিক বৃত্তান্তও বাদ যায় নি। এর বেশীর ভাগ অংশই পরে বাদ দেওয়া হয়েছিল—পাকাপাকিভাবে যখন কাহিনীটি ঠিক করা হয়। পরে অবশ্য চার্লি বলেছেন—'তবুও ঐ ফেলে-দেওয়া পাতাগুলি থেকেও আমার

কাহিনীর চরিত্রগুলিকে বলিষ্ঠ করার উপকরণ সংগ্রহ করেছিলাম।'

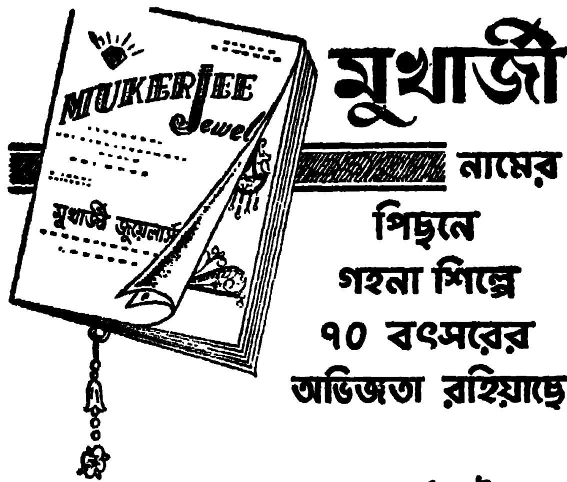
'লাইমলাইট' ছবির মোট 'স্যুটিং দিন' নির্দ্ধারিত ছিল ৩৬ দিন। এ-ছবির বেশীর ভাগ অংশই তোলা হয়েছিল চার্লি চাপলিনের নিজের ষ্টুডিওতে আর এ-ষ্টুডিওর মালিক তিনি ১৯১৮ সাল থেকে।

কিন্তু মাঝে কিছুদিন অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হওয়ার দরুন এ ছবির স্যুটিং শেষ করতে লেগেছিল ৫০ দিন। চার্লির পক্ষে পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি তোলার বেলায় এটিও একটি নতুন রেকর্ডের সৃষ্টি করেছে। বিলম্ব হওয়ার ফলে চাপলিন তাঁর ছবির বাজেট সম্বন্ধেও বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। দৈনিক স্যুটিং শেষ হওয়ার পর চার্লি বিদ্যুৎগতিতে ছুটতেন প্রোজেকশান রুমের দিকে ছবির 'রাস-প্রিন্ট' দেখার জন্যে। মেক-আপ-করা অবস্থাতেই তিনি দেখে নেন যে দৃশ্যগুলি তাঁর ভাল লাগে। সেইসঙ্গে বলেন—'কোনো দৃশ্য যদি আমার খারাপ লাগে তখন মনে হয় আমি আত্মহত্যা করি।'

সাউণ্ড ষ্টেজের ওপর উঠে অভিনেতা চার্লি আর পরিচালক চার্লি অনবরত উভয়ে একাত্ম হবার চেষ্টা করতে থাকেন। সন্তুষ্ট না হয়ে হঠাৎ হাত নেড়ে উঠলেন, তারপর পরিচালক চার্লি শুধরে দেয় অভিনেতা চার্লিকে। আবার সুরু হয় চার্লির অভিনয়। মাঝে মাঝে এমনও হয়, কোনো একটি দৃশ্যের হয়তো বহুবার চিত্রগ্রহণ হয়ে গেছে, ক্যামেরার আড়াল থেকে তাঁর সহকারী বললেন—'এ-দৃশ্যটি একটি ছোট-খাটো রত্ন বিশেষ।' অধিকাংশ সময়ে একমত হলেও কিন্তু তিনি আবার একবার চিত্রগ্রহণ করার জন্য বলে ওঠেন—'ঠিক আছে, এই দৃশ্যটি আরও একবার অভিনয় করে দেখে নেওয়া যাক।' আরও একবার দৃশ্যটির চিত্রগ্রহণ হ'ল—হয়তো বারকয়েকই হ'ল—চার্লি চুপচাপ স্থির হয়ে দাঁড়ালেন, হাত দুটো পিছনের দিকে পকেটে রাখলেন, মাথাটি একপাশে হেলিয়ে

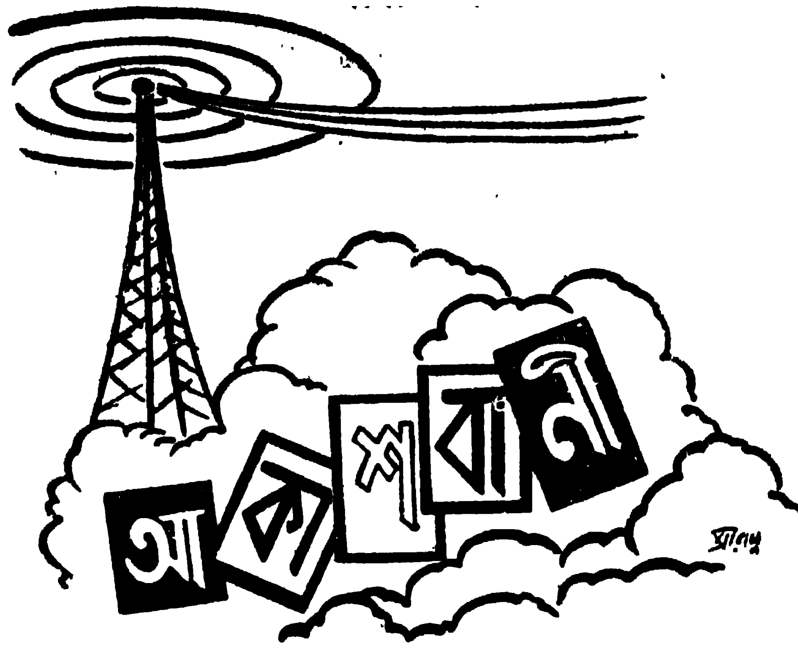
দিলেন। তারপর চিন্তান্বিত হয়ে নিজের ঠোঁট দুটো চেপে ধরলেন, হাতের লাঠিতে একটু ফুঁ দিলেন, অভিনেতা চাপলিন আলোর মধ্য দিয়ে ক্যামেরার দিকে এগিয়ে গেলেন, তারপর পরিচালক চার্লি বললেন 'এই-বার ভালই হয়েছে, এটার প্রিন্ট করা হোক।'

'লাইমলাইট' ছবির কাহিনী হ'ল ঐক্যতান বাদকদের জীবনী নিয়ে—এককালে চার্লি নিজেও একজন বাদক ছিলেন। ছবির নায়ক হলো ক্যালভেরো। চার্লি চাপলিন অভিনয় করেছেন এই ভূমিকায়। ক্যালভেরো হলো একজন নামকরা কৌতুকাভিনেতা বিভিন্ন-বারে সে ঘুরে বেড়ায় যদি কিছু সুযোগ পাওয়া যায়। নায়িকা হলো তেরেজা—সে একজন যুবতী নর্ত্তকী। এই ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বিংশবর্ষীয়া ইংরাজ অভিনেত্রী ক্লেয়ার ব্লুম। বহু প্রার্থীর মধ্য থেকে এঁকে নির্ব্বাচিত করা হয়। বাতজ্বর হয়ে তেরেজা অসুস্থ হয়ে পড়ে, সে আশঙ্কিত



হলো আর বোধ হয় সে চলতে ফিরতে পারবে না—আত্মহত্যার চেষ্টা করে সে। ক্যালভেরো সে-সময়ে গিয়ে তাকে বাঁচায় সেবা-শুশ্রূষা ক'রে তাকে সুস্থ ক'রে তোলে। প্রতিদানে ক্যালভেরোকেও সে সাহায্য করলো তার দুর্দ্দশা আর অসহায় অবস্থা থেকে বাঁচাবার জন্যে। ক্যালভেরোর আবার সুদিন ফিরে আসে—ক্যালভেরো আবার একদিন স্বনামধন্য ভাঁড় হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে, একজন হাস্যউদ্রেককারী পশুর পরিচালক, আত্মভোলা বেহালাবাদক আর সেইসঙ্গে কৌতুকাভিনেতা হিসেবে আবার সে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো।

যেসব দৃশ্যে নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে হবে সে-সব দৃশ্যে চার্লি চাপলিন যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। সেইসঙ্গে কৌতুক সৃষ্টি করার জন্যে তাঁকে বহু পরীক্ষা করতে হয়েছে আর তাদের উন্নতির জন্যে বেশ ধৈর্য্য ধরে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। এক দৃশ্যে বয়স্ক অভি-নেতা বাষ্টার কীটন পিয়ানো বাজাচ্ছেন আর চাপলিন বেহালা বাজাচ্ছেন—কিন্তু এই দৃশ্যটিকে চিত্রে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যে তাঁদের পুরো একদিন সময় লেগে যায়। বাষ্টার কীটনের বয়স ৫৬ বছর আর চাপলিনের ৬৩ বছর—কিন্তু তাঁদের বয়সের কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে তাঁরা নাচলেন, দৌড়-ঝাঁপ করলেন, তাঁদের অভিনীত দৃশ্যটির বারবার মহলা দিলেন, নানাভাবে পরীক্ষা করলেন। অসংখ্যবার চাপলিন ঘুরপাক খেলেন, উল্টে-পাল্টে আছড়ে পড়তে লাগলেন মঞ্চের সম্মুখভাগে—যেখানে 'ফুটলাইট' আছে সেখানে গড়াগড়ি খেয়ে ঠিকরে ঠিকরে পড়তে লাগলেন—সেখানে ঐক্যতান বাদকের দল রয়েছে, তাঁর সহকর্মীরা সবসময় প্রস্তুত হয়ে আছেন—যদি, তিনি পড়ে যান তৎক্ষণাৎ তাঁরা চার্লিকে ধরে ফেলবেন। বাষ্টার কীটনও উইংসের ধারে ছিটকে এসে পড়তে লাগলেন; পিয়ানোর সঙ্গে ধাক্কা খান আর মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়েন। মঞ্চের ওপর যাঁরা কাজ করছিলেন, অন্যান্য নাচিয়েরা, সকলে একসঙ্গে বসে দেখে সে-দৃশ্য উপভোগ ক'রে হাসিতে ফেটে পড়েন—যেন সে-দৃশ্য তাঁরা এর আগে কখনও দেখেননি।



আমাদের কথা

বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানগুলি প্রচারের ভার থাকে বিভিন্ন বিভাগের ওপর। প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলির আকৃতি ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বেতারের বিবিধ বিভাগগুলি সৃষ্টি হয়েছে। চরিত্রগত বৈষম্য ও বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলির সমন্বয় নিয়েই বেতারের পূর্ণ, সম্পূর্ণ এবং অখণ্ড বিকাশ। এই সসম সমন্বয় যে দেশে যত ব্যাপক ও গভীর বেতারের সার্থকতা ও স্ফুরণ সে দেশে তত বেশী।

কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের বিবিধ বিভাগ সমালোচনার দিকে সেজন্য আমরা এতখানি গুরুত্ব আরোপ করেছিলাম এবং বিগত ক'মাস ধরে এই জন্যে কলিকাতা বেতারের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তার গুণাগুণ ও ভালোমন্দ বিচার বিবেচনা করেছি। কেবলমাত্র কটু কথায় বা তীক্ষ্ণ শায়ক-সন্ধান নয়—বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলির সমালোচনার সঙ্গেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে কি করলে এবং কেমন করে বিভাগগুলিকে আরো উন্নত ও সুসমৃদ্ধ করা যেতে পারে।

'চিত্রবাণী'র 'বেতারবন্ধু'র এই ইঙ্গিত কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের দেবতারা কিভাবে নিয়েছেন জানি না তবে এইভাবে বেতার সমালোচনায় নতুন দিকের সন্ধান দেবার জন্যে বেতার কল্যাণকামী বন্ধুদের সম্বর্দ্ধনা এবং অভিনন্দন লাভ করে আমি ধন্য হয়েছি। আজ এবারের আলোচনার সঙ্গেই বেতার বিভাগ পরিক্রমা শেষ হয়ে যাবে বলেই আমাদের এই ভূমিকা।

বেতার শ্রোতৃ সংঘ

'বেতার শ্রোতৃ সংঘ শ্রোতাদের প্রতিষ্ঠান। শ্রোতা এবং শিল্পীদের সমস্ত স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখাই এই সংঘের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। বেতারের কল্যাণকামী বন্ধুরা শুনে খুশী হবেন কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের অধিনায়ক শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী এই সংঘকে স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রত্যেক বেতার শ্রোতার এই সংঘে যোগ দিয়ে সংঘকে শক্তিশালী এবং সক্রিয় করে তোলা উচিত। কেবলমাত্র এক টাকা চাঁদা দিয়েই 'শ্রোতৃ সংঘে'র সভ্য হওয়া যায়। শ্রোতৃ সংঘের আঞ্চলিক বৈঠক এবার বসবে দক্ষিণ কলিকাতায়—স্থান সম্ভবতঃ আশুতোষ কলেজ হলে। ডিসেম্বরের প্রথম দিকেই এই বৈঠক বসবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এ সম্পর্কে সম্পাদক, বেতার শ্রোতৃ সংঘ, ১৬।এ, ডাফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা : ৬-এ উৎসাহী শ্রোতারা চিঠি লিখতে পারেন।

সঙ্গীত বিভাগ

কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় বিভাগ হলো এইটে। এই বিভাগের কথা আগেই লেখা উচিত ছিল। বেতার বিভাগ পরিক্রমার শেষ পর্ব্বে এই আলোচনা করছি এই কারণে যে "বেশটুকু (শ্রেষ্ঠ) দিয়েই শেষ করা দরকার।"

কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের এই বিভাগই কলিকাতা বেতারের গর্ব্ব ও গৌরব।

এমন একদিন ছিল যখন বেতারে সম্ভ্রান্তবংশীয়া মেয়েরা সাহস করে আসতেন না। সঙ্গীত বিভাগে যাঁরা আত্মপ্রকাশ করতেন সমাজে তাঁরা 'ভাল নয়' বলে পরিচিত ছিলেন। ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বংশের বিধি-নিষেধের প্রাচীর ভেঙ্গে এগিয়ে এসেছিলেন প্রথম যে-মেয়ে তিনি কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গীত বিভাগের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রইলেন—তিনি **৺কুমারী পুষ্পরাণী চট্টোপাধ্যায়।** কুমারী পুষ্পরাণীকেই এই দিক দিয়ে **'প্রথমা'** বলা যেতে পারে যদিও তিনি ছোটদের প্রথম বন্ধু ৺গল্পদাদু পরিচালিত 'ছোটদের আসর'-এ প্রথম গান গাইতে আসেন এবং সান্ধ্য-সঙ্গীত আসরে উন্নীত হন।

তারপর ধীরে ধীরে বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের আগমনে বেতারের সঙ্গীত বিভাগ ভরে উঠতে থাকে।

সঙ্গীত বিভাগের স্মরণীয় অনুষ্ঠান **'মহিষাসুরমর্দ্দিনী'** —'বেতার-বিচিত্রা' আলোচনায় বিগত বারে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

'সঙ্গীত-আলেখ্য' (Musical Block Programme) সঙ্গীত বিভাগের এককালীন উপভোগ্য অনুষ্ঠান ছিল—এই ধরণের অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক ও পরিচালক ছিলেন **বাণীকুমার।** এই ধরণের বেতার-পাগল মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। সারা জীবন এঁর কেটে গেল বেতারের সেবায়। শ্রীযুক্ত ভদ্রের তবু সান্ত্বনা আছে বেতারের বাইরে তাঁর ক্ষেত্রটা খুব সঙ্কীর্ণ নয় বরং সাম্প্রতিককালে তা আরো বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু বাণীকুমার বেতারকে ইহকাল-পরকাল করেছেন—জীবনের শ্রেষ্ঠ যা কিছু দিয়েছেন কিন্তু বেতার এই মানুষটীকে যোগ্য সম্মান আজও দেয় নি। মূলতঃ সঙ্গীত বিভাগের বিস্তৃতি ও স্ফুরণের পিছনে এই শান্ত-সদাশিব মানুষটির দান অসামান্য। আজ সঙ্গীত-বিভাগ থেকে 'বেতার-বিচিত্রা' এবং 'সঙ্গীত-আলেখ্য' দুটিকেই একেবারে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বেতারের সঙ্গীত বিভাগ যে ম্লান ও বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়েছে সেকথা বলাই বাহুল্য।

সঙ্গীত-বিভাগের এই দু'টি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বেতারে সুরু হয়েছিল সুরের খেলা. কত শিল্পী, কত সুরকার এসে ভীড় করেছিলেন সেদিনের বেতারকে তা আজকে ভাবতে অবাক লাগে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে স্বর্গতঃ শিল্পী **শৈল দেবী, সুশীলা সেন মণিপুরী** প্রভৃতির নাম। সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে মনে পড়ে স্বর্গতঃ **হিমাংশু দত্ত, সুরসাগর, সুরনাথ মজুমদার, শচীন দেব বর্ম্মণ, গিরিণ চক্রবর্ত্তী, শৈলেশ দত্তগুপ্ত, বিনোদ চক্রবর্ত্তী** প্রভৃতির কথা। সঙ্গীত পরিচালকদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে কত নবাগত ও নবাগতা যে নতুন প্রতিভাধর শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই—আজকে বেতারে **'শিল্পী সৃষ্টি'** পথটাই কর্ত্তারা নিজেরা বন্ধ করে দিয়েছেন উপরোক্ত অনুষ্ঠান দুটির প্রচার বন্ধ করে দিয়ে। বিশেষ করে 'সঙ্গীত আলেখ্য' প্রতি সপ্তাহে প্রচারিত হতো এবং প্রতি সপ্তাহে নতুন সঙ্গীত-পরিচালক এবং নতুন শিল্পী দিয়ে এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হওয়ার কণ্ঠ-বৈচিত্র্যে এবং সুরমাধুর্য্যে অনুষ্ঠানগুলি অনিন্দ্যসুন্দর হয়ে উঠতো সেকথা বলা বাহুল্য। নতুন সুর ও নতুন রূপ নিয়ে এইসব অনুষ্ঠান মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বেতার-সঙ্গীত-বিভাগকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলো। কিন্তু আজকের বেতারে শিল্পী তৈরী এবং সুর নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা গর্ব্বভরে বলতে পারে কি ?

সঙ্গীত বিভাগের গর্ব্বের বস্তু পঙ্কজকুমার মল্লিক পরিচালিত **'সঙ্গীত শিক্ষার আসর'।** এই আসর বাংলা দেশে সঙ্গীত বিস্তারে শুধু সাহায্য করে নি উপরন্তু কিছু শিল্পী 'তৈরী' করতে সমর্থ হয়েছিল এবং আজও হচ্ছে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় ১৯৪০-৪১ সালে এই বেতার থেকে

'সঙ্গীত শিক্ষার আসর' শুধু বন্ধ করে দেওয়া হয়নি—প্রায় একশো দশ জন সঙ্গীত-শিল্পীকে কলিকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য দূরে রাখা হয়েছিল—অবশ্য কারণটা আর কিছু নয় সেদিনের বেতারে কর্ত্তার গদি যাঁরা দখল করেছিলেন তাঁদের নামে নানা দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। বেতার থেকে পোষ্য-পোষণ দূর করবার জন্যে সামান্যতম সন্দেহে বহু স্বনামধন্য শিল্পীকে দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়—কেবল পঙ্কজ মল্লিক ন'ন—আজকের বেতার যাঁদের নিয়ে গর্ব্ব করে সেই বিজন ঘোষ দস্তিদার, সুপ্রীতি ঘোষ, সুরকার সুরনাথ মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম, সেতারী শোভা কুণ্ডু (অধুনা ঘোষ) প্রভৃতিকে বেতার থেকে দূরে রাখা যায়—বেতারের সবচেয়ে **মসীলিপ্ত যুগ** এটা।

পঙ্কজকুমার মল্লিককে বাদ দিয়ে 'সঙ্গীত-শিক্ষার-আসর' পরিচালনা হাস্যকর, সেকথা বেতার কর্তৃপক্ষ বুঝে এবং জনমতের চাপে পড়ে তাঁকে বেতারে আবার ফিরিয়ে আনেন।

সঙ্গীত বিভাগের **স্বর্ণ যুগ** বলতে আমি বুঝি ১৯৩৬-১৯৩৯ এই কটা বছরকে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গীত বিভাগ কি কণ্ঠ-সঙ্গীতে, কি যন্ত্র-সঙ্গীতে আশ্চর্য্য সমন্বয় রেখে ক্রমোন্নতি করে বললে ভুল বলা হবেনা—এই বিভাগ পৌঁছেছিল ক্রমোন্নতির শীর্ষে—সঙ্গীত-বিস্তারে ব্যঞ্জনার রচনায় তা নিখুঁত হয়ে উঠেছিল।

কণ্ঠ-সঙ্গীতে নতুন বৈচিত্র্যময় সুরের মায়াজাল বুনলেন আত্মভোলা **কবি ও সুরকার কাজী নজরুল ইসলাম।** বাংলা দেশের সঙ্গীতে তিনি আনলেন নতুন আবেগ, ছন্দ, সুর ও গতি। তাঁর প্রবর্ত্তিত সুর ও গান আজকের বেতারে 'নজরুল-গীতি' নাম নিয়ে নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজও বেঁচে আছে। কবি নজরুল ইসলাম বাংলা দেশের সঙ্গীতকে যেমন রচনা ও সুরবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করে গেছেন তেমনি শিল্পী-তৈরীও তিনি নেহাৎ কিছু কম করে যান নি—যে বেতারের তাঁর কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিল বাংলা দেশের সেই বেতার অকৃতজ্ঞভাবে



তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে বেতার থেকে বিদায় করে দিয়েছিল। এটা কলিকাতা বেতারের **ঘৃণ্যতম অপরাধ।** বেতার ত্যাগ করে যাবার কিছুকাল পরেই তাঁর মানসিক বিকলতা আসে। আমার তো মনে হয় বাংলা দেশের বেতার বাংলার এই শ্রেষ্ঠ সুরকার ও রচয়িতাকে **হত্যা** করেছে।

এই 'স্বর্ণময় যুগে' বেতারের সঙ্গীত বিভাগের আর একজনের বিস্ময়কর প্রতিভার উল্লেখ না করলে খুবই অন্যায় হবে। যন্ত্র-সঙ্গীত নিয়েই ছিল এঁর কারবার। সুর-পাগল আত্মভোলা লোক—বেতারে যোগ দিয়েই তিনি যন্ত্র-সঙ্গীত রাজ্যে আনলেন আলোড়ন, নতুন করে সংগঠন করলেন যন্ত্রীদের, বহুজনাকে হাতে করে শিক্ষা দিলেন—গড়ে উঠলো 'বেতার যন্ত্রী সংঘ'—বিদেশী যন্ত্রের কোন রকম সাহায্য না নিয়েই তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের যে যুগ প্রবর্ত্তন করেছিলেন যন্ত্রসঙ্গীতের রাজত্বে তা ভাবতেও অবাক লাগে। এই অদ্ভুত প্রতিভাধর লোকটি শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ নিয়ে এ পৃথিবীতে এসেছিলেন। এঁর নাম **স্বর্গতঃ সুরেন্দ্রলাল দাশ**—বেতারে **'ঠাকুর্দ্দা'** নামে সুপরিচিত ছিলেন। যন্ত্রসঙ্গীতের রাজত্বে এঁর পরিক্রমন বিস্ময়কর এবং সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। যন্ত্রসঙ্গীত ছিল ধ্যান, সাধনা ও স্বপ্ন। তাই বিবিধ যন্ত্র নিয়ে বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তার সুসম সমন্বয় ঘটিয়ে যন্ত্রসঙ্গীতের রাজত্বে তিনি দিয়েছিলেন প্রাণের স্পর্শ—আজকে ভাবতেও লজ্জা আসে বাংলা দেশের অকৃতজ্ঞ বেতার তাকে যোগ্য শ্রদ্ধা সম্মান তো দেয় নি, উপরন্তু চরম অবজ্ঞা প্রকাশ করেছে। এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভার উত্তরাধিকারিণী তাঁর কন্যা সেতারী **বাসন্তী দাশকেও** বেতারে জায়গা দিতে চায়নি—পোষ্যপোষণ বেতার থেকে দূর করতে গিয়ে কলিকাতা বেতার প্রতিভাবানদের বিদায় করেছে বেতার থেকে।

১৯৪০-৪১ সালের কথা মনে হলে লজ্জা পাই। তখনকার, সঙ্গীত-বিভাগের কর্ত্তা ডক্টর **সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর** (পরিচয় গ্রামের সম্পর্কেই বা যে দিক দিয়েই হোক) সঙ্গে পরিচয় থাকাটা যেন অপরাধজনক হয়ে ওঠে। তুচ্ছতম। কারণে 'বিনা বিচারে বন্দী'দের মতো বেতার থেকে নির্ব্বাসন করা হয় বহু তরুণ ও প্রতিভাধরদের। এর মধ্যে আমার মনে পড়ে সঙ্গীত-শিল্পী **বীরেন বিশ্বাসের** কথা। প্রসিদ্ধ গায়ক গিরীণ চক্রবর্ত্তীর উত্তর সাধক হিসাবেই এঁকে আমার অভিহিত করতে ইচ্ছা হোত সে সময়ে। বেতারে নিগৃহীত এই শিল্পী আজ 'বৃত্তিচ্যুত' করেছেন নিজেকে কলিকাতা বেতারের ওপর অভিমানে। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর আসছে অন্য বৃত্তিতে নিযুক্ত হওয়ায় কিন্তু বাংলা দেশ বেতার কেন্দ্রের অকারণ অত্যাচারের ও অবিচারের দরুন একজন প্রতিভাধরকে হারিয়েছে—আমার প্রতিবাদ সেইখানেই। এমনি করে বেতারের অন্ধকারে অসংখ্য প্রতিভাধরদের 'গুমখুন' করা হয়েছে বাংলা দেশে বেতারে।

ডক্টর সুরেশ চক্রবর্ত্তী ও শচীন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্যের (এলাহাবাদের বিখ্যাত ভট্টাচার্য্য পরিবারের ছেলে ইনি) রাজত্বকালে বেতারে অনেক নতুন জিনিসের প্রবর্ত্তন ঘটে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পণ্ডিত **আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী** মহাশয় কর্ত্তৃক দোঁহাকার আধ্যাত্ম জীবন দর্শনের ব্যাখ্যা এবং সঙ্গীত রূপারোপ। এটা ছিল সে-সময়কার মনে রাখবার মতো অনুষ্ঠান।

তারপর অনেক দিন গেছে—সে সময়ে বেতারের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁরা ছিলেন সৃষ্টির উন্মাদ আনন্দে ভরপুর—টাকাটা সে-জীবনে বড় জায়গা অধিকার করে ছিল না বলেই বেতারের বিভিন্ন দিকে এত অগ্রগতি ও উন্নতি ঘটেছিল। আজকে যাঁরা বেতারের বিভিন্ন বিভাগের কর্ত্তার গদি দখল করে বসে আছেন তাঁদের একমাত্র চিন্তা হচ্ছে কাউল-পওর ঠিক রাখা. চাকুরী বজায় রাখা [illegible] ঢাউয়ের গতিতে ওপর দিকে ওঠার 'খিড়কি দরজা' [illegible]। বেতারের বিভিন্ন বিভাগের উন্নতি নয় আত্মোন্নতিতে ব্যাকুল-কাতর-লালসা তাঁদের সর্ব্বাঙ্গে তাই বেতারে শিল্প-সৃষ্টি ও শিল্পী-তৈরী আবার নতুন করে হবে না এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

কলের জল আসার মতো সহজ লভ্যতার মধ্যে দিয়ে নিত্যকার অনুষ্ঠান আজো বেতারে প্রচার হয়। বৈচিত্র্য, আনন্দ, নতুনত্ব, প্রাণ কিছুই নেই এতে। পথ দিয়ে চলতে চলতে রাস্তার কলে টুকরো কাট-গুঁজে দেওয়া কলে অবিরত ধারায় কলের জল পড়ে যেতে দেখেছি, হয়তো আপনারাও দেখেছেন। যার দরকার হচ্ছে সে জল নিয়ে যাচ্ছে। ঝরঝর করে অকারণে জল পড়ে যাচ্ছে। কি জানি কেন পথের ধারে কলের জলের এই বিরামবিহীন ঝরঝরানি আমাকে কলিকাতা বেতারে প্রচারিত অনুষ্ঠানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আজকের বেতার বিরামহীন অনুষ্ঠানের উৎস—তার মধ্যে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই।

আজকের বেতারের দেবতারা চান সমস্ত শিল্পীরা নতজানু হয়ে তাঁদের কাছে প্রোগ্রাম প্রার্থনা করুক। কর্ত্তারা নড়ে থাবেন না. কেবল চেয়ার জুড়ে বসে চাকুরী রক্ষা করবেন। তাই বেতার-কর্ত্তাদের চাকুরীই বেতারে রক্ষা হয়—ক্ষয়িষ্ণু শিল্প ও শিল্পী-জীবনে প্রাণের আহ্বান আনবার চেষ্টা হয় না।

বেতার-কর্ত্তাদের মানসিক পরিবর্ত্তন এবং চিত্তদারিদ্র্য যতদিন না বদল হচ্ছে ততদিন বেতারের উন্নতি কল্পনা মাত্র।

বেতারের প্রথম যুগ থেকে সঙ্গীত-বিভাগের সঙ্গে শিল্পী হিসাবে যুক্ত ছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে বেশী করে মনে পড়ে **কৃষ্ণচন্দ্র দে** (অন্ধ গায়ক), **আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা, উত্তরা দেবী** এঁরা আজও আছেন বেতারে আজকের এটাই সবচেয়ে বড়ো কথা।

সঙ্গীত বিভাগের আলোচনা শেষ করবার আগে বেতারের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের বেতার থেকে দূরে সরিয়ে রাখার তীব্র প্রতিবাদ না করে পারি না।

শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পী **সুচিত্রা মিত্র**। বেতারের সঙ্গীত আসরে দীর্ঘকাল ধরে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে না।

বাংলা দেশের নামী মেয়ে **বিজন ঘোষ দস্তিদার** বেতারের বাইরে, কিন্তু কেন? বেতার-কর্ত্তাদের সঙ্গে তাঁদের যে বিষয় নিয়েই বিরোধ থাকুক না কেন—বাংলা দেশের শ্রোতারা কর্ত্তাদের অন্যায় জেদের জন্য কেন সুজন শিল্পীর সঙ্গীত-পরিবেশনথেকে বঞ্চিত হবেন? শ্রোতারা একযোগে দাবী করলে প্রতিবাদ জানালে এই ধরণের অন্যায় জেদ ও ভেদের প্রাচীর তাসের বাড়ীর মতো ধ্বসে পড়বে।

কলিকাতা বেতারের সঙ্গীত বিভাগ বহু গুণীর সংস্পর্শে এসে ধন্য হয়েছে—তাঁদের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু সেই উন্নতির ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্যে কোন উত্তর সাধকের আগমন ঘটেনি—যাঁরা এসেছেন তাঁরা বারে বারে সে-গতিকে রুদ্ধ করেছেন; উন্নতির উৎস-মুখকে করেছেন নষ্ট।

সাম্প্রতিক কালের আর একজনের একটু বিশেষ পরিচয় দিতে ইচ্ছে করে—ইনি ডক্টর সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। কলিকাতা বেতারের সঙ্গীত বিভাগকে ইনি যেভাবে সমৃদ্ধ করেছেন তার তুলনা হয় না। এঁরই উৎসাহে কাজী নজরুল ইসলাম, স্বনামধন্য স্বর্গতঃ গিরিজা-শঙ্কর চক্রবর্ত্তী শচীন দেব বর্ম্মণ প্রভৃতি সুরকার সুর নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ডক্টর চক্রবর্ত্তী নানা গুণীকে বেতারে আহ্বান করে এনেছিলেন। তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বিদ্যালয়গুলি **বাসন্তী বিদ্যা বীথি, সঙ্গীত শিক্ষালয়** প্রভৃতি সঙ্গীত আসরে সঙ্গীত পরিবেশন করে বেতারের সঙ্গীত অনুষ্ঠানকে উপভোগ্য করে তুলেছিলেন। আজ ডক্টর চক্রবর্ত্তী রাগে ক্ষোভে অভিমানে বেতারের কর্তৃত্ব পদ থেকে নিজেকে অপসারিত করে নিয়ে বেতারের বাইরে অবস্থান করছেন। অবশ্য খুব সম্প্রতি সঙ্গীত বিভাগের বিচিত্র বিকাশ নিয়ে আলোচনা করছেন বেতার-বৈঠকে। গুণী এবং সত্যকার রসজ্ঞ হলেও এঁর প্রধান ত্রুটী এঁর বাচনিক বিকৃতি। সঙ্গীত-শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানসঞ্চয় করলেও কেবলমাত্র বাচনিক ত্রুটির জন্য আলোচনাগুলির রসগ্রহণে ও উপলব্ধিতে বহু বাধা দেয়। এঁর উচিত লিখিত ভাষণগুলি অন্য কাউকে দিয়ে পড়ানো অথবা নিজের ত্রুটি সংশোধন করে নেওয়া। বেতারের সঙ্গীত বিভাগ এদেশের সঙ্গীতে বিপুল আলোড়ন আনতে পারে, আবিষ্কার ও অন্বেষণ করে নিতে পারে বহু প্রতিভাধর ও নতুন শিল্পীকে কিন্তু বেতারের সেই উৎসাহী কর্ম্মপাগল কর্ম্মী কই?—কোথায় সেই দীপঙ্কর?

লণ্ডন-'বিচিত্রা'

বেতার বিভাগ পরিক্রমা শেষ করবার আগে এই অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে কিছু না বললে ত্রুটি থেকে যাবে। ১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশনে (B.B.C.) কলিকাতা বেতারের সহকারী অনুষ্ঠান পরিচালক শ্রীকমল বোস যোগদান করেন এবং প্রতি শনিবার আধঘণ্টার জন্য বাংলা ভাষায় লণ্ডন থেকে যে-অনুষ্ঠান প্রচার করতে থাকেন তা স্বল্পকালের মধ্যে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে—এই অনুষ্ঠানের নাম '**বিচিত্রা**'। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এই ধরণের অনুষ্ঠান প্রচারিত হলেও শ্রীযুক্ত বোসের যত্ন, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠায় বাংলা ভাষায় প্রচারিত অনুষ্ঠানটি সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কলিকাতা বেতার কর্তৃক পুনঃপ্রচারের ফলে স্থানীয় শ্রোতাদের শোনবার সুবিধা ঘটায় এই অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পায়। অনুষ্ঠানটির জন্ম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে ঘটেছিল মূলতঃ এর লক্ষ্য ছিল গত বিশ্বযুদ্ধে 'অক্ষশক্তির' প্রচার-কার্য্য চালানো কিন্তু পরিচালনার গুণে এই অনুষ্ঠানটি বাংলা দেশ এবং লণ্ডনে বা ইউরোপে প্রবাসী বাঙালীর মধ্যে একটা যোগসূত্র হয়ে ওঠে। বাংলা দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, তার

সঙ্গীত ও সাধনাকে এই 'বিচিত্রা' মাধ্যমেই বিদেশীদের কাছে তুলে ধরার সুযোগ শ্রীযুক্ত বোস করে দেন। 'বিদেশীর চোখে বাংলা', 'বিদেশে বাঙালী' প্রভৃতি অভিনব অনুষ্ঠানগুলি 'বিচিত্রা'র বড় সম্পদ হয়ে ওঠে—আজও 'বিচিত্রা' এই সংযোগ রক্ষা করে চলেছে। ১৯৪৮-৪৯ থেকে কলিকাতা বেতার কর্তৃক পুনঃপ্রচার বন্ধ করে দেওয়ার ফলে স্থানীয় শ্রোতারা এই অভিনব অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন—এই নিয়ে প্রতিবাদও কম হয় নি—'বিচিত্রা' কলিকাতা বেতারের প্রধান আকর্ষণ ছিল—কলিকাতা বেতারের জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে একে একে অনেক কিছুই বন্ধ করে দিয়েছেন বেতারের কর্তারা নিজেদের খামখেয়ালীপনায়—'বিচিত্রা' বন্ধ করে কলিকাতা বেতার নিজেদের বৈচিত্র্যের অংশটা একেবারে কামিয়ে এনেছেন। বিচিত্রা' কলিকাতা কর্তৃক পুনঃপ্রচারিত না হলেও 'রেডিও সিলোন' সম্প্রতি এটি পুনঃপ্রচার করার ব্যবস্থা করেছেন। প্রতি শনিবার রাত ৭-৪৫ মিঃ ১৩ ও ১৯ মিটারে লণ্ডন থেকে 'বিচিত্রা' প্রচারিত হচ্ছে। কোন্ দূর দেশে বসে বাংলা দেশের একটি ছেলে বাংলা দেশ ও বাঙালীদের উদ্দেশ্যে আবেগ কম্পিত কণ্ঠে শ্রদ্ধা আজও জানায় এই বলে :

'হে বাঙালা, বাঙালীর লহ নমস্কার'!

'বেতার-জগৎ'

কলিকাতার বেতার কেন্দ্রের মুখপত্র 'বেতার জগৎ' দিয়ে আমার আলোচনা শেষ করব।

বাংলা দেশের সব্যসাচী মহাস্থবির সাহিত্যিক-পরিপরিচালক শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী এর প্রথম সম্পাদক। তখন বেতারের আদি যুগ—বেতার পাগল মিঃ ষ্টেপলটনের যুগ। 'বেতার জগৎ'কে প্রতিষ্ঠিত ক'রবার জন্যে তাঁর কি তাড়া! এই তাড় খেয়ে স্বয়ং সম্পাদককেই বিজ্ঞাপনের খোঁজে বেরোতে হতো—কখনো কখনো শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র ভদ্রকেও। 'বেতার জগৎ'-এর চাহিদা আছে এই কথা সাহেবকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবার জন্য অনেক সময় এঁরাই 'বেতার জগৎ' এর কপিগুলো কিনে নিতেন। তখন এর দাম ছিল দুপয়সা। এতে থাকতো অনুষ্ঠান-লিপি, এই সম্পর্কীয় দু'চারটা কথা আর বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকারই 'বেতার জগৎ'কে জাতে তোলবার চেষ্টা করলেন। তিনিও পাগলা ষ্টেপলটনের তাড়া খেয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত সরকার অধুনা শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে আছেন। হাসির গানে তাঁর নামও নেহাৎ কম ছিল না। কলিকাতা বেতারের তিনি **প্রথম সরকারী পেনসনপ্রাপ্ত লোক**। যাহোক তিনি 'বেতার জগৎ'-এর বহুবিধ সংস্কার ক'রে ছিলেন—শিল্পীদের ছাব ছাপা তাঁর যুগ থেকেই সুরু হয়। তবে তাঁরও ত্রুটি ছিল কিছু—বেতারে স্বনামধন্য ও গুণী ব্যক্তিরা যে বক্তৃতা দিতেন তা বেতারেই ফাইল চাপা পড়ে থাকতো। পত্রিকাকে সাহিত্য পদবাচ্য ক'রে তোলার চেষ্টা তিনি করেন যখন তাঁর পেনসন নেবার সময় হলো।

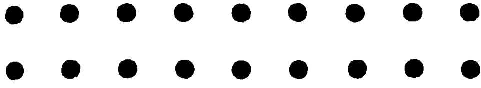
তবে তাঁর সময়ে আর কিছু থাক না থাক অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ থাকতো—শিল্পীদের নাম, গাইবার সময় কাল, কি ধরণের গান, গানের প্রথম লাইন প্রভৃতি যেমন থাকতো তেমনি বিভাগীয় অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণও থকতো—আজকের দিনের 'বেতার জগৎ' অনুষ্ঠান মুদ্রণের নামে কর্তারা যে ছেলেখেলা? বোল-খেলা করেছেন তা কর' হ'তো না। আজকে বেতারে প্রদত্ত বক্তৃতা, গল্প, কবিতাগুলি 'বেতার জগৎ'-এ ছাপা হলেও মুদ্রণ-পারিপাট্য সত্ত্বেও বানান ভুলে যে হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তা উল্লেখযোগ্য। আনিমা ঘোষ-এর জায়গায় আনিমা মোম হলে আনিমা নামক বঙ্গবালার মনের ও মুখের চেহারা কি হয় তা মনে করার আগে পাঠক উচ্চহাস্যে ফেটে পড়বেন নিশ্চয়ই।

বেতার উন্নতি করুক আর নাই করুক—'বেতার জগৎ' অসম্ভব উন্নতি করেছে, সুরুচিরও প্রশংসা করবে। তবে অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ যদি না-ই রইলো তাহলে অনুষ্ঠান-লিপি ছেপে লাভ কি—অনুষ্ঠান-লিপির পুরো বিবরণ আজকের বেতার-শ্রোতাদের দাবী।

আগামী মাস থেকে নতুন ধারায় ও নতুন রীতিতে 'বেতার-বন্ধু' বেতার সমালোচনা সুরু করবেন।

রঙীন ছবির হুজুগ

বিমল রায়



[বোম্বাই চিত্রজগতে যোগদান ক'রে বাঙলা দেশের যে কজন পরিচালক বিশেষ কৃতিত্ব এবং বাঙলার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন তার মধ্যে বিমল রায় অন্যতম। 'উদয়ের পথে', 'অঞ্জনগড়', 'মন্ত্রমুগ্ধ', 'মা' (হিন্দী) প্রভৃতি চিত্রের পরিচালক বিমল রায়ের এই রচনাটি গত শারদীয়া 'চিত্রবাণী'র জন্য লিখিত। কিন্তু রচনাটি বিলম্বে পাওয়ায় ঐ সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু চিন্তাশীল পাঠকপাঠিকার আগ্রহ উদ্দীপ্ত করবে। — 'চিত্রবাণী'-সম্পাদক]

বিজ্ঞানের উন্নতিতে আজ অনেক কিছু সম্ভব—কত অসম্ভবকে সে আজ করেছে সম্ভব। আজকের চিত্রশিল্প অনেকটাই বিজ্ঞানের কাছে ঋণী। কিছুদিন আগেও যা ছিল মুখে মুখে শোনার জিনিষ, একদা সেই পেল কথা গেঁথে ভাব ও স্থান বিচার ক'রে নাটকরূপে তাকে মঞ্চে রূপ দেওয়ার অধিকার ও সেইসঙ্গে একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিতও সে দিল। আজ সেই পেল একেবারে রাজকীয় সম্মান—পর্দায় রূপ দেওয়ার অধিকার—এ সম্মান অভূতপূর্ব জয়যাত্রার পথে একটা অসমসাহসিক পদক্ষেপ!

প্রথম যুগের চিত্রশিল্পের সঙ্গে আজকের দিনের চিত্রশিল্পের তুলনা করলে সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়। প্রথমে তোলা হ'ল শুধু ছবি—ছায়ার চলা-ফেরার ওপরই তার দখল। পরে এল শব্দ-বের হ'ল সবাকচিত্র। আর আজ—শুধু কথা নয়, শুধু ছায়া নয়, গান, সুর, ছন্দ, নৃত্য, তাল সব—আর কি চাই! এক এক ধাপে এক একটা আকাশচুম্বী উন্নতি। মানুষ মুগ্ধ, স্তম্ভিত, দিশেহারা; শুধু সেখানেই শেষ নয়, তারপর যা এল সে তারো চমকপ্রদ; আরো চাকচিক্যপূর্ণ, কথার সঙ্গে গান আর ছবির সঙ্গে সঙ্গে রং—একেবারে সোনায় সোহাগা—এত-যে অভাব ছিল তা' আজ পূর্ণ হ'য়ে গেল।

রঙীন ছবি দেখানো হবে শুনলেই মানুষ আনন্দে নেচে ওঠে; সত্যি কথা, ভাল যা তা' সবসময়েই ভালো—সকলের রুচিকে বজায় রেখে যে জিনিষ দেওয়া যায় তার দাম অনেক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের দেশের পক্ষে এই যে একটা রঙীন ছবি তোলার হুজুক এসেছে তা আজকের অর্থনৈতিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেশের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। সেই সম্বন্ধেই আমার অভিমত ব্যক্ত করছি। এ অভিমত ভালো কি খারাপ তা' বলতে পারিনা—আমার দৃষ্টিতে যা' ধরা পড়েছে শুধু তাই ব'লব।

বিজ্ঞানের যতটুকু উন্নতি অন্যান্য দেশে আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হ'য়েছে, আমাদের দেশে ততটা এখনও সম্ভব হয় নি। তার কারণ হয় ত' বহুবিধ। নিছক চিত্রশিল্পের দিক থেকে দেখতে গেলে দেখতে পাই, যে ছবি আজ আমাদের চোখের সামনে সর্ব্ববিষয়ে আমাদের ব'লে দাবী করছে তার প্রতিটি খুঁটিনাটি জিনিষ পর্য্যন্ত বিদেশে তৈরী—সেখান থেকে যন্ত্র এমনকি যন্ত্রী আনিয়ে আমরা চিত্রশিল্প গ'ড়ে তুলেছি। এ শিল্পের যন্ত্রপাতির দিক থেকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল আজও আমরা হ'তে পারি নি। আগে তারই সম্পূর্ণতা প্রয়োজন এবং তারই ওপর ভিত্তি ক'রে বিচার করতে হবে রঙীন কি রংবিহীন চিত্র তার সৌন্দর্য্য বাড়াবে।

আমাদের দেশের চিত্র-পরিচালক ও প্রযোজকরা মনে করেন যতবেশী টাকা খরচ ক'রে ছবি তোলা যাবে ততই ছবির দাম বাড়বে। এমনিতেই যে সমস্ত ছবি আজ পর্য্যন্ত তোলা হয়েছে, তার পেছনে কয়েক লাখ টাকার নীচে কোন অঙ্ক চোখে পড়ে না। তার কারণ কি বেশী টাকা আছে বলেই বেশী টাকা খরচ করতে হবে—না, টাকা বেশী ঢাললে বেশী টাকা আসবে—কোন্‌টা? যা-ই ভেবে থাকুন না কেন এপথ সম্পূর্ণ ভুল পথ তা' হয়তো এতদিনে তাদের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। না উঠলেও তা' ফুটতে বেশী দেরী নেই।

তার ওপর এসেছে আবার রঙীন চিত্রের যুগ—দু-চার-পাঁচ লাখ টাকা খরচ ক'রে তাদের তৃপ্তি হ'ল না—এবার বড় দাঁও—একেবারে ৩০ থেকে ৫০ লাখ-টাকা

খরচের ফিরিস্তি নিয়ে বসেছেন, আর তা না হবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই—ব্যবসা তো ! যেভাবেই হোক টাকা লুঠতে হবে। আর বিংশ শতাব্দীর যুগে যার বেশী চাকচিক্য, যার বেশী জৌলুষ, তারই হাতে তো বাজার ! আর বাজার হাতে রাখবার জন্যই চাই রঙীন চিত্র—বিজ্ঞান যখন এত সুযোগ ঘরের দোর-গোড়ায় পৌঁছে দিয়ে গেছে তখন আর পায় কে !

কিন্তু ব্যাপার যত সোজা ভাবা যায় তত সোজা নয়। বেশী টাকা তোলার আশা আকাশকুসুম ছাড়া আর কিছু নয়। অন্ততঃ আজকের ভারতবর্ষের দিকে চেয়ে সে কথা বলা চলে। জনসাধারণ একে দরিদ্র, দ্বিতীয়তঃ করভারে প্রপীড়িত—খাদ্যহীনে শীর্ণ, বেকার-সমস্যায় ধ্বংসোন্মুখ, এদের সামনে এত টাকার ছবি তুলে এদের মনোরঞ্জন ক'রে তার বেশী টাকা, মানে লাভের অঙ্ক তোলা বড়ই শক্ত ব্যাপার ! এখানে শুধু ব্যবসা-বুদ্ধি খাটালে চলবে না, হৃদয়বুদ্ধিও খানিকটা খাটানো উচিত।

তা' ছাড়া যে খরচের একটা রঙীন ছবি তোলা হবে—ঠিক সেই খরচেই আরো কম ক'রে ১০।১২খানা ভাল ছবি তোলা যেতে পারে। যদি আমাদের দেশে রঙীন চিত্র নিয়ে গবেষণা হ'ত বা তার মালমশলা, সাজ-সরঞ্জাম এতটা দামী না হ'য়ে সুলভ হ'ত তবে যে-টাকা ছবি তোলার জন্য বা ছবিকে 'প্রিণ্ট' করার জন্যে বিদেশে প্রেরণ করা হয়, সে টাকা দেশে থেকে যেত। সত্যি, যে-টাকায় ছবি তোলা হয় তার প্রায় অর্দ্ধেকের মত টাকা বিদেশে চলে যায়। যদি তা' সম্ভব হ'ত তখন ডবল রঙীন ছবি তুললেও কেউ প্রতিবাদ করতে আসতো না।

একেই তো ভারতবর্ষ গরীব, শিল্পপ্রধান দেশ নয়, যা কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ, তাদের সবেতেই বিদেশী ছাপ-মারা মূলধনে বাজার ছাওয়া,—লাভের বেশী অংশ চলে যায় বিদেশী ধনাগারে—তার ওপর যদি না ভেবে-চিন্তে, সুফল-কুফলের দিকে মোটেই নজর না দিয়ে, শুধুমাত্র হুজুগে মেতে এতগুলি টাকা ধূলোর মত মুঠো মুঠো উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা শিল্পপতিরা জেনে-শুনে করেন, তবে শিল্পের ইতিহাসে এটা খামখেয়ালীর একটা চরম দৃষ্টান্তস্বরূপই থেকে যাবে। ধ্বংসোন্মুখ এই শিল্পকে আরও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দেওয়া ছাড়া হয়তো এর থেকে অন্য কোন সুফল পাওয়া যাবে না।

দোষ শুধু একটা নয়—যে টাকা ব্যয় করে তাঁরা ছবি তুলছেন ব্যবসার দিক থেকে তার চেয়ে বেশী টাকা না তুলতে পারলেই তো ব্যবসা অতলতলে তলিয়ে যাবে বলে মরাকান্না সুরু ক'রে দেবেন; দোষ গিয়ে পড়বে জনসাধারণের ঘাড়ে—যেহেতু, যত বেশী লোকের ছবি দেখা দরকার—তত বেশী লোকে দেখলো না। এমন জিনিষের মর্ম্ম তারা বুঝলো না, অতি মূর্খ, অতি নির্ব্বোধ, তা' নয় তো দেশের আজ এই অবস্থা হবে কেন। জ্ঞানে বিজ্ঞানে আজ না হয় কত উন্নতি হ'তে পারতো হোলো না কেবল···············

এই ধরণের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে মিষ্ট কথায় উড়িয়ে দিতে চাইবেন। জনসাধারণ মর্ম্ম বুঝল না বা তারা বেশী পরিমাণে কেন দেখলো না। কি তার দোষ, কি তাদের অভিযোগ এই সমস্ত বিষয় কেউ একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন আসল সমস্যাটা কোথায়? যে পাইকারী হারে জলের মত টাকা ঢেলে তাঁরা রঙীন ছবি তুললেন সেই পরিমাণ টাকা থেকে কি পরিমাণ টিকিট বিক্রী হ'লে লাভ হ'তে পারে—তাঁরা তা ভেবে দেখেন নি। সাধারণ ছবির বেলায় যে বিক্রী হয় তার চেয়ে ১০ কি ১২ গুণ বেশী বিক্রী হ'লে তবে লাভ হতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, শুনতে পাওয়া যায় সাধারণ ছবিই অনেক সময় মার খায়—মানে, আশাতীতরূপ বিক্রী হয় না। তবেই বুঝতে পারা গেল যে বিক্রী বজায় রেখে লাভ তুলতে হ'লে টিকিটের মূল্য কম ক'রে দ্বিগুণ করা উচিত। অর্থাৎ দিনে-দুপুরে ভদ্রভাবে ঘরে ডেকে এনে জনসাধারণের পকেটে হাত চালিয়ে দেওয়া। ফলে, তাঁরা দূর থেকেই প্রণিপাত ক'রে সভয়ে দূরে সরে পড়েন। ছবি দেখার আশা তাঁদের মনের মধ্যেই গুমরে মরে।

তা' ছাড়া বড় বড় সহর বাদ দিয়ে ছোট ছোট মফঃস্বল সহরের প্রেক্ষাগৃহগুলিতে এই রঙীন চিত্র দেখানো অত্যন্ত অসুবিধাজনক। সেখানকার প্রেক্ষাগারগুলির অপ্রসারতা, প্রয়োজনীয় আলোর অভাব—এ সমস্ত কারণে বড় বড় কয়েকটা সহরে প্রেক্ষাগৃহ ছাড়া বাইরে এইসব ছবি দেখানোতে ভয়ানক অসুবিধে রয়েছে। ছবি তুলে যদি দেখানোই না গেল তবে এমন ছবিতে কাজ কি?

যে কতকগুলি অসুবিধাজনক পরিস্থিতির জন্যে রঙীন ছবি এখন আমাদের দেশে তোলা এবং দেখানো বিশেষ ক্ষতিকর তা' বলা হ'ল। অন্ততঃ আজকের দিনের জনসাধারণের এই আর্থিক দুর্দ্দশায় এ ছবি থেকে প্রযোজকেরা যে লাভবান হবেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে এবং ব্যবসার দিক থেকেও তা' না হওয়া সত্যিই মারাত্মক!

ন·তু ন না ট ক

মিনার্ভায় 'কেরাণীর জীবন'

গত ২৩শে অক্টোবর নূতন নাটক "কেরাণীর জীবন" মঞ্চস্থ হয়েছে 'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চে। নাটক রচনা ক'রেছেন সৌখিন সম্প্রদায়ের নাট্যকার ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালনা ক'রেছেন রঞ্জিৎ রায় আর শিক্ষকতা ক'রেছেন সন্তোষ সিংহ। এই নাটকের প্রযোজনায় মিনার্ভার প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন নিউ থিয়েটার্স-খ্যাত জলু বড়াল।

সওদাগরী অফিসের হেড ক্লার্ক বা বড়বাবু বিধুভূষণ মুখুজ্যেকে দশটা-পাঁচটা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে বকাটে ছেলে, বিধবা মেয়ে ও অন্যান্য পরিবার-পরিজন প্রতিপালন করতে হয়। বাড়ীওয়ালা, মুদি, গোয়ালা, কয়লাওয়ালা প্রভৃতি পাওনাদারদের নিত্যনৈমিত্তিক তাগিদে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেও কাউকে সে চটাতে পারে না, কাউকে কিছু দিয়ে কাউকে মিষ্টি কথা বলে বিদায়ের চেষ্টা করে, বলে,—"পালিয়ে তো আর যাচ্ছিনে।" কিন্তু সংসার ক্রমশঃ অচল হ'য়ে ওঠে, বয়াটে বড়ছেলেটা মদ খেয়ে খেয়ে যক্ষ্মা বাধিয়ে আসে—তার চিকিৎসার খরচও আছে। নানা দুশ্চিন্তায় ও হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে বিধুও অসুখে পড়ে, দেখা দেয় সঙ্কট। এদিকে অফিসে একদিন 'লেট' হওয়ায় ছোটসাহেব মিঃ গুহ অত্যন্ত ইতরভাবে তাকে গালাগালি করে, যা' বিধুর একুশ বছরের চাকুরী-জীবনে কোনও দিন ঘটে নি। ক্রমাগত এমনি ব্যবহারে মানসিক দিক দিয়ে বিপর্য্যস্ত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে সে। এই অবস্থায় সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অবশ্য বড়সাহেবের দয়ায় অফিসে মেজমেয়ে মিনুর চাকুরী হওয়ায় কিছুটা সুরাহা হলেও শেষ পর্য্যন্ত স্ত্রী ও বড়মেয়ে মাধুর গহনাপত্রও বিক্রী হ'তে লাগলো। তার ওপর বড়ছেলে পটলের অসুখ হ'ল বাড়াবাড়ি, সে-মারা গেল, দুর্ব্বল-স্বাস্থ্য বিধু এই ধাক্কা সামলাতে পারল না, সেও হার্টফেল ক'রে মারা গেল —এখানেই নাটকের শেষ।

কেরাণীর জীবন চিত্রিত ক'রতে গিয়ে নাটকে যা' দেখানো হয়েছে; তা' সত্যকার কেরাণী-জীবনের চিত্র না হয়ে, হয়ে উঠেছে কেরাণী-জীবনের ব্যাঙ্গাত্মক বিকৃতি। এই নাটকের কেরাণী সাধারণভাবে ফাঁকিবাজ, আড্ডাবাজ আর অফিসারের সমালোচক,—বিশেষ ক'রে কেরাণী নিবারণের মুখে যে গানখানা দেওয়া হয়েছে কিংবা অপর একটি কেরাণীকে দিয়ে যে-কবিতাটি পড়ানো হয়েছে তাতে ফাঁকিবাজ ও মেরুদণ্ডহীন চরিত্রটিকেই গুরুত্ব দিয়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। সেইজন্যই বোধহয় অফিসারের অভদ্র ব্যবহার আর অন্যায় জুলুম সবাই মাথা পেতে নেয়, ব্যক্তিগতভাবে বা সঙ্ঘবদ্ধভাবেও প্রতিবাদ করে না। আজকের দিনে এই ঘটনা যেমন অবাস্তব, কেরাণীরা মূলতঃ ফাঁকিবাজ এটাও তেমনি অসত্য। মালিকের শোষণ—অল্পবেতন, গুণের অস্বীকৃতি ও অন্ধ প্রভুভক্তির উৎসাহ, অমানুষিক কাজের চাপ (work load), মাথাভারী শাসনযন্ত্র এবং স্বৈরাচারী ও আমলাতান্ত্রিক পরিচালনপদ্ধতি, সহকর্ম্মীদের মধ্যে সুস্থ সামাজিক জীবনে বাধা, আইনসম্মত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দমন ও ট্রেড ইউনিয়ন বা কর্ম্মচারী সংগঠনের সহযোগিতা অস্বীকার প্রভৃতির আকারে কেরাণীকুলের ওপর যে শাসনতান্ত্রিক চাপ সৃষ্টি ক'রে তা' থেকেই যে কাজে ফাঁকি, অফিসারের সমালোচনা ইত্যাদি কিছু কিছু পরিমাণে দেখা দেয় এবং সমগ্রভাবে কেরাণীরা যে ফাঁকিবাজ নয়, অফিসাররূপী স্বাক্ষরকারী সাক্ষীগোপালরাই অফিসের সব কাজ যে উঠিয়ে দেয় না বা দিতে পারে না এই ধরণের বিশ্লেষণ না থাকায় কেরাণীর সে জীবনের সঠিক চিত্র ফুটে ওঠে নি নাটকে। অফিসার চরিত্রসৃষ্টিতে নাট্যকার মোটামুটি নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু অফিসার হলেই বর্ব্বর হয় না এটা যেমন তিনি দেখাতে চেষ্টা ক'রেছেন, কেরাণীর চরিত্র-চিত্রণে সে-পরিশ্রম তিনি করেন নি। নায়ক বিধুভূষণকে দুদিনই 'লেট'-অবস্থায় হাজির করেছেন অফিসে। 'তা' ছাড়া মালিককে একদম অনুপস্থিত রেখে

আর তাকে ন্যায়বান বিচারক বলে কল্পনা ক'রে (যেমন রবীন বা মিন্টু মিঃ গুহকে ওপরওয়ালার ভয় দেখিয়েছে) এক নিদারুণ মিথ্যা চিত্র এঁকেছেন নাট্যকার। মালিকরা কখনও তাদের প্রতিনিধি অফিসারদের অসম্মান বা বিরোধিতা করে না,—আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার এটা সাধারণ সূত্র। তাই অন্যদিকটাও দেখানো উচিত ছিল, বিশেষতঃ কেরাণীর কেরাণী-জীবনের উৎস যখন সেই মালিকেরই ব্যবস্থা। কর্ম্মচারীদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ, ট্রেড-ইউনিয়ন ইত্যাদিকে অনুপস্থিত রেখে নাট্যকার আজকেরদিনের বাস্তব ঘটনাই শুধু চেপে গেছেন তা' নয়, মেরুদণ্ডহীন কেরাণীর অসহায় অবাস্তব চরিত্রকে গৌরবান্বিত ক'রে তুলতে চেয়েছেন দর্শকদের কাছে। সর্ব্বোপরি, বয়াটে পটল ও ফাঁকিবাজ নিবারণের অনুপাতাতিরিক্ত অবস্থান, মিন্টু-রবীনের অনাবশ্যক ও আরোপিত রোমান্স নাটককে শুধু ভারাক্রান্ত করেনি, বিপথে চালিত ক'রবারও চেষ্টা ক'রেছে। মুদি-পটলের বাক্যালাপ রসাল হলেও অবাস্তব ও বিসদৃশ। পটলের বন্ধুর টাক' দেওয়ায় করুণ রসের সৃষ্টি হয় বটে, যুক্তিসম্মত নাট্যরস নিষ্পত্তির কোনও সহায়তা হয় না।

এসব সত্ত্বেও নাট্যকারের মুন্সিয়ানা আছে স্বীকার করতে হবে। অফিসের ঘনিষ্ঠ পরিবেশসৃষ্টিতে নাট্যকারের আন্তরিকতা প্রশংসার্হ। নায়ক বিধুর চরিত্র বিশেষত্ববর্জ্জিত হলেও ছোটসাহেব মিঃ গুহ, কেরাণী সত্যেন ও তার দুজন সহকর্ম্মী, বিধুর স্ত্রী দামিনী, বড় মেয়ে মাধু, বেয়ারা হলধর যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। অবশ্য তাদের সংলাপ সর্ব্বত্র সুনির্ব্বাচিত নয়, যেমন মাধুর প্রথম সংলাপ "জন্মেই বাপকে খেয়েছিস" ইত্যাদি ঠিক এইভাবে বোধ হয় চলে না, 'বাপ' কথাটা বাদ দিয়ে অন্য কথায় অর্থ প্রকাশ করলেই মাধু-চরিত্রটি আরও স্বাভাবিক হয়ে উঠতো। দৃশ্যসংস্থানের দিক দিয়ে নাট্যকার উন্নততর শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন—একই দৃশ্যে একই সঙ্গে তিনটি কামরায় কথাবার্ত্তা চালিয়ে

নাটককে তিনি শুধু দ্রুতগতিই করেন নি, নাট্যদ্বন্দ্বময়ও ক'রে তুলেছেন। কিন্তু সমগ্রভাবে নাটকটি স্বাভাবিক নাট্যদ্বন্দ্বের পথ বেয়ে অগ্রসর হ'তে পারে নি, অগ্রসর হয়েছে নক্সাধর্ম্মী সরলরৈখিক পথে। বিধুভূষণের বাড়ীতে কেবলই চলেছে দুর্দ্দশার ওপর দুর্দ্দশা, বিপর্য্যয়ের ওপর বিপর্য্যয়. এই দুর্দ্দশা থেকে, বিপর্য্যয় থেকে বাঁচবার শক্তিশালী প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা তেমন নেই পরিবারে, মাধুর সক্রিয়তাকে বাদ দিলে একেবারে নেই বলা যায়।

অভিনয়কুশলতায় সর্ব্বপ্রথমে নাম করতে হয় ছোট-সাহেব মিঃ গুহের ভূমিকায় শ্রীগৌরীশঙ্করের। এই অভিনয়শিল্পীটির গাম্ভীর্য্য, দাপট, সুন্দর ইংরাজী উচ্চারণ আর সপ্রতিভ অভিনয় মর্য্যাদাসম্পন্ন ক'রে তুলেছে মিঃ গুহকে। এর পরেই নাম করতে হয় চঞ্চলা লীলা-চপলা মিন্নুর (বিধুর ছোটমেয়ে) ভূমিকায় যে-মেয়েটি অভিনয় ক'রেছেন, মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে এই চরিত্রে। পটলের চরিত্রে সাধারণ মঞ্চে নবাগত ঠাকুরদাস মিত্র আর মাধুর ভূমিকায় শ্রীমতী রমা ব্যানার্জ্জি চরিত্রোপযোগী মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন যথাক্রমে তাঁদের অসংযত ও সংযত অভিনয়ে। ঠাকুরদাসবাবুর কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য্য না থাকলেও বাচনভঙ্গীতে আর চক্ষু-ভঙ্গীতে বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু প্রস্থানকালীন অন্যান্য অঙ্গ-ভঙ্গীর প্রশংসা করা যায় না, যেমন কাৎ হয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে, হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রস্থানের ভঙ্গী। এই ভঙ্গীটি শিল্পীর মুদ্রাদোষ বলেই আমাদের মনে হ'ল। রমা দেবীকে এর আগে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখেছি লীলা-চঞ্চলা নারীর ভূমিকায়, কিন্তু মাধুর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভূমিকায় তিনি শিল্পজীবনের আর একটা দিকের সন্ধান পেলেন। প্রবীণ অভিনয়শিল্পী শিবকালী চট্টোপাধ্যায় মুদির ভূমিকাটিকে বেশ উপভোগ্য ক'রে তুলেছেন। বড়সাহেবের ভূমিকাভিনেতা সমর মিত্র, রবীনের ভূমিকায় সুশীল রায়, দামিনীর ভূমিকায় শ্রীমতী বেলারাণী আর নিবারণের ভূমিকায় রঞ্জিৎ রায়, অন্যান্য কেরাণী ও বিধুবাবুর ছোটছেলের ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় ক'রেছেন তাঁরা চরিত্রানুগ অভিনয় ক'রেছেন। নায়ক বিধুর ভূমিকাটি বিশেষত্ববর্জ্জিত হলেও দক্ষ শিল্পী সন্তোষ সিংহ ভূমিকাটিকে জীবন্ত ক'রে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেছেন, কিন্তু তাঁর অভিনয়-দীপ্তি স্থানে স্থানেই শুধু ঝলসে উঠেছে।

ভূমিকা-নির্ব্বাচনে আর অভিনয়ে সবচেয়ে বেদনার কারণ হয়েছে মিন্নুর ভূমিকাটি। নাটকটি যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা'তে বেশ স্থান রয়েছে মিন্নুর। মিন্নু পূর্ণযৌবনা আত্মমর্য্যাদাসম্পন্না, শিক্ষিতা, তেজস্বিনী মহিলা। এই চরিত্রটিতে চিত্রাভিনেত্রী সুদীপ্তা রায়ের নির্ব্বাচন শুধু ভুলই হয় নি, অন্যায় হয়েছে। স্থূলদেহিনী শিল্পীর বিলম্বিত চলনভঙ্গী, চরিত্রবিরোধী প্রস্থানভঙ্গী (রবীনের প্রথম প্রবেশের পূর্ব্বে), অনভ্যস্ত বাচনভঙ্গী ও স্বরক্ষেপ আর অতিনিম্ন কণ্ঠস্বর 'মিন্নু'-চরিত্রকে একেবারে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে। তাঁর কণ্ঠে যে দুটি গান দেওয়া হয়েছিল প্রেক্ষাগৃহের নবম সারিতে বসেও তার

কথা বিন্দুবিসর্গ শোনা যায় নি। বাড়ীওয়ালার ভূমিকাভিনেতার গলা আছে কিন্তু শিল্পসম্মত স্বরক্ষেপের যোগ্যতা নেই।

সুসঙ্গত আলোকসম্পাত ও দৃশ্যসজ্জা নাটকের প্রয়োগ-কৌশলের দিকটা উন্নত ক'রেছে। রূপসজ্জায় পটল কিছুটা বেমানান আর রবীন কিছুটা অতিরিক্ত বয়সের মনে হলেও মোটামুটি সকলেরই যথাযথ হয়েছে। বঙ্কিং রায়ের বিশিষ্ট সুরে গান বাঁধা হয়েছে, কিন্তু সে গান তাঁর কণ্ঠে উপভোগ্য হয়েছে, অন্যের কণ্ঠে হয় নি।

—সুবোধকুমার ঘোষ

রঙমহলে 'বড়বউ'

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর 'বড়বউ'-এর অভিনয় সুরু হয়েছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও ব্যবহারজীবী ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের একখানি উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিয়েই সৃষ্ট হ'য়েছে নাটক 'বড়বউ'। শোনা যায় নাট্যরূপ দিয়েছেন কাহিনীকর নিজে। নাটকটি পরিচালনা ক'রেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত।

মৃত্যুশয্যায় জমিদার যোগেন্দ্র উইল ক'রে যান তাঁর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ পাবে তাঁর ছোট ছেলে সুরেন আর অপরার্দ্ধ পাবে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ শ্রীমতী নারায়ণী। বড় ছেলে সত্যেন হাবা-পাগলা কিন্তু বড়বউ নারায়ণী বুদ্ধিমতী, পতিব্রতা, কর্ত্তব্যপরায়ণা। বিষয়-ভাগ সুরেনের পছন্দ হ'ল না। শত্রুতা সুরু করলে সে নারায়ণীর সঙ্গে বন্ধু ও মোসায়েব পরেশের পরামর্শ নিয়ে। মামলা-মোকর্দ্দমা চলল, অন্যান্য নির্য্যাতনেরও চেষ্টা হ'ল, কিন্তু নারায়ণীকে দমানো গেল না। শেষ পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমায় নারায়ণীর জিৎ হ'ল। নারায়ণীর দৃঢ়তা, অচল পতিভক্তি ও বুদ্ধিমত্তা শ্রদ্ধাবনত করল সুরেনকে। এদিকে বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগে সত্যেন হ'ল অসুস্থ আর সেই অসুখে সত্যেন মারা গেল। এক করুণ পরিবেশে শান্তি ফিরে এল সংসারে। 'বড়বউ' নাটকের এই হ'ল কাহিনী।

আজকের দিনের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 'বড়বউ' নাটকের বিষয়বস্তু অনেকখানি পশ্চাৎমুখী। সমাজে আজ যারা ক্ষয়িষ্ণু শক্তি, সেই জমিদার শ্রেণীর এমন একটা সমস্যা নিয়ে নাটকে আলোচনা করা হয়েছে যা তাদেরও আজকের দিনের প্রধান সমস্যা নয়, জমিদারী বা সম্পত্তি ভাগ আজ তাদের প্রধান সমস্যা নয়, জমিদারী রক্ষার সমস্যাই প্রধান সমস্যা। যে জমিদারকে নাটকে রূপ দেওয়া হয়েছে, তিনি আবার ব্যবসায়ীর প্রতি বিরূপ অথচ, সমাজ-বিবর্ত্তনের ইতিহাসে ব্যবসায়ী শ্রেণীই সামন্তবাদ থেকে ধনবাদী যুগের বিকাশে সাহায্য করেছে, তাই তার অস্তিত্ব সত্যের খাতিরে আজ আর কল্পনা করা যায় না। আজকের দিনে যা সামাজিক নয়, সত্যও নয়, নাটকে তাকে রূপ দিয়ে সামাজিক শিল্পক্ষেত্রে প্রগতি বিমুখতাকে উৎসাহিত করার অর্থ সমাজের অগ্রগতিরই বিরূপতা। নাটক যাঁরা দেখতে যান তাঁদের অধিকাংশের সঙ্গেই যে-নাট্যবস্তুর নাড়ীর যোগ নেই, সাধারণ মঞ্চে তার রূপায়ণ বিরাট এক সামাজিক অপরাধ। জমিদার পরিবারের এই সম্পত্তি ভাগের নাটক আমাদের সত্যকার অধ্যাত্ম-চেতনাকে জাগ্রত করে না বরং সিদ্ধরসের নিপুণ পরিবেশনে অবাস্তব চিন্তাধারার প্রেরণা দেয় অবচেতন মানসে।

কাহিনীকার-নাট্যকার সুনিপুণভাবে নাট্য ও ঘটনা-দ্বন্দ্বের মাধ্যমে রূপ দিয়েছেন নাটককে। বিস্ময়ের পর বিস্ময় সৃষ্টি ক'রে সিদ্ধরসপিপাসু দর্শকের অধ্যাত্ম চেতনাকে দোলা দিয়ে নাটক পৌঁছেছে তার বাঞ্ছিত পরিণতিতে, সেইজন্যই এই কাহিনীর নাটক আরও ক্ষতিকর হয়েছে। বিশেষ ক'রে সম্পত্তিভাগের সমস্যা রূপায়ণের মধ্য দিয়ে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হ'য়েছে নাটকে তা হ'ল হাবা-পাগলা স্বামীর প্রতি প্রশ্নহীন দ্বিধাহীন অন্ধ পতিভক্তির আদর্শ। সনাতন সিদ্ধরসের উপকরণে সুকৌশল উপস্থাপনায় সাময়িকভাবে দর্শকেরা হয়তো এই আদর্শ প্রতিষ্ঠায় বাহবা দিতে পারে কিন্তু বাস্তব জীবনে কোন মেয়েই, সে যে-শ্রেণী থেকেই আসুক না কেন—মেনে নিতে পারে না এই আদর্শকে, মেনে নেয় না, মেনে নেওয়া উচিতও নয়। তাই এতবড় সামাজিক অসত্য আজকের দিনে আর হ'তে পারে না। অথচ, সামাজিক সত্যকে রূপ

দেওয়াই আজ সমাজ-কল্যাণকর শিল্পসাহিত্যের কাজ।

আজিকের দিক দিয়েও নাট্যবস্তুর উপস্থাপনায় কিছুটা চাতুর্য্যের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দু-একটা দৃশ্যের নাটকীয় পরিণতি ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে দর্শকমনকে। এমনি একটি দৃশ্য—দ্বিতীয় দৃশ্যে যোগেন্দ্রের মৃত্যুর দৃশ্য। ছোট ছেলে সুরেন বড়বউ নারায়ণীর হাতে বাপের উইল দেখে ধৈর্য্যহারা হয়ে যায়, সে-টা দেখতে চায়, সন্দেহ ক'রে কি যেন নারায়ণী লিখিয়ে নিয়েছে তার বাবাকে দিয়ে। এই সন্দেহের ফলে নারায়ণী দেখতে দেয় না উইল, উত্তেজিতভাবেই কথা বলে, এমন সময় সুরেন তাকে বলে 'Shut up', আর এই কথার শব্দে যোগেন্দ্রের হার্ট-ফেল সত্যই নাট্যকীয় রসসমৃদ্ধ। কিন্তু সুরেনের যা চরিত্র, নারায়ণীকে সে আগে ও পরে যেভাবে সামনা-সামনি ভয় করে চলেছে তাতে ঐভাবে 'Shut up' বলা সুরেনের পক্ষে সম্ভব কিনা, নাট্যকারের আর একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ হেমনলিনীর চরিত্র, বড়-জা নারায়ণীর প্রতি তার অচলা শ্রদ্ধা। হঠাৎ তাকে দিয়ে এক দৃশ্যে উড়নচণ্ডীর ভূমিকা অভিনয় করিয়ে নারায়ণীর প্রতি অশ্রদ্ধাজনক কথা বলিয়ে আবার হঠাৎ পরেই নারায়ণীর প্রতি অধিকতর ভক্তিপরায়ণা-ভাব দেখিয়ে নাট্যকার আদৌ রসজ্ঞানের পরিচয় দেন নি। নাটক যেভাবে উপস্থাপিত হ'য়েছে তাতে নারায়ণীর প্রতি হেমের অশ্রদ্ধা সুপ্রকাশিত না হ'লেও ক্ষতি ছিল না। আর নাট্যকার যদি এই অনুপাতাতিরিক্ত অশ্রদ্ধাকে এতই প্রয়োজন মনে করে থাকেন, তাহ'লে তার পরিবেশ সৃষ্টি করে মনস্তাত্ত্বিক বিবর্ত্তনের বিভিন্ন স্বাভাবিক স্তর দেখানোর চেষ্টা করেন-নি কেন?

তুলসীর অনাবশ্যক চরিত্রটা বোধ হয় গান শোনানোর জন্যই আমদানী করা হয়েছে।

অভিনয়ে সুরেনের মানসিক দ্বন্দ্ববহুল চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য্য। প্রতিটি দৃশ্যে আজিক ও বাচনিক অভিনয় তার প্রায় এক সঙ্গেই শিল্প-সম্মতভাবেই তাল রেখে চলেছিল। অবশ্য ধীরাজবাবু উত্তরজীবনে বিশেষ বাচনভঙ্গীকে স্বীকার ক'রে নিয়ে তাঁর অভিনয়-সৌন্দর্যের আলোচনা আমরা করছি। তবে দুটি দৃশ্যের শেষে অন্ধকার হয়ে যাবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে মদ খেতে গিয়ে প্রয়োজনীয় চক্ষুভঙ্গী তিনি করতে পারেন নি। আমাদের মনে হয়, এখানে মদের গ্লাস উঁচু ক'রে ধরে—"এতে কি সে জ্বালা মিটবে" ইত্যাদি সংলাপ বলে যাওয়া উচিত, চোখের অভিনয় তাহ'লে সহজ হবে। হাবা-পাগলা সত্যেনের ভূমিকায় প্রধান অভিনয়-শিল্পী জহর গঙ্গোপাধ্যায় যথেষ্ট আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে স্বরের অস্বাভাবিক বিকৃতি দর্শক-মণ্ডলীতে হাসির উদ্রেক করেছিল। নারায়ণীর ভূমিকায় সাধারণ মঞ্চে নবাগতা শ্রীমতী বাণী গঙ্গোপাধ্যায় আজিক-ভঙ্গীতে, পদক্ষেপ, স্বরভঙ্গী, প্রস্থান ও প্রবেশে যথেষ্ট শিল্প-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তার অভাব আশানুরূপ গাম্ভীর্য্য আনতে পারেন নি বড় বউ চরিত্রে। জমাট মুহূর্ত্তে গলাটা একটু চড়িয়ে দিয়ে অভিনয়ের চেষ্টা করলে সম্ভবতঃ কিছুটা আশানুরূপ ফল পাওয়া যেতে পারে বলে আমাদের ধারণা। শ্রীমতী ঝর্ণা হেমনলিনীর ক্ষুদ্র করুণ ভূমিকাটিতে ছাপ রাখতে সমর্থ হলেও স্থানে স্থানে (যেমন নারায়ণীর সম্পর্কে শ্রদ্ধাহীন উক্তি করতে) অশোভন উৎসাহের আধিক্য দেখা গিয়েছে, অবশ্য তার জন্য নাট্যকারই হয়তো অনেক অংশে দায়ী। এছাড়া ভূপতির ভূমিকায় নবাগত তরুণ শিল্পীটি, যতীনের ভূমিকায় দেবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগতি, গোবিন্দনাথ ও ক্ষান্তর ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁরা যথাযথই অভিনয় করেছেন। পরেশের ভূমিকায় ভানু চট্টোপাধ্যায়, সুরেনের উপযুক্ত পার্শ্বচর হয়ে উঠলেও মায়ের ভূমিকায় শ্রীমতী প্রভার অভিনয় বড়ই নিষ্প্রভ।

—সুবোধকুমার ঘোষ

অথ "কুক্কুট-আহব" দর্শনান্তে রাজা ভড়ং

মৃগাংক সেন

[বাঙলা দেশের প্রথম শ্রেণীর চিত্রপত্রিকাগুলির অন্যতম 'শট'-এর গত পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত Stop this cock-fight ! নামক প্রবন্ধ নিয়ে সম্প্রতি স্বর্গরাজ্যে প্রচণ্ড আলোড়-নের সঞ্চার হয়েছিল, বর্তমান রচনার লেখক তারই বৃত্তান্ত পেশ করেছেন এখানে। — 'চিত্রবাণী'-সম্পাদক]

মহর্ষি বৈশম্পায়নের কাছে সংশোধন করবার জন্যে রাজা ভড়ং নামে এক থল্লট একটি থিসিস্ কিছুদিন হোল দিয়ে গেছেন। রাজা ভড়ং সটান কাব সত্যেন দত্তের কাব্য থেকে নেমে এলেন। তাঁর ধারণা, অন্যান্য সতীর্থ-দের মতোই; আঠারো-বছর যে-কোন কাজে নিযুক্ত থাকলেই বিধাতা থিসিস্ লেখবার অধিকার দিয়ে দেন। একে খবাট তায় খল্লট তার ওপর বিংশ শতাব্দীতে জন্মান্তর গ্রহণের জন্য দালালী বিদ্যায় পারদর্শী—এ সমস্ত তত্ত্ব অবশ্য মহাষর জানাই ছিল, তাই কুলাজ নিয়ে বৃথা বাক্য-ব্যয় না করে সরাসার উত্তরপত্রটি দেখতে বসে গেলেন রাজা ভড়ংয়ের।

ইদানীংকাল মহর্ষির একটু কেমন যেন বদ্‌রোগ ধরেছে। দার্শনিক বুকনাগুলো আজকাল অপরের মুখ থেকেই শুনতে ভালবাসেন। কারণ, বুকনী আওড়াতে আওড়াতে মন্থর ছেলেরা বেশ অবতার ব'নে যায়। তিনি হাঁ করে চেয়ে থাকেন আর ভাবেন, হায় রে, কি কুক্ষণেই না জ্ঞান দান করবার প্রবৃত্তি তাঁর মনে জেগেছিল! সেইজন্যেই না এই অনড্ডানগুলো তাঁর চোখের ওপর বুড়ো আঙুল তুলে খবরের কাগজের অফিসে ঢুকে প'ড়ে সিনেমা-কলমের ওপর দেদার ঘাসকাটা কল চালিয়ে যায়, সুবিধে পেলেই এর-ওর-তার পিঠ চাপ্‌ড়ে দেয়, আর ...ত হলেই খাম্‌চা মেরে বুড়বুড়ি কাটতে থাকে, সুরু ক'রে কাগজ ফেলা ঝুড়ির অন্দরমহল সাফ্ করতে!

যাই হোক্, যা ভুল হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন আর বৃথা আফশোষ করে কি লাভ। ভাবলেন, তখনকার দিনে ইচ্ছা হওয়া মাত্রই কি-না পাওয়া যেতো। আর এখন?—শুধুই আঠারো-বছর রগ্‌ড়ানোর যোগ্যতা। যে যেমনভাবে রগ্‌ড়ে চলেছে. অবশ্য নিরেট পাথর কিংবা নিরন্তর বাঁক বইবার ক্ষমতা থাকা,—এ দু'টোর যে কোন একটা গুণ থাকলেই যথেষ্ট, আর আঠারো-বছর বাদে সে সেইরকমই ফল পেয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ নাম-ধেয় এক শিষ্য তাঁর এই আঠারো-মার্কাদের দেখেই 'অচলা-য়তন' বলে একটি ছোট্ট নাটক লিখেছিলেন। মহর্ষির মনে আছে, কী তারিফই না করেছিলেন শিষ্যকে। কিন্তু সেকাল আর একাল? তখন জন্মাতো সব সিদ্ধিদাতারা এখন তাঁর বাহনগুলোই কেবল জন্মাচ্ছে যে! 'বনফুল' নামে তাঁর আর একটি ভক্ত এই কথা জানতে পেরে এই ব্যাপারের ওপর তদ্বি করে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-বিশ্বকর্মাকে নিয়ে একটা কথিকা লিখেছিল! বেশ লিখেছিল কিন্তু। নাঃ, মন্থর নাতি-পুতিগুলো একেবারে গোল্লায় গেছে। মহর্ষি চশমাটা মুছলেন।

থিসিসের কয়েক ছত্র পড়েই বৈশম্পায়ন ঈদৃশ আশা-ভঙ্গজনিত বিকল অবস্থার কুক্ষিগত হলেন, এবং বেশ অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে—

জম্বুদ্বীপে গাঙ্গেয় অববাহিকার দক্ষিণতম অঞ্চল বঙ্গদেশ নামে খ্যাত। আর এই দ্বীপেরই পশ্চিমপ্রান্তে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার কিয়দ্দূরে 'বোম্বাই' নামে একটি প্রায়-দ্বীপ আছে। বঙ্গদেশের গঠন ব-দ্বীপ সদৃশ। তাই এর তিনটি কোণের সমষ্টি দুই-সমকোণের সমান। দুই সমকোণের অর্থ, অন্য যা অপরের নেই, এর তা আছে। অথচ দ্বীপের মতো উন্মুক্ত নয় বলে একটু লজ্জিত, নম্র এবং বেশ সম্ভ্রমবোধপূর্ণ। বঙ্গদেশ বাঙালীর, বোম্বাই পর্তুগীজের (বহুম্-বী), পরে মারাঠা দস্যুদের ও তারপর তাদের তহশীলদার গুজরাতী-দের। বাঙলাদেশের ছেলেরা আজন্ম বর্গীদের কথা শুনে ভয়ে-ভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে; ছেলেদের বাপেরা খাজনা জুগিয়েছে চার-ডবল চৌথে; বাপেদের

শাসন কর্ত্তারা তখন ব-দ্বীপটিকে "স্ব" না করে প্রাণপণে নমাজ পড়েছেন আর সার টমাস রো'র জ্ঞাতিভাইদের নেমন্তন্ন করে খাওয়াবার শপথ করেছেন। সার সেসব বার্তা দেশে যা-রয়-সয় করে পৌঁছে দিয়েছেন। তার ফলে, আমরা অনেক অনেকদিন বাদে বাঙলাদেশে দেখেছি যখন মৃত্যুপণ করে কয়েকজন ছোকরা এই জ্ঞাতিভাইদের দেশে পাঠাবার জন্যে জলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন সে খবর তারা বোম্বাইয়ের খবরের কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় দেখবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছিল কিনা জানিনে, কিন্তু পর্তুগীজ স্নেহচ্ছায়ায় পুষ্ট বোম্বাই নগরীতে চোলাই মদের কারবার ও বড়ো বড়ো কাপড়ের মিল খোলার বন্দোবস্ত পাকা-পোক্ত হয়ে যাচ্ছিল বেশ। মহর্ষি একটু ক্ষুণ্ণ হলেন, থিসিসের ভেতর এসব প্রাথমিক সন্ধানের কোন খোঁজ-খবর নেই। এ কেমন কথা? এ আবার কি রকম লেখা?

বরং, এসবের বদলে তাতে লেখা রয়েছে যে,—

১। বাঙ্‌লা দেশ নিতান্ত গরীব, হা-ঘ'রে;

২। কেউ তাদের হাত ধরে হাঁটিয়ে না দিলে, দু'মুঠো অন্ন ছুঁড়ে না দিলে হা-ঘ'রেদের কোন উপায়ই থাকতো না;

৩। অন্য কেউ তাদের কথা ফলাও করে না ছাপলে বিশ্ববাসী তাদের ভদ্র ও শিল্পগুণের কথা জানতেই পারতো না;

৪। ভালমানুষেরা তাদের এই গুণপনার কথা বুঝে তাদের মধ্য থেকে বেছে বেছে জনকয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে পিলে চম্‌কে দেবার মতো টাকা দিয়ে, খাইয়ে পরিয়ে পুষে না রাখলে তাদের গুণের সম্মান করতো কে?

৫। এইসব ঠাকুর-গোঁসাইদের কাগজওয়ালারা এখানে কষ্ট করে এসে, এবং নিজের দেশ থেকে, এখানকার কথা লোক-সমাজে বিশেষ করে প্রচার করে কি তাদের মহত্বের পরিচয় দেয় নি?—এইসব আবোল-তাবোল প্রলাপময় বোম্বাই থিসিস।

মহর্ষির হঠাৎ মনে পড়ল, শয়তান নামে তাঁর এক গোঁয়ার-গোবিন্দ ভৃত্য শয়তানীর স্বপক্ষে এইরকমই কি যেন সব দালালী করেছিল। ফস্ করে মহর্ষি বৈশম্পায়নের মতো লোকেরও মুখ থেকে কি-একটা খিস্তি বেরিয়ে এলো। একবার দাড়ি কামাতে কামাতে এক ওস্তাদ নরসুন্দর তাঁর নরম গালের খানিকটা চামড়া পাঁঠা-ছাড়ানোর মতো করে

ছড়িয়ে ফেলায় সংযমের সংস্কৃত বাঁধ ভেঙেও একটা প্রাকৃত শব্দ বলে ফেলেছিলেন। সেই শব্দটিই আবার তাঁর মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল এই থিসিসের প্রতিপাদ্য বিষয়টি পড়ে। খাতাখানা টান মেরে গোময়-পঙ্কের মধ্যে ফেলে দিয়ে এক আর্যপুত্রকে তলব করে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন : রাজা ভড়ং বলতে চায় "এ"ন্তার "ক্যা"বলা মনোবৃত্ত "জ"ইয়ে রেখে সে নাকি মহাপণ্ডিত হয়ে উঠেছে। বাঙলার কয়েকজন বাপ্‌কা বেটা বোম্বাইয়ের লপ্‌চপানি দোরস্ত করছে দেখে ইনি এক মুর্গীর-লড়াইয়ের থিসিস লিখে আমার কাছে দিয়ে বলেছেন, যারা হক্‌ কথা বলছে তাদের চরবার জায়গা আলাদা করে দেওয়া হোক। কতকগুলো ভ্যান্‌তাড়া উৎসর্গও জুড়ে দিয়েছে; তুমি এই ব্যাপারে উপযুক্ত গবেষণা করে আমার কাছে একটা বিবরণী পেশ করবে হপ্তাখানেকের মধ্যেই। দরকার বোঝ তো গুরু-মা'র কাছ থেকে পুষ্পকরথের রাহা-খরচটা চেয়ে নিও।

যেমন কথা তেমনি কাজ। আর্যপুত্র ঐশী ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমস্ত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে, জনমতের সঙ্গে, উপযুক্ত মতের সঙ্গে, বুদ্ধিমান ও সম্ভ্রমশালী ব্যক্তি-বর্গের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে গবেষণালব্ধ ফলগুলি যথারীতি লিপিবদ্ধ করলেন ও সপ্তম দিবসের গোধূলি বেলায় মহর্ষির চরণপ্রান্তে নিবেদন করলেন।

মহর্ষি বৈশম্পায়ন মহা আগ্রহভরে পত্রখানি তুলে নিয়ে পড়তে লাগলেন। কেননা, এ পত্র আর্যপুত্রের লেখা। খাদ এতে নেই। আশৈশব তাঁর কাছেই এর শিক্ষা হয়েছে, পঁচিশ-ত্রিশটা টাকার জন্যে, আর যাই হোক বাপ-মাকে ড্যাম্‌-রাস্কেল জাতীয় ম্লেচ্ছ বচনে আপ্যায়িত করবে না, থিসিস লিখতে গিয়ে থাইসিসগ্রস্ত ফুসফুস খুলেও দেখাবে না। কি বা হঠাৎ অবতার সেজে আপন খেয়ালেই বাণী দিতে সুরু করবে না।

আর্যপুত্র লিখছে : পথে যেতে যেতে হঠাৎ একজনের সঙ্গে দেখা। একটা কবরস্থানের পাশে বসে বসে সে কাঁদছিল। কারণ জিগ্যেস করায় সে বললে, যৌবনে তার কি-এক দুর্মতি হওয়ায় নাম-করবার জন্যে সে ম্লেচ্ছদের দরবারে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিনেই সে তার ভুল বুঝতে পারলে। তারপর যখন সে সত্যি সত্যি নাম কিনলে তখন তার আর অনুশোচনার শেষ রইল না। তাই সে চিরজীবন কেঁদেই যাচ্ছে। লোকটা বললে তার নাম মধুসূদন। এরপরে আরও কয়েকজনের সঙ্গে তার দেখা। তারা কেউ বা ফুলের বনে, কেউ বা ফলের বনে, মহানন্দে গান গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাও নিরানন্দ তাদের স্পর্শ করে নি। আর কি তাদের চেহারার দ্যুতি! তাদের জিগ্যেস করতে তারা বললে, অপরে কি বলবে আর অপরে কতখানি করবে এ ভেবে জীবনে তারা কখনও কিছু করেনি। তারা তাদের কর্তব্য করে গেছে মাত্র। সেখানে কোন ফাঁক রাখে নি। নাম জানতে চাইলে, তারা প্রথম তিনজন বললে, বঙ্কিম, রবীন্দ্র ও শরৎ হচ্ছে তাদের নাম। এরপর জগদীশ, অরবিন্দ থেকে আরম্ভ করে প্রায় একশ'টা নাম করে গেল, সব মনে নেই, তারা সবাই নির্লিপ্ত হয়ে মহাশান্তির আস্বাদ উপভোগ করছে। এরা সবাই বাঙালী, বাঙলার আদরের ধন।

এইসব স্থায়ী সত্য দিয়ে আর্যপুত্র সপ্রমাণ করেছে যে,—

১। বাঙলা দেশ গরীব, বিনা স্বার্থে কেউ তাকে বড়লোক করে দিতে আসেনি কখনও, তবু সে বড়লোক হতে পারে নি—গোঁসাই লোকেদের এমনই সুন্দর চাল-যশ। হা-ঘ'রে আছে, তবে কয়েকজন মাত্র। তারা এই যারা, সিনেমা-কলামের ঘোড-সওয়ার হয়ে খবরের কাগজের স্বর্গে বাতি দেবার ব্যবস্থা করছে।

২। ধীমান বাঙালীর হাত ধরে কেউ হাঁটায় নি, সে নিজেই হাঁটতে জানে, শিখেছে। অন্ন ছুঁড়ে দিয়েছে সত্যি কিন্তু সে কণামাত্র, মুষ্টিপূর্ণ নয়। এর কারণ, রবীন্দ্রনাথ থেকে পিকাশো পর্য্যন্ত সব মনীষীর কথা যখন সারা জগৎ জেনে ফেলে তখন আশপাশ থেকে আল-টপ্‌কানো একটু-আধটু দরদ দেখাতে না পারলে ভদ্র-সমাজে বাস করাই যে অচল হয়ে পড়ে। তার ওপর বুদ্ধিমান হওয়ার লোভটা? সেটা যাবে কোথায়!

৩। বোম্বাই বাঙালীর গুণপনার কথা বুঝেছে সত্যি কথা! তাই, ৺হিমাংশু রায় হিন্দী-ফিল্ম, অর্থাৎ ঐ ভাষায় ভদ্রপদবাচ্য জিনিষ বলতে যা বোঝা যায়, তাকে বাস্তব সত্যে পরিণত করে গেছেন। শরদিন্দু, অশোককুমার, অনিল বিশ্বাস প্রভৃতি এবং দেবিকারাণী নিজেদের বীর্য-শুল্কে বরমাল্য ছিনিয়ে নিয়েছেন, উপযাচক হয়ে নয়। আর যাঁরা আছেন, তাঁরা যেভাবে অর্থ পান এবং পাওয়া সম্ভব-পর করেছেন তার উল্লেখ না করাই ভালো। তাই নীতিন বসুকে দিয়ে সেখানে 'দীদার' তোলানো হয়; 'কৃষ্ণলীলা' দেখাবার জন্যে দেবকী বসুর ডাক পড়ে; 'জলজলা'র মতো অপমানজনক ছবিতে সুর লাগাবার জন্যে পঙ্কজ মল্লিকের প্রয়োজন হয়; অসিতবরণের

মতো অভিনেতাকে দিলীপকুমারের এক-দশমাংশ অর্থ দিয়ে ছবির কাজে নিয়োগ করা হয়; বাঙলার তৈরী ছবির প্রবেশ যত রকমে সম্ভব বন্ধ করে দেওয়া হয়; এবং বোম্বাই থেকে উল্লেখ্য কোন মূলধনই বাঙলায় খাটানো হয় না;—এই তো প্রেম ও সম্প্রীতির নিদর্শন! তারপরেও বোম্বাইয়ের হা-পিত্যেশ ম্লেচ্ছ-সমাজের মুখাপেক্ষী; বাঙলা আদব-কায়দা কিছু কঠিন কিনা।

৪। ফলাও করে বাঙলার কথা জানানো সেটা বোম্বাই জনসাধারণের অন্তরের তাগিদ, কাগজ-মালিকদের বদান্যতা নয়। এসব করে যে গুণের প্রকাশ হয় তা মহত্ত্বের নয়—ছাপার অক্ষরে কাগজ বের করার স্বাভাবিক মর্যাদাবোধে, এদেশে কাটতি বাড়াবার ও বৃহত্তর ভদ্র সমাজে পরিচিতির পথ প্রশস্ত করার, অন্যতম অনুপ্রেরণা লাভ মাত্র। একথা অবশ্য মনোরমা অর্থ-ভোজীরা ঠিক বোঝে না।

সবশেষে লিখেছে : এস্তার ক্যাবলা মনোবৃত্তি জিইয়ে রাখার মালিক স্বয়ং রাজা ভড়ং "কুক্কুট আহব" দেখার যে বৃত্তান্তের ওপর প্রিসিস লিখেছেন সেটার আদৌ কোন ভিত্তি নেই—সেটা একেবারে তাঁর 'রজ্জুভ্রমে সর্পদর্শনের' সামিল। কেন না, জনমত থেকে এইটুকু মাত্র খবর পাওয়া গেল যে, একটি ময়ূর পেখম তুলে যখন সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর নয়নতৃপ্তির কারণ হচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে কোথা থেকে এক লক্কা পারাবত এসে খুব ডিগবাজী খেয়ে যখন কিছুই করতে পারলো না, তখন ঝাঁ করে একটি ময়ূর-পালক ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল। ময়ূর সেই দেখে একটু মুচকী হেসেছিল মাত্র। এই দৃশ্যকেই রাজা ভড়ং আপনার বিচারবুদ্ধির বলে মুরগীর লড়াইয়ে পরিণত করেছেন আর কি! পাঠ শেষ করে মহর্ষি বৈশম্পায়ন একটা সুবৃহৎ দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বললেন : তাই বলো, আমি ভেবেছিলুম বোম্বাই বাঙলার একটা হাঙ্-আখড়াই হয়ে গেল বোধহয়। এতক্ষণে বুঝলুম, এটা হিন্দী চিত্র-শিল্পের মালিকানা মনোবৃত্তির হয়ে বাঙলার শান্ত মর্যাদা-বোধের ওপর দালালী করা হচ্ছিল! রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছিলেন দেখ্‌ছি। বলেছিলেন, ডিমোক্রেসীর নিজের কিছুই করবার নেই। ভালো মন্দ সে কিছুই করতে পারে না। কিন্তু, কাণে মন্ত্র দেবার বিদ্যা যে আয়ত্ত করেছে, সে নিজের কথাটা জোর করে ডিমোক্রেসীর মুখ দিয়ে বলিয়ে নেয়। এইজন্যই মন্ত্র দাতারা ডিমোক্রেসীর রাজ্যে এত বেজায় তৎপর। *

চোখ-বুঁজে খানিকক্ষণ ধ্যানে বসলেন মহর্ষি

ত্রিকালজ্ঞের হৃদিপটে কি কথা জাগল তিনিই জানেন। আর্যপুত্রকে একটি শ্রুতিলখন লেখবার জন্যে তৈরী হতে বললেন। আর্যপুত্রও শশব্যস্তে এগিয়ে এলেন।

"যোগবাশিষ্ঠে উল্লেখ আছে, স্বপাক অন্নগ্রহণই হচ্ছে সবচেয়ে প্রশস্ত। নিজে অক্ষম হলে গৃহবর্তিনী কোন নিকট আত্মীয়া এ-কার্য সমাধা করতে পারেন।

একবার এক ব্রাহ্মণকে সে-দেশের রাজা নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। আচার্য গ্রহণের অন্যথা জেনেই ব্রাহ্মণ তা প্রত্যাখ্যান করলেন। অবশেষে গৃহিণীর পেড়াপীড়িতে তাঁকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেই হ'ল। রাজা স্বয়ং উপস্থিত থেকে তদারক করে মহা আপ্যায়ন করে ব্রাহ্মণকে খাওয়ালেন। ব্রাহ্মণ কিন্তু খাওয়া শেষ করেই কতকগুলো অদ্ভুত অনুভূতির পরবশ হয়ে পড়লেন। বাড়ী ফেরবার পথে সেই অনুভূতিগুলো তাঁকে নিরন্তর পীড়িত করতে থাকল। অবশেষে তিনি একটি বেজায় কু-কার্যও করে ফেললেন। গৃহে ফিরে, খাদ্য তখন প্রায় হজম হয়ে গেছে, তাঁর অনুশোচনার আর অন্ত রইল না। ব্রাহ্মণ অকপটে সবই ব্যক্ত করে ফেললেন।

গৃহিণী, অর্থাৎ ব্রাহ্মণী, সব ব্যাপারটাই জানতেন। ব্রাহ্মণ সুস্থ হলে বললেন, ঐ রাজা রাজ্যলাভের পূর্বে এক তস্কর ছিল। ব্রাহ্মণের চোখ কপালে ওঠে আর কি! যাই হোক, এর পর ব্রাহ্মণ এক কঠোর প্রতিজ্ঞা করে বসলেন। প্রতিজ্ঞা হচ্ছে এই যে অভুক্ত হয়ে মৃতপ্রায় হলেও অজ্ঞাতকুলশীলের আপ্যায়ণে আর কখনও তিনি সাড়া দেবেন না।"

'লখন শেষ হলে এক দিব্য-জ্যোতিতে মহর্ষির মুখ পরিমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আর্যপুত্রকে বললেন, এই শ্রুতি-লিখনটি তুমি রাজা ভড়ং বরাবরেষু করে পাঠিয়ে দাও। আর লিখে দিও যে, তার থিসিসের জবাব সে এই থেকেই পেয়ে যাবে। নিজের সম্পর্কে সঠিক প্রত্যয় না জন্মানো পর্যন্ত এইসব ছাই-পাঁশ লিখে সে যেন আমার সময়ের অপব্যয় না ঘটায় ভবিষ্যতে। তার থিসিস পড়ার চেয়ে আরও জরুরী কাজ আমার চিত্ত জুড়ে অবস্থান করছে।

আর্যপুত্র গুরু-আজ্ঞা যথারীতি প্রতিপালন করেছি।

[তদনন্তর মিথ্যা সন্দর্শন কাহিনী সমাপ্তম্]

*"ডিমক্রাসির গুণ এই যে, নিজে ভাববার না আছে তার উদ্যম, না আছে তার শক্তি। যে-চতুর লোক কানে মন্ত্র দেবার ব্যবসা অবলম্বন করেছে সে নিজের ভাবনা তাকে ভাবায়......"

[পৃঃ ৪০২, রবীন্দ্র রচনাবলী ১৯শ খণ্ড "যাত্রী"]

অভিনয়শিল্পের রীতি ও পদ্ধতি

লেখক: কনষ্টান্টিন ষ্টানিস্লাভস্কি

অনুবাদক: সুবোধকুমার ঘোষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অধ্যায়

'ষ্টুডিও' বা থিয়েটারসংলগ্ন আটপৌরে থিয়েটারটা কি? আপনাদের সঙ্গে এই প্রশ্নটাই আজ আলোচনা ক'রব আর আপনাদের সহযোগিতায় নিজেও আমি একবার ভেবে দেখবার চেষ্টা ক'রব। আমার মনে হয়, এটা এখন পরিষ্কার যে একটা নাট্যবিদ্যালয় (এই-ভাবে যদি বলা যায়) আমাদের যুগের চাহিদার সঙ্গে খাপ খায়; কেননা, এরকম নানা ধরণের, নানা প্রকৃতির ও নানা আদর্শের বহু বিদ্যালয় সম্প্রতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সারা দেশে। তবুও যত বেশীক্ষণ আপনি সজীব থাকবেন, যতখানি সম্পূর্ণতার সঙ্গে মনকে মুক্ত ক'রবেন আপনি সব রকমের বাহ্যিক, সাধারণভাবে গৃহীত পূর্ব্ব-কল্পনা থেকে, সৃষ্টির কাজে নিজের ও অপরের ত্রুটিগুলি ঠিক ততখানি স্পষ্ট ক'রে আপনি বুঝতে পারবেন।

নিজের সৃষ্টির কাজ দিয়েই মানুষের সারাটি জীবন গড়া, তার সৃষ্টির কাজ শুধু থিয়েটারেই আছে আর এই থিয়েটারেই পূর্ণ বিকাশলাভ করে তার জীবন,—পুরো-পুরি এই বিশ্বাস আঁকড়ে ধরেছেন যাঁরা, ষ্টুডিওই তাঁদের প্রথম বিরতিক্ষেত্র। বাইরে থেকে অভিনয় করা আর সৃজনী-শিল্পে প্রভাব বিস্তার করার কোনও কারণই নেই, সৃজনী-শিল্পের চালক-শক্তি একটিই আর সে হ'ল আমা-দের প্রত্যেকেরই ভেতরকার সৃজনীশক্তি। পুরনো দিনের থিয়েটারে লোকে সৃষ্টির কাজে সমবেত হওয়ার শুধু ভাণ ক'রত, অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মগৌরবায়ন, সংজলভ্য খ্যাতি অর্জ্জন, বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন আর তথা-কথিত 'অনুপ্রেরণা'র অনুশীলনের জন্যই তারা সেখানে আসত।

'ষ্টুডিও'র কাজের প্রত্যেকটি দিক সযত্নে সংগঠিত করতে হবে। ষ্টুডিওর সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আর তাদের সঙ্গে আশ-পাশের অন্যান্য লোকজনের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে পরস্পরের প্রতি পরম শ্রদ্ধার ভিত্তিতে। নাট্যকলা যাঁরা শিখতে চান ষ্টুডিওতে তাঁদের সাত্ত্বিক শক্তির মূল ভিত্তিই হবে অবিচ্ছিন্ন মনো-যোগক্ষমতার বিকাশ। ষ্টুডিও অভিনয়শিল্পীকে শিক্ষা দেবে কেন্দ্রসন্নিবেশের কৌশল। এই উদ্দেশ্যে, আনন্দময় স্বচ্ছন্দ ও উন্মাদনাময় পরিবেশে যাতে অভিনয়শিল্পীর ভেতরকার শক্তিগুলির বিকাশ সম্ভব হয়, তার জন্য নানাধরণের কৌতূহলোদ্দীপক ও আনন্দদায়ক সহকারী পন্থা আবিষ্কার ক'রতে হবে ষ্টুডিওকে, আর অপরিহার্য হলেও এইসব কাজকে হেয় মনে ক'রলে চলবে না। সৃষ্টির কাজে প্রেরণার উৎস সন্ধানে আমাদের আধুনিক অভিনয়শিল্পীরা সাধারণতঃ নিজেদের বাইরে তাকাতেই অভ্যস্ত। এটা তাদের দুর্ভাগ্য। বাইরের ঘটনাই সৃষ্টির প্রেরণা জোগায়, এমনকি সৃষ্টির প্রধান কারণই প্রকৃতপক্ষে এই,—অভিনয়শিল্পী এমনি একটা ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে আছেন দেখা যায়। তিনি মনে করেন,—মঞ্চে তার সাফল্যের প্রকৃত কারণগুলি সবই বাইরের ঘটনা,—যেমন পৃষ্ঠপোষকতা আর ভাড়াটে দর্শকরা। মঞ্চে তার বিফলতার কারণও তাই তার শত্রু আর অনিষ্টকারীরা, কেননা তিনি কি করতে পারেন তা' দেখাবার কিংবা তার প্রতিভার পূর্ণ গরিমায় উন্নীত হবার সুযোগ তারাই কখনও তাকে দেয় নি। কাজে কাজেই, অভিনয়-শিল্পীকে ষ্টুডিও প্রথম যা' শিক্ষা দেবে তা' হ'ল এই যে সব কিছুই, সব সৃজনী-শক্তিই সে দেখতে পাবে তার নিজেরই মধ্যে। প্রত্যেকটি বিষয় ও কাজে আত্ম-পরীক্ষার দৃষ্টিভঙ্গী। শক্তির জন্য আর সৃষ্টির কাজের উৎস ও ফলাফলের জন্য নিজের অন্তরে অনুসন্ধানই হবে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। সৃষ্টির' কাজটা কি? এমন

জীবনই সাধারণতঃ হ'তে পারে না যেখানে সৃষ্টির কাজের কিছু কিছু উপাদান নেই। এটা বুঝতে শিখতে হ'বে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে। ব্যক্তিগতভাবে যে সহবৃত্তি আর প্রবৃত্তি নিয়ে অভিনয়-শিল্পী তাঁর জীবন কাটিয়েছেন,তা যদি থিয়েটারের প্রতিভার ভালবাসা নষ্ট ক'রে দেয়, তা'-হলে তার ফলে দেখা দেয় স্নায়ুতন্ত্রের দৌর্ব্বল্যবোধ, জন্ম নেয় মূর্চ্ছা প্রবৃত্তি আর এই প্রবৃত্তি রূপ নেয় বাহ্যাভিনয়ে আতিশয্য। অভিনয়শিল্পী এইভাবেই প্রকাশ করতে চান তাঁর অভিনয়শক্তির বিশেষত্ব আর একেই বলতে চান তিনি তার 'অনুপ্রেরণা', কিন্তু যা কিছুই আসুক না কেন বাইরের উৎস থেকে, জীবনে তা সহবৃত্তির কার্য্যাবলীকেই শুধু প্রেরণা দিতে পারে, অবচেতন মানসকে জাগিয়ে তুলতে পারে না। অথচ এই অবচেতন মানসেই থাকে সত্যিকারের সহজ জ্ঞান ও আন্তর প্রকৃতি। কাজের কোনওরকম পরিকল্পনা না ক'রে শুধু সহবৃত্তির তাড়নায় যে মঞ্চের ওপর ঘোরাফেরা করে তার প্রেরকশক্তিকে পশুদের থেকে পৃথক করা যায় না—একটা কুকুরও তো বাগে পেলে চুপি চুপি এগিয়ে যায় পাখীর দিকে কিংবা বিড়ালও পেছু নেয় ইঁদুরের।

প্রবৃত্তিগুলি অর্থাৎ সহবৃত্তিগুলিকে শোধন ক'রে নিতে হবে মননশক্তি বা মানুষের চেতনশক্তি দিয়ে আর উন্নীত করতে হবে তাকে সতর্ক মনোনিবেশের সাহায্যে। তাহলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে পার্থক্যটা। প্রবৃত্তিতে যা' কিছু ক্ষণিকের, যা' কিছু পরিবেশসাপেক্ষ, যা' কিছু অপ্রয়োজনীয় ও অসুন্দর সে-সবই বেরিয়ে আসবে তখন। শিল্পীদের মনোযোগ এদের ওপর নিবদ্ধ করতে হবে না। যা' কিছু সহজ জ্ঞান থেকে অভিন্ন; যা কিছু সব সময় সব জায়গায় সব প্রবৃত্তিতে যাকে পাওয়া যায়, প্রত্যেকটি মানব হৃদয় ও মানব মনে যা কিছু সাধারণ শিল্পীর মনোনিবেশ করতে হ'বে তার ওপরই। শিল্পের কোন রাজপথ নেই। দৃশ্যসজ্জার একই ধরণের বাহ্যিক প্রক্রিয়া, একই ধরণের উপকরণ মেরী ও জন উভয়ের ওপরই চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়; যা সম্ভব তা হ'ল তাদের অনুপ্রেরণা আর তাদের নিজস্ব প্রাকৃত শক্তির বিরাট মূল্য সব মেরী ও সব জনের কাছেই পরিষ্কার ক'রে দেওয়া আর কোথায় এর সন্ধান ক'রতে হবে, কি ক'রেই বা নিজেদের অন্তরে একে বাড়িয়ে নেওয়া যায় সেটা তাদের দেখিয়ে দেওয়া। অবিরাম এক কাজ থেকে আর এক কাজে সরিয়ে বা একই সময়ে অনেক দুঃসাধ্য কাজের ভার দিয়ে শিক্ষার্থী শিল্পীদের যে ক্ষতি করা হয়, তার চেয়ে বেশী ক্ষতি আর কিছুতে সম্ভব নয়। নতুন নতুন প্রসঙ্গ সম্প্রতি উত্থাপিত হ'য়েছে অনুশীলনের জন্য, অথচ থিয়েটারে বাস্তব কাজের মধ্য দিয়ে যার কার্যকারিতা পরীক্ষিত হয় নি,—সেইসব প্রসঙ্গ শিক্ষার্থীদের মাথায় যদি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তাহলেও অনুরূপ ক্ষতি করা হ'বে তাদের। একই সময়ে, তাই, অনেক কিছু করার চেষ্টায় বা কতকগুলি বাহ্য লক্ষণের সুবিধা দেখে বিশেষ ভূমিকাভিনয়ে আপনার বিশেষ নৈপুণ্যের সন্ধানে শিক্ষা সুরু ক'রবেন না আপনি শিক্ষার্থী হিসেবে। যথেষ্ট সময় দিতে হবে আপনাকে আপনার মানসিক অভ্যাস পরিবর্ত্তনে, কেননা এই অভ্যাসই আপনাকে বাধ্য করে বাস্তব জীবনে ও অভিনয় জীবনে বাইরের শক্তির ওপর নির্ভর ক'রতে। আপনার ভেতরকার আর বাইরেকার জীবন মিশে যায় যার ভেতর এমন এক দাবকপাত্র হিসেবে অনুভব করুন আপনার সৃজনশীল জীবনকে, প্রফুল্ল হৃদয়ে নিজের ওপর কোনওরকম জবরদস্তি না ক'রে সুরু করুন আপনার অনুশীলন। ষ্টুডিও হচ্ছে এমন একটি জায়গা লোককে যেখানে তার নিজস্ব চরিত্র আর অন্তরের শক্তিকে লক্ষ্য করতে হ'বে। জীবন প্রবাহে নিজেকে ভেসে যেতে দেয় এমন মানুষ হিসেবে নিজের ওপর লক্ষ্য রাখলে চলবে না, এমন মানুষ হিসেবে নিজের ওপর লক্ষ্য রাখার অভ্যাস তাকে রপ্ত করতে হ'বে যে শুধু শিল্পকে ভালবাসে না, নিজের সৃষ্টির কাজ দিয়ে অন্তরে ও বাইরে অপরের দিনগুলি যে ভরে দিতে চায় তার শিল্পের সুখ ও আনন্দে। কেমন ক'রে হাসতে হয় যে জানে না, সবসময় গজর গজর ক'রে বা মনমরা হ'য়ে যে থাকে আর সহজেই যে রেগে যায় কিংবা সাধারণভাবে যে একটি ভিজে কম্বল, ষ্টুডিওতে তার স্থান নেই। ষ্টুডিও যেন শিল্পমন্দিরের

প্রবেশদ্বার। জলন্ত অক্ষরে আমাদের সবার জন্তই এখানে নোটিশ লিখে দেওয়া উচিত,—"শিল্পকে ভালবেসে আর শিল্পে আনন্দ অনুভব ক'রে সব বাধা অতিক্রম করতে শেখ।" লম্বা ও সুন্দর চেহারা বা কৌশলী ও সুকণ্ঠ বলেই শুধু যদি বিশেষ ক্ষমতা নেই এমন কতকগুলি অশিক্ষিত লোককে ষ্টুডিওতে ঢোকাতে হয়, তাহলে আরও শত শত অক্ষম শিল্পীকেই ছেড়ে দেওয়া হবে অক্ষমতায় ভরাক্রান্ত অভিনয়শিল্পীদের সমাজে। শিল্পকে ভালবাসেন বলেই শিল্পসাধনায় রত হ'য়েছেন আমাদের ষ্টুডিও থেকে এমন সুধী কর্ম্মীরা আর বেরিয়ে আসবেন না, বেরিয়ে আসবে তারাই সবরকম ষড়যন্ত্রে যারা অভ্যস্ত। নিজেদের দেশের বিশ্বস্ত সেবক মনে ক'রে দেশের সামাজিক জীবনে প্রবেশের জন্ত নিজের সৃষ্টির কাজকে ব্যবহার করার কোনও ইচ্ছাই এদের নেই, দেশের প্রভু হয়েই এরা বসতে চায় আর চায় সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে দেশ তাদের সেবা করুক।



এম. পি'র মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'ঋষি' চিত্রের একটি দৃশ্যে দীপ্তি রায় ও মাষ্টার বিভু

যারা আবার ষ্টুডিওর সুনামকে দেখেন সবকিছুর ওপরে অথচ যাদের সুবিধার জন্ত ষ্টুডিও তাদের সেই উৎসাহভরা হৃদয়কে করেন উপেক্ষা তাদের পেছনেও কোনও যুক্তি নেই। ষ্টুডিওতে যিনি শিক্ষা দেবেন, তাঁকে মনে রাখতে হবে যে তিনি শুধু অধ্যক্ষ বা শিক্ষক নন, তিনি বন্ধু ও সহকর্ম্মী। তাঁকে মনে রাখতে হবে, তিনি যেন এক ঠিকা শিল্পকর্ম্মী। তাঁর কাছে শিক্ষা নেবার জন্ত যাঁরা এসেছেন তাঁদের শিল্পপ্রীতির সঙ্গে তাঁর নিজের শিল্পপ্রীতি এক হ'য়ে গেছে এরই মধ্যে। শুধু এই ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে, সহপাঠীদের সঙ্গে আর সব শিক্ষকদের সঙ্গে ঐক্যতান-বোধ-জাগরণের পথে শিক্ষার্থীদের পরিচালনা ক'রতে হবে শিক্ষককে। তাহলেই পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছার মনোভাব গ্রহণ ক'রেছে সাধারণ রীতি হিসেবে, এমন এক প্রাথমিক শিল্পীগোষ্ঠিরূপে গড়ে উঠবে ষ্টুডিও আর ক্রমে সম্ভব হ'বে সেখানে যুগোপযোগী নাটকের সুসজ্জ প্রযোজনা।

পরিভাষা :— পূর্ব্বকল্পনা—Preconception,
সহবৃত্তি—Instinct
প্রেরকশক্তি—Incentive
ভাড়াটে দর্শক—Claques
দৃশ্যসজ্জা—Mis-Enscene
সহজাত—Organic

ষ্টুডিও থিয়েটার সংলগ্ন আর্টথিয়েটার থিয়েটার—শিল্পীকে নিজস্ব চরিত্র আর অন্তরে শক্তি লক্ষ্য করতে শেখায় ষ্টুডিও—বাইরের ঘটনা নয়, অন্তরের শক্তিই সৃজনীশিল্পের চালকশক্তি—প্রবৃত্তিকে শোধন ও উন্নত করতে হবে মননশক্তি, চেতনশক্তি ও সতর্ক মনোনিবেশ—সুকান্ত সুকণ্ঠ অশিক্ষিত শিল্পীর ষড়যন্ত্র নয়, চাই সুশিক্ষিত শিল্পপ্রেমিক শিল্পীর ভালবাসা—'শিল্পকে ভালবেসে, শিল্পে আনন্দ অনুভব ক'রে—সব বাধা কাটিয়ে ওঠ'— (ক্রমশঃ)

চলচ্চিত্রের ধর্ম্ম

ফণী মজুমদার



মানুষের ধর্ম্ম কি? শত সহস্র বৎসর ধরে শত শত ভাষায় অনেক বাণী, অনেক দর্শন, অনেক বাদ আউড়েও জগৎ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ায় ইতি করতে পারেনি।

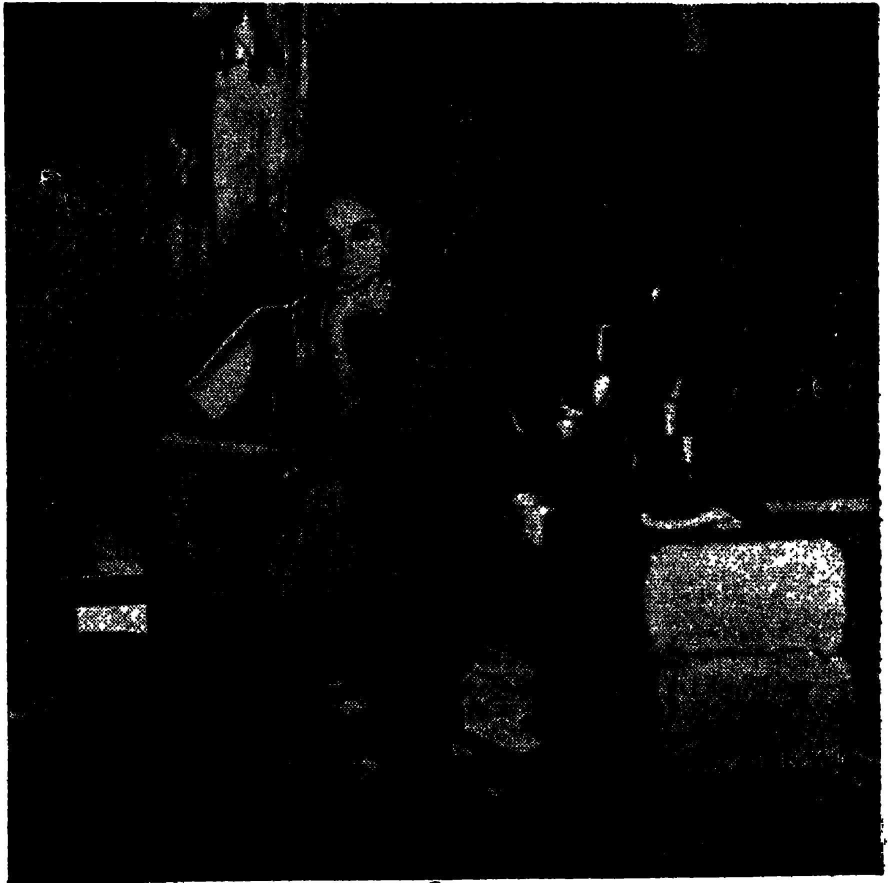
কিন্তু যদি লক্ষ্য করা যায়, তবে দেখতে পাওয়া যাবে—বাণীকার, দর্শণকার, মতবাদকারগণ যত কিছু 'কারণ'ই আমাদের পান করাতে চেয়েছেন—সব 'কারণের' উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমাদের মানসচক্ষুর সম্মুখে মানুষের ধর্ম্মের রূপাবলী সাজিয়ে আমাদের মাতাল করে তোলা।

মানুষ জড়দেহধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব. জড়দেহের সমন্বয়ে প্রাপ্ত ইন্দ্রিয়রাজির সহযোগেই সে রূপ রস গন্ধ ভাব অনুভূতি সংগ্রহ করে মনের দ্বারে পৌঁছে দেয়। সেখানে মন তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় চক্ষুকে অন্তর্মুখীন করে তা দিয়ে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কেই মনের পটে প্রতিফলিত করে দেখবার চেষ্টা করে।

মানুষের এই যে সব কিছুকেই রূপের আকারে মানসপটে দেখবার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা, একে মানুষের ধর্ম্ম আখ্যা দেওয়া যায় কিনা বলতে পারিনা, তবে একে মানবীয় ধর্ম্ম বলে জোর গলায় প্রচার করা চলে। সেই কোন এক অজ্ঞাতকল্পে মানুষ-সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত্ত থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রতি মানুষ অবিচ্ছেদে অহরহ এই মানবীয় ধর্ম্ম পালন করে আসছে, মানুষ স্বীয় মানসপটে কল্পলোকের সূক্ষ্ম আলোকশিখাময়ী তুলিকায় নিত্য আঁকছে আলপনা, দার্শনিক, কবি, নাট্যকার, সাহিত্যিক, রচয়িতা, চিত্রকর, ভাস্কর, অপেন আপন পরিভাষায় নব নব রূপ নব নব চিত্রাবলীর অঙ্কন ও পরিবেশন করছেন, মানুষের মনের পর্দ্দায়।

ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় গ্রাহ্য সমস্ত কিছুকেই রূপে দেখতে ও দেখাতে চাওয়ার এই যে স্বাভাবিক মানবীয় ধর্ম্ম, এর প্ররোচনাতেই বর্ত্তমান যুগের বিচারবাদী বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু হয়ে আবিষ্কার করলেন চলচ্চিত্র। চিত্রকর ভাস্কর যেখানে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ উপায়ে নিশ্চলরূপ সচল-ভঙ্গীতে প্রকাশ করেন সেখানে চলচ্চিত্রকার রূপের প্রত্যক্ষ ও প্রধান বাহন চক্ষুর পুরোভাগে প্রত্যক্ষ উপায়ে ছড়িয়ে দেন আপন সচল-ভাত রূপাবলী।

পৃথিবীর সমস্ত ধ্বনি, রূপ, রস অনুভূতি মুখ্যতঃ চক্ষুর ও গৌণত: অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের গোচর ক্ষেত্রে ফুটিয়ে তুলে দর্শকের মানসপটে অঙ্কিত করাই চলচ্চিত্রের মানবীয় ধর্ম্ম।



চিত্রভারতীর 'ভোর হ'য়ে এলো' চিত্রে লাঞ্ছনা-বিড়ম্বিত মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণে প্রণতি ঘোষ

ষ্টুডিও সংবাদ

কবি চন্দ্রাবতী

বাঙলা লোকসাহিত্যের অবিস্মরণীয় কবি, বাঙলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি 'কবি চন্দ্রাবতী'র অপূর্ব্ব হৃদয়াবেদনভরা জীবনালেখ্যের চিত্ররূপ দিচ্ছেন উদয়ন পিকচার্স। প্রযোজনা করছেন সুবোধ দাস। পরিচালনা করছেন হীরেন নাগ, চিত্রগ্রহণে আছেন বিমল মুখোপাধ্যায়, শব্দগ্রহণে লোকেন বসু, শিল্পনির্দ্দেশনায় কার্ত্তিক বসু, সুরযোজনায় কালীপদ সেন এবং বিভিন্ন ভূমিকায় অনুভা গুপ্তা, অসিতবরণ, পাহাড়ী সান্যাল, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, তুলসী চক্রবর্ত্তী, প্রণতি ঘোষ, গীতশ্রী প্রভৃতি। এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের উদ্যম, নিষ্ঠা এবং চিত্রের বিষয়বস্তুর প্রতি গুরুত্ব ও মমত্ববোধের গুণে এই ছবিটি সকল শ্রেণীর দর্শককে খুসী করার, বিচক্ষণ গুণগ্রাহী চিত্ররসিকদের পরিতৃপ্ত করবে বলেই মনে হয়। ছবিটি নভেম্বর মাসের মধ্যেই মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে মুক্তিলাভ করবে নারায়ণ পিক্চার্সের পরিবেশনায়।

ভোর হ'য়ে এলো

বাঙলা ছায়াছবির প্রতি চিত্ররসিকের হৃত পৃষ্ঠপোষকতা ফিরিয়ে আনার দাবী নিয়ে মুক্তি-প্রতিক্ষায় রয়েছে যে ছবিগুলি তার মধ্যে অন্যতম হোলো 'ভোর হ'য়ে এলো'। আজকের মধ্যবিত্তের জীবনে যে অমারাত্রির অন্ধকার অতলস্পর্শী, যে অভাব অনটন ও অর্থহীনতার বিড়ম্বনা অন্তহীন, ছোট্ট আশা, সামান্য চাওয়া, বিদ্যাবুদ্ধি ও অসামান্য ধৈর্য্য নিয়েও সাধারণভাবে বাঁচবার অধিকারে বঞ্চিত যে মধ্যবিত্তসমাজ তাদেরই দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জীবনস্বপ্ন, সংগ্রাম ও স্বপ্নভঙ্গের সকরুণ চলমান ছবি 'ভোর হ'য়ে এলো'—নবগঠিত প্রতিষ্ঠান চিত্রভারতীর প্রথম একনিষ্ঠ উদ্যম। এই চিত্রের কাহিনী লিখেছেন 'প্রত্যাবর্ত্তন'-খ্যাত সলীল সেনগুপ্ত এবং পরিচালনা করছেন 'পরিবর্ত্তন' ও 'বরযাত্রী'-খ্যাত সত্যেন বসু। প্রকাশ, মধ্যবিত্তসমাজের রক্তক্ষরা জীবননাট্যের রূপায়নে নায়ক শিবনাথ ও নায়িকা ইন্দ্রানী চরিত্রকে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন অভী ভট্টাচার্য্য ও প্রণতি ঘোষ। সম্পূর্ণ নতুন ধরণের একটি ছোট্ট চরিত্রে অভিনয় করেছেন শোভা সেন। নবাগত দুটি কিশোর অভিনেতার অভিনয় নাকি এই চিত্রের অন্যতম আকর্ষণ। চিত্রগ্রহণ করছেন প্রভাত ঘোষ, শব্দগ্রহণে আছেন লোকেন বসু, শিল্পনির্দ্দেশনায় বংশীচন্দ্র গুপ্ত এবং সুরযোজনা করছেন সলিল চৌধুরী। বর্ত্তমানে ছবিটির চিত্রগ্রহণ ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে সমাপ্তপ্রায়। প্রাইমা ফিল্মসের পরিবেশনায় ছবিটি খুব সম্ভবতঃ আগামী ডিসেম্বর মাসে মুক্তিলাভ করবে।



সোরাব মোদী প্রযোজিত 'ঝাসী-কী-রাণী' চিত্রের একটি দৃশ্যে সোরাব মোদী ও মিহারাণী বাগ

প্রতীক্ষা

বিচিত্র এই মানুষ, তার চেয়েও বিচিত্র তার মন, তার সংস্কার। এই বিচিত্র মানুষ ও তার সংস্কার নিয়ে গড়ে উঠেছে প্রদীপ পিকচাসের প্রথম ছবি 'প্রতীক্ষা'। এই ছবির অভিনয়াংশে আছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, স্মৃতিরেখা বিশ্বাস, সিপ্রা দেবী প্রভৃতি। কিনে ক্রাফ্টের পরিবেশনায় ছবিটি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে।



'ঝাঁসী-কী-রাণী' চিত্রে একটি যুদ্ধের দৃশ্য

ঝাঁসী-কী-রাণী

মিনার্ভা মুভিটোন-এর "ঝাঁসী-কি-রাণী" এখন মুক্তি-প্রতীক্ষায়। সোরাব মোদী পরিচালিত এই রঙীন ছবিটি ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। টেকনিকলারে সমৃদ্ধ এই ছবিটি যাতে সার্থক হয় তার জন্য এই ছবির পরিচালক, প্রযোজক সকলেই আপ্রাণ পরিশ্রম করেছেন। প্রকাশ, এই ছবির ঘটনাবলী যাতে নির্ভুল থাকে তার জন্য ৬৭জন ঐতিহাসিকের পুস্তকাদি থেকে দেখে নিয়ে আলোচনা করা হয়। সাড়ে পাঁচ একর পরিমিত জমির ওপর ঝাঁসীর দুর্গের 'সেট্'টি তৈরী করা হয় এবং তখনকার দিনের উপযুক্ত আসবাব-পত্তর, ঝাড়-লণ্ঠন, কাঁচের ও অন্যান্য জিনিষ-পত্তর দিয়ে সাজানোর বন্দোবস্ত হয়। তখনকার দিনে অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে সামরিক অফিসার ও সিপাহীদের ইউনিফর্ম্ম ইত্যাদি তৈরী করাবার জন্য সামরিক ঘাঁটি মীরাট থেকে দর্জ্জিদের আনানো হয়েছিল। চারশো' জন টেকনিশিয়ান, ইলিকট্রিশিয়ান, সূত্রধর, মুটে ইত্যাদি কাজে লেগেছিল সেট তৈরী করবার জন্য। ছবি তোলার সময় হয়েছিল এক ফ্যাসাদ—যুদ্ধের দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ চলার সময় হাজার হাজার লোক এসে দেখতে থাকেন চিত্রগ্রহণ, মোটর গাড়ীতে একেবারে জায়গাটি ভরে যেতো। সবাই বলতো, সেটি হলো 'সোরাব মোদীর কেল্লা'। ছবিটির এখন সম্পাদনা চলছে এবং এরই মধ্যে নাকি সাট লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী'র ছোটবেলাকার ভূমিকায় আছে বাংলার কিশোর-শিল্পী শিখারাণী বাগ ও বড় বয়সের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মেহতাব।

এম পি প্রোডাকসন্স

এম পি প্রোডাকসন্স বর্ত্তমানে তাঁদের তিনটি উল্লেখ-যোগ্য ছবির নির্ম্মাণ-কাজে বিশেষ ব্যস্ত আছেন। ছবি-গুলি হলো 'আঁধি', হিন্দী 'বাবলা' ও 'সাড়ে চুয়াত্তর'।

আঁধি—অগ্রদূত-এর পরিচালনায় 'বাবলা'র অনুরূপ আর একটি হৃদয়াবেদনসমৃদ্ধ ছবি হলো 'আঁধি'। 'আঁধি' 'বাবলা'র কাহিনীকার সৌরীন্দ্রমোহনেরই আর একটি জনপ্রিয় উপন্যাস। ভূমিকালিপিতে রয়েছেন—দীপ্তি রায়, রাধামোহন, মাঃ বিভু। সুর দিয়েছেন দুর্গা সেন। ছবি-খানির চিত্রগ্রহণ সমাপ্তির পথে।

বাবলা (হিন্দী)—ভারতের ও ইউরোপের আন্তর্জ্জা-তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে সম্বর্দ্ধিত 'বাবলা'র চিত্ররূপ গড়ে উঠছে 'অগ্রদূত'বৃন্দেরই পরিচালনায় ও তরুণ হিন্দী সাহিত্যিক গুঞ্জনের সংলাপ রচনায় হিন্দী ও তামিলে। হিন্দী সংস্করণে মাতাপুত্রের অবিস্মরণীয় ভূমিকা দুটির পুনরভিনয় করছেন শোভা সেন ও মাঃ নীরেন ভট্টাচার্য্য।

হিন্দী 'বাবলা'র উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ হবে কুমার শচীন্দ্রদেব বর্ম্মণের সুরযোজনা।

শাপে ছুরান্তর—রণচিত্রের ক্ষেত্রে অঞ্জলার একখানি অনন্ততর পরিবেশনপ্রয়াসী ছবি। প্রগতিশীল তরুণ সাহিত্যিকদের অন্যতম বিজন চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী। পরিচালনা করছেন 'বসু পরিবার'-খ্যাত নির্ম্মল দে। বাংলার নামকরা হাস্যরসাভিনেতাদের বিশিষ্ট সমন্বয় ছাড়া ছবিটি একটি প্রতিভাময়ী নবাগতার সন্ধান দেবে, তিনি সুচিত্রা সেন।

মিঃ সম্পত

জেমিনীর ষ্টুডিওর পঞ্চম চিত্রাবদান "মিঃ সম্পত" হিন্দী চিত্ররাজ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের কাহিনী নিয়ে উপস্থিত হবে বলে শোনা যাচ্ছে। এখানকার সমাজ-জীবনের নানা-দিককে ব্যঙ্গ ও পরিহাসের মধ্য দিয়ে প্রভূত হাস্যোদ্দীপক করে ফোটানো হয়েছে ছবির ঘটনাবলীতে। বিশেষভাবে শিক্ষিত শিল্পীবৃন্দ সম্পূর্ণ নূতন ধরণের কঠিন চরিত্রাবলীকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যাতে দর্শকদের ওপরেও তাঁদের প্রভাব গিয়ে পড়তে পারে। ছবিটি অবিলম্বে বিশিষ্ট কয়েকটি চিত্রগৃহে মুক্তি-প্রতীক্ষায়।

বউদির বোন

খগেন রায়ের পরিচালনায় চিত্রভানুর হাসির ছবি 'বউদির বোন' তোলা হচ্ছে ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বেচু মিত্র, হরিধন, আরতি দাস, পরিতোষ রায়, অনুপ সরকার, নীলমণি ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স

নবগঠিত পরিবেশক-প্রতিষ্ঠান শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স দুখানি ছবির স্বত্ব সম্প্রতি গ্রহণ করেছেন। একখানি হলো এস পি পিকচার্সের কালিদাসের "বিক্রম-উর্ব্বশী"র চিত্ররূপ যার চিত্রনাট্য লিখেছেন মন্মথ রায়। দ্বিতীয় ছবিখানি হচ্ছে এস বি প্রোডাকসন্সের শরৎ-চন্দ্রের "হরিলক্ষ্মী"-র চিত্ররূপ যার চিত্রনাট্য লিখেছেন নিতাই ভট্টাচার্য্য। এতে সুনন্দা দেবী, ভারতী দেবী, জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি অভিনয় করবেন।



'পথিক' ছবির মহরৎ অনুষ্ঠানে উপস্থিত চিত্রতারকাবৃন্দ : মণিকা গুহ ঠাকুরতা, সুনন্দা দেবী, অনুভা গুপ্তা, মঞ্জু দে, ভারতী দেবী, শোভা সেন, বনানী চৌধুরী প্রভৃতি।

সবুজ পাহাড়

বিশ্ববাণী প্রোডাকসন্সের "সবুজ পাহাড়" ছবিখানির চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। জন্মান্তরবাদের রহস্য ভেদ করে মানুষ কি তার ঈপ্সিতকে পায়? কাহিনীকার দেবপ্রসাদ কর এই প্রশ্নেরই সমাধান করতে চেয়েছেন ছবির মাধ্যমে। দেবকীকুমার বসু চিত্রনাট্য সংবর্দ্ধন করেছেন এবং চিত্রনাট্য রচনা ও পরিকল্পনা করেছেন অপূর্ব্বকুমার মিত্র। ভূমিকায়

আছেন : মলয়া সরকার, অজিত-প্রকাশ, ছবি বিশ্বাস, রেণুকা রায়, ভানু বন্দ্যোঃ, অমিতা বসু প্রভৃতি। দক্ষিণামোহন ঠাকুর সুর-সংযোজনা করেছেন। মতিমহল থিয়েটার্সের পরিবেশনায় ছবিখানি মুক্তি পাবে।



'পথিক' ছবির মহরৎ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অভ্যাগতদের একাংশ : সামনের সারিতে দেখা যাচ্ছে : চিত্রলেখা দেবী (পাহাড়ী সান্যালের স্ত্রী), লক্ষ্মী সান্যাল (পাহাড়ী সান্যালের কন্যা), মণিকা গুহ ঠাকুরতা (এই চিত্রের নায়িকা চরিত্রের জন্য নির্ব্বাচিতা), সুনন্দা দেবী, অনুভা গুপ্তা ও ভারতী দেবী ফটো : নির্ম্মল মল্লিক

হরনাথ পণ্ডিত

বীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডুর প্রযোজনায় ও শচীন্দ্রনাথ কুণ্ডুর তত্ত্বাবধানে ন্যাশনাল ফিল্ম প্রডিউসার্সের প্রথম শিক্ষা-মূলক ছবি 'হরনাথ পণ্ডিত'-এর চিত্রগ্রহণ প্রায় সমাপ্তিপথে। গত সপ্তাহে এর তিনখানি গান গৃহীত হয়েছে। বিমল চট্টোপাধ্যায় লিখিত কাহিনীর পরিচালনা করছেন পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী। ব্যবস্থাপনায় আছেন সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় বিকাশ রায়, কানু বন্দ্যোঃ, সদানন্দ, পঞ্চানন ভট্টাঃ, ভূপেন চক্রবর্ত্তী, সন্ধ্যারাণী, বাণী গাঙ্গুলী, প্রীতিধারা প্রভৃতি আছেন।

অমরেশ চরিত

'চিত্রকর' নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে বিধায়ক ভট্টাচার্য্য রচিত 'অমরেশ চরিত' তোলা শীঘ্রই আরম্ভ করবেন। কাহিনীকারই ছবিখানি পরি-চালনা করবেন এবং সুরযোজনা করবেন নচিকেতা ঘোষ। শিল্পীদের মধ্যে কমল মিত্র, জীবেন বসু, বেণু মিত্র, মলয়া সরকার, শোভা সেন প্রভৃতি ছাড়া নতুন কয়েকজনকে গ্রহণ করা হবে।

শুভ মহরৎ

পথিক

সীমাহীন রুক্ষ পথে এগিয়ে চলেছে এক নিঃসঙ্গ পথিক। সারাদিনের অবিশ্রান্ত যাত্রার শেষে ক্লান্ত দেহ আর অবসন্ন মন নিয়ে সে থামে এক অপরিচিত পথের বাঁকে। তাকিয়ে দেখে, চারদিকে তার নতুন পৃথিবী, নতুন পরিবেশ। পথের পথিক এসে দাঁড়ায় সেই নতুন প্রাণের ভীড়ে,—নতুন মানুষের ভীড়ে। শুরু হয় এক বিচিত্র আবেগমথিত নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতময় নতুন পথ চলার কাহিনী—"পথিক"।

চিত্রমায়ার ষষ্ঠ নিবেদন 'পথিক' ছবির মহরৎ অনুষ্ঠান হয়ে গেল গত ২০শে অক্টোবর ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে। দেবকী বসু প্রোডাকসন্স লিমিটেডের এই ছবি-খানি প্রযোজনা ও পরিচালনা করছেন দেবকীকুমার বসু। কাহিনী রচনা করেছেন তুলসী লাহিড়ী। এই 'মহরৎ' অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য এই যে, চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী কোন শিল্পীকে সামনে রেখে প্রথম ছবি তোলা হয় নি। গীতায় বিশ্বরূপ দর্শন স্তোত্র পাঠের মধ্য দিয়ে সুসজ্জিত শ্রীকৃষ্ণ-মূর্তির ছবি নেওয়া হোল; ক্লাপষ্টিপ ধরলেন পাহাড়ী সান্যাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

বাঙলার বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিত্র-ব্যবসায়ী ও শিল্পী।

অভিনেতা শম্ভু মিত্র নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। বহুদিন পরে অতীতের সুপরিচিতা কিশোরী অভিনেত্রী মণিকা গাঙ্গুলী আবার চিত্রাবতরণ করছেন। অন্যান্য ভূমিকায় রূপারোপ করবেন কাহিনীকার তুলসী লাহিড়ী, তৃপ্তি মিত্র, উৎপল দত্ত, কালী সরকার, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, গঙ্গাপদ বসু এবং আরো অনেকে।

সঙ্গীত পরিচালনা করবেন দক্ষিণামোহন ঠাকুর। চিত্রগ্রহণ করছেন বিশু চক্রবর্ত্তী, শব্দগ্রহণ করছেন লোকেন বসু, শিল্প-নির্দ্দেশনার ভার নিয়েছেন সত্যেন রায়চৌধুরী। পরিবেশনা করবেন—নারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড।

অগ্নিযুগ

ভারতীয় কৃষ্টি মন্দিরের উদ্যোগে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের "অগ্নিযুগ"-এর মহরৎ সম্পন্ন হয়েছে গত ২৪শে সেপ্টেম্বর। সে-যুগের বিপ্লবী নেতা শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ কাহিনী রচনা করেছেন। পরিচালনায় নিযুক্ত আছেন অমলেন্দু বসু; সুরযোজনায় অপরেশচন্দ্র লাহিড়ী; শিল্পনির্দ্দেশে দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়।

সত্যনারায়ণ

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে শ্রীসত্যনারায়ণ পিকচার্স তাঁদের প্রথম ছবি "শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ"-এর মহরৎ সম্পন্ন করেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পৌরোহিত্যে। এর কাহিনীটি রচনা করেছেন মণি সিংহ এবং পরিচালনা করছেন হরি ভঞ্জ।

বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত ছবির মহরৎ

সমন্দর

গত ২৪শে আগষ্ট বম্বে টকীজের কর্ম্মী সংঘের প্রথম ছবি 'সমন্দর'-এর (সমুদ্র) মহরৎ হয়েছে। প্রথম 'শট'-এ কাজ করলেন শ্রীমতী উষাকিরণ। জনাব আব্দুল খান চাচা বম্বে টকীজের সবচেয়ে পুরোনো কর্ম্মী এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

বছরখানেক আগে বম্বে টকীজের অবস্থা একটু খারাপ হয়ে পড়েছিল। যাঁরা কাজ করতেন, সময় মতন মাইনে পেতেন না, কখনও কয়েকমাস ধরেও মাইনে বাকী থাকত। এমন সময় সমস্ত কর্ম্মী সংঘবদ্ধ হয়ে ষ্টুডিও চালাবার ভার নেন।

এঁদের কর্ম্মী সংখ্যা ২১৭—তাদের মাসিক বেতন ৭০৲ টাকা থেকে ৭০০৲ টাকা অবধি। একটা Limited Liability Co-operative Society ক'রে এঁরা কাজ সুরু করেন।

এক বছর ষ্টুডিও চালাবার পরে এঁরা একখানা ছবি করবেন স্থির করলেন। প্রথমেই এঁরা পরিচালক ফণী মজুমদারকে এ সম্বন্ধে বলেন। তিনি শুধু এঁদের উৎসাহ দেওয়াই নয়—কোন পারিশ্রমিক না নিয়ে ছবি করতে প্রতিশ্রুতি দেন। কর্ম্মী সংঘ উৎসাহিত হয়ে অন্যান্য শিল্পীদের অনুরোধ জানান এঁদের সাহায্য করতে। ফলে দেব আনন্দ, দিলীপকুমার, নলিনী জয়ন্ত, উষাকিরণ, গোপ, শেখ মুক্তার, বিপিন গুপ্ত—সবাই পারিশ্রমিক না নিয়ে কাজ করতে স্বীকার করেছেন।

ছবির গল্প লিখেছেন ফণী মজুমদার। চিত্রনাট্য লিখেছেন নবেন্দু ঘোষ ও সংলাপ কৃষণ চন্দ।

সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কাজ করবেন তিমিরবরণ ও সূর্য্য পাল।

এ ছবি থেকে যা লাভ হবে তা থেকে ৪০% খরচ হবে নূতন যন্ত্রপাতি কেনায়, ৪০% কর্ম্মী সংঘের তহবিলে রাখা হবে ১০% কর্ম্মী সংঘের বোনাস ১০% শেয়ার ক্যাপিট্যাল।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের উপন্যাস 'পরিণীতা'র হিন্দী চিত্রের রূপায়ণ বোম্বে টকীজে মহড়া চলছে। পরিচালনার ভার নিয়েছেন খ্যাতনামা পরিচালক বিমল রায়—যিনি "মা" ছবিটি পরিচালনা করে সুনাম অর্জন করেছেন। অশোককুমার ও মীনাকুমারী যথাক্রমে শেখর ও ললিতার ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

বিবিধ অনুষ্ঠান

চুঁচুড়া চৌমাথা ব্যায়াম সমিতির তৃতীয় বার্ষিক উৎসব

গত ২৬শে অক্টোবর চুঁচুড়া চৌমাথা ব্যায়াম সমিতির ৩য় বার্ষিক উৎসব উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রথমে গত বিশ্ব-অলিম্পিকে 'বিশ্বশ্রী' বা 'মিঃ ইউনিভার্স' আখ্যাপ্রাপ্ত মনোহর আইচকে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে এক মানপত্র দেওয়া হয়। পরে সমিতির কিশোর-বয়স্ক সভ্য-সভ্যাগণ কর্ত্তৃক ব্রতচারী নৃত্য ও অন্যান্য ব্যায়াম-ক্রীড়া পরিবেশিত হয়। এই অনুষ্ঠানে শ্রীমান অভিক কুমার দত্তের বিভিন্ন যোগাসন ও যোগনাথ সেনের চলন্ত মোটর-গাড়ীকে আটকে রাখার শক্তি ও কৃতিত্ব দেখে দর্শকরা মুগ্ধ হন। সেইসঙ্গে প্রতিটি ব্যায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে বোঝাতে থাকেন ব্যায়াম-শিক্ষক নীলমণি দাস (আয়রন-ম্যান)। পরে অনুষ্ঠিত হয় 'শুম্ভ-নিশুম্ভাসুরমর্দ্দিনী' শীর্ষক মুদ্রা-গীতি-নাট্যাভিনয়। এটির রচয়িতা ও সূত্রধার হিসেবে ছিলেন সহদেব মল্লিক, সঙ্গীত-পরিচালনা করেন যামিনী রায়। সঙ্গীতে ও অভিনয়ে অংশ নেন সমিতির সভ্য-সভ্যাবৃন্দ। কয়েকটি দৃশ্যের প্রয়োগ-কৌশল ও অভিনয় দর্শকদের বিশেষভাবে আনন্দ দেয় ও বিস্মিত করে। সমিতির সম্পাদক বিভূতিভূষণ দত্ত অনুষ্ঠান-টিকে সার্থক ও উপভোগ্য করার জন্য সবিশেষ পরিশ্রম করেছেন।



সোরাব মোদী প্রযোজিত নবীন ছবি 'ঝাঁসী-কী-রাণী' চিত্রে নাম-ভূমিকায় মে[illegible]

বৈজয়ন্তী'র বিজয়া সম্মিলনী

গত ২৬শে আশ্বিন রবিবার সন্ধ্যা ছ'টায় 'বৈজয়ন্তীর' সভ্যবৃন্দ কর্তৃক বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করার দিকে সভ্যরা বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। জনপ্রিয় শিল্পীদের কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত শ্রোতাদের আনন্দ দেয়।

ভারতীয় ললিতকলা কেন্দ্রের সঙ্গীত সম্মেলন

গত ৩১শে আশ্বিন শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় মহাবোধি সোসাইটি ভবনে ভারতীয় ললিতকলা কেন্দ্রের সাংস্কৃতিক বিভাগ কর্তৃক ষষ্ঠ সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'প্রাচীন বাংলা গান'। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বসু। প্রবীণ ও নবীন শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। শিল্পীদের কণ্ঠসঙ্গীত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।



হিন্দী চিত্রজগতের জনপ্রিয়া অভিনেত্রী নলিনী জয়ন্ত

মৈত্রী সঙ্ঘের বিজয়া সম্মিলনী

গত ১১ই অক্টোবর শনিবার হাজরা লেনস্থ "মৈত্রী সঙ্ঘে"র কিশোর বাহিনী ৺বিজয়া সম্মিলন উপলক্ষ্যে তাদের নিজস্ব পূজা প্রাঙ্গনে মঞ্চস্থ করেছিল অমর কথা-শিল্পী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর 'বিন্দুর ছেলে'। কিশোরদের উদ্যম ও প্রচেষ্টা অভিনয়ের মাধ্যমে সত্যই সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হ'য়ে দর্শকের মনকে আকৃষ্ট করে। অভিনয়ে যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দেয় 'বিন্দু'র ভূমিকায় মিনতি রায়, এলোকেশীর ভূমিকায় কল্পনা ঘোষ ও অন্নপূর্ণার ভূমিকায় সান্ত্বনা দাশগুপ্তা। এ ছাড়াও তপন বিশ্বাস, কল্যাণ বসু, আশুতোষ বসু, বন্দনা বসু, চন্দনা দাশগুপ্তা, অমরনাথ, মাষ্টার অবনী ও মাষ্টার শ্যামের অভিনয়ও উল্লেখ-যোগ্য। পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যথাক্রমে নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও দিব্যেন্দু বিশ্বাস।

ঐ দিনই কালিপদ সেনগুপ্তের পরিচালনায় সঙ্ঘের সাধারণ বিভাগ কর্তৃক তুলসীদাস লাহিড়ীর "পথিক" অভিনীত হয়। অভিনয়ে নাটকের প্রধান চরিত্রগুলিতে শ্রীমতী গীতা দে, শ্রীমতী সবিতা সাহা, সন্তোষ গাঙ্গুলী, শচীন ভট্টাচার্য্য ও গিরীন্দ্রলাল সরকার বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন।

নিমাই ঘোষ পাঠিয়েছেন

মাদ্রাজ-সংবাদ

মাদ্রাজ চিত্রশিল্পের অবস্থা ক্রমশঃই মন্দার দিকে চলেছে। প্রথমতঃ এখানকার নামকরা অভিনেত্রী বা অভিনেতারা প্রায় সকলেই একে একে বোম্বাই-এর ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন এবং পাকা-পাকিভাবেই বোম্বাইয়ে বসবাস করছেন। কাহিনীর নতুনত্ব বলতে কিছুই নেই। সেই একঘেয়ে কাহিনী। এতে দর্শকদের ছবি দেখার আগ্রহ দিন দিন কমে যাচ্ছে। ছবির আয়ও এতে অনেক কমে গেছে। জানুয়ারী মাস থেকে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত মাদ্রাজ রাজ্যে চিত্রশিল্প বাবদ আয় হয়েছিল প্রায় এক কোটি তেরো লক্ষ টাকা। কিন্তু আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত আয় হয়েছে তিরাশি লক্ষ ৮০ হাজার টাকা; পরের ক'মাসে আয় আরও কমে গেছে। এখানকার প্রযোজকরা প্রায় সকলেই বেশ চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছেন।

তাঁদের সকলেরই এখন ভালো কাহিনীর দিকে নজর পড়েছে। তাঁরা এখন বেশ ভালোভাবেই বুঝেছেন যে চিরাচরিত প্রথায় স্বামী-স্ত্রীর কলহ এবং পুনর্মিলন--এই ধরণের বস্তাপচা কাহিনী নিয়ে ছবি তুললে তা' চলবে না। তাই এখন ধনিক-শ্রমিক সমস্যা, চাষী-মজুরের জীবনী নিয়েই ছবি তোলার চেষ্টা হচ্ছে। অবশ্য ছবি না চলার আর একটা কারণও আছে, তা' হলো সাধারণ মানুষের আর্থিক অসঙ্গতি। কিন্তু এখানে ছবির অবস্থা যত খারাপই হোক এখানকার রাজ্য-সরকারের চলচ্চিত্র সম্বন্ধে কোন উদার দৃষ্টিভঙ্গী নেই। তাঁরা এটাকে কর আদায়ের একটা অঙ্গ হিসেবেই দেখেন। সহযোগিতা তো দূরের কথা তাঁরা প্রকাশ্যেই এর বিরুদ্ধাচরণ করেন। সমালোচনার কোন কারণ যে নেই তা' নয় কিন্তু সেটা গঠনমূলক হওয়াই দরকার।

●

এখানকার জলহাওয়ার দোষ কিনা জানিনা। এখানে কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীই হোন আর বহিরাগত কোন নামকরা ব্যক্তিই হোন তাঁরা কোন ছাত্রসভায় বক্তৃতা দিতে গেলেই আগে ছাত্রদের সিনেমা দেখতে নিষেধ করেন। তাঁদের কাছে ছাত্রদের নৈতিক অধঃপতনের একমাত্র কারণ হোলো সিনেমা দেখা। কিছুদিন পূর্ব্বে জেনারেল কারিয়াপ্পা মাদ্রাজে ছাত্রদের এক সভায় ঠিক এই কথাই বলেন। আবার সেদিন ছাত্রদের এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রাজাগোপালাচারী অনুরূপ ভাষণই দিলেন। পাচিয়াপ্পার কলেজ ইউনিয়নে সমবেত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি যে বক্তৃতা দিলেন তার সারমর্ম হলো: সিনেমা দেখা ছাত্রদের অনুচিত। যদি কোনদিন ছবির উন্নতি হয় সেদিন তিনি নিজেই ছাত্রদের ছবি দেখতে বলবেন। তিনি বলেন যে, চিত্রশিল্পের বিরুদ্ধে তাঁর কোন রাগ নেই। কিন্তু যেসব প্রযোজক অশ্লীল ছবি তোলেন তাঁদের বিরুদ্ধেই তাঁর বক্তব্য। এইসব ছবির সমস্ত অংশ সেন্সর কর্ত্তৃপক্ষের কাটা সম্ভব নয়। সেন্সর কর্ত্তৃপক্ষ নিতান্ত আপত্তিজনক অংশগুলিই বাদ দিয়ে থাকেন।

●

এবার এখানকার চিত্রশিল্পের উল্লেখযোগ্য খবরাখবর জানাচ্ছি।

এখানকার নামকরা অভিনেত্রী ভানুমতীর ষ্টুডিওটির নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় শেষ হয়ে এলো। এই ষ্টুডিওটির নামকরণ হয়েছে 'ভারিণী' ষ্টুডিও। ষ্টুডিও নির্ম্মাণ শেষ হলেই সেখানে ছবি তোলা সুরু হবে। ভানুমতীর নিজস্ব ছবি 'চণ্ডীরাণী'র স্যুটিং হচ্ছিল বাউহিনী ষ্টুডিওতে। তিনি এখন ছবির বাকী অর্দ্ধাংশ তাঁর নিজস্ব ষ্টুডিওতেই তুলবেন বলে স্থির করেছেন।

●

শরৎচন্দ্রের কাহিনীর জনপ্রিয়তা এখানে দিন দিন বাড়ছে। বিনোদ পিকচার্স শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন। দেবদাস ও পার্ব্বতীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন যথাক্রমে নাগেশ্বর রাও এবং সাবিত্রী।

★ টুকরো খবর ★

বর্ত্তমানে নিউ দিল্লীতে কোনো ষ্টুডিও নেই। বিশেষ খবরে প্রকাশ যে, এখানে দু'টো ষ্টুডিও নির্ম্মাণের জন্য জায়গা পছন্দ করা হয়েছে এবং নক্সা প্রভৃতি মঞ্জুর করার জন্য মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে কি করা কর্তব্য সে বিষয়ে গভীর আলাপ-আলোচনা করছেন বলে জানা গেছে।

●

দিল্লীর রাজ্য-সরকার চিত্রগৃহে ধূমপান নিষিদ্ধ করে দেওয়ার আইনের একটি খসড়া পরিষদের আগামী অধিবেশনে পেশ করার জন্য তৈরী করেছেন। খসড়াতে আছে, সিনেমা, থিয়েটার বা প্রেক্ষাগৃহে কোন ব্যক্তিকে ধূমপান করতে দেখলে তাকে টিকিটের দাম ফেরৎ বা কোন ক্ষতিপূরণ না দিয়েই বাইরে বের করে দেওয়া যাবে, ৫৭ ধারায় গ্রেপ্তার করা যাবে অথবা ২০৲ টাকা জরিমানা করা যাবে। সিনেমা বা থিয়েটারের হলে প্রদর্শনী আরম্ভ হবার আধঘণ্টা আগে ধূমপান বন্ধ করে দিতে হবে এবং প্রদর্শনী শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কাউকে ধূমপান করতে দেওয়া হবে না।



এস, পি-র মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'ধাধি' চিত্রে মাষ্টার

●

সম্প্রতি দিল্লীতে ভারত ইউনিয়নের বিভিন্ন রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের যে বৈঠক হয় তাতে চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটি কর্ত্তৃক সমস্ত রাজ্যের প্রমোদ-কর শতকরা কুড়ি টাকাতে বেঁধে দেওয়ার কথা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রীরা বেশীর ভাগই রাজী হননি।

●

আগামী ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে নভেম্বর নিউইয়র্কে যে ইণ্টারন্যাশনাল আর্ট ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল হচ্ছে তাতে সম্ভাব্য প্রদর্শনের জন্য ভারত থেকে ৩ খানা ছবি পাঠানো হচ্ছে। উৎসবে প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত ছবিগুলির মধ্যে যেগুলি প্রদর্শনের যোগ্য বলে নির্ব্বাচিত হবে সেগুলিকে শিল্পসম্পর্কিত বিশিষ্ট চলচ্চিত্র এই বলে সার্টিফিকেট দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। ভারতীয় ছবি তিনখানির নাম 'ইণ্ডিয়ান আর্ট থ্রু দি এজেস্', 'ফরগটন্ এম্পায়ার' ও 'সেভেন প্যাগোডা মহাবালিপুরম'। ভারতবর্ষ ছাড়া অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, গ্রেট বৃটেন, ইটালী, নেদারল্যাণ্ড, কানাডা ও ইউনাইটেড ষ্টেটস্ এই উৎসবে যোগ দেবে।

●

লাহোরের এক খবরে প্রকাশ, পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানে প্রেরিত ভারতীয় ফিল্মের সমস্ত প্রিণ্টগুলি অতর্কিতে বাজেয়াপ্ত করেছেন। এর ফলে পাকিস্তানের যে সমস্ত পরিবেশক ইতিমধ্যে ভারতীয় ফিল্মের জন্য মোটা টাকা আগাম দিয়ে বসে আছেন তাঁরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

ইউনাইটেড ষ্টেটস্-এর বাণিজ্য বিভাগের মতে বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার চিত্রগৃহ আছে এবং প্রতি সপ্তাহে কমবেশী প্রায় ২২০,০০০,০০০ দর্শক ছবি দেখে থাকেন।

●

১৯৫২ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত বারোমাসে ইতালীর চলচ্চিত্রশিল্পের উৎপাদন হচ্ছে—পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি ১২৮; ডকুমেন্টারী ৪২২ এবং সংবাদচিত্র ৩৬৭। ঐ বারোমাসে ছবির রপ্তানী ১৯৪৯ সালের দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায়। ইতালীয় ছবির মুখ্য বাজার হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড।

●

প্যারিসের এক সংবাদে প্রকাশ, এখন থেকে ফ্রান্সে বিদেশী ছবির আমদানী কমিয়ে দেওয়া হবে। ১৯৫২-৫৩ সালে মোট ছবি আসতে দেওয়া হবে ১৩৮ খানা মাত্র। কোন্ দেশের কত ছবি আসতে দেওয়া হবে তা প্রকাশ করা না হলেও একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আমেরিকান ছবির পূর্ব বছরের সংখ্যা ১২১খানাকে কমিয়ে ১১২ খানিতে দাঁড় করানো হয়েছে।



চিত্রভারতীর বাস্তবধর্মী ছবি 'ভোর হ'য়ে এলো'-র নায়িকার ভূমিকায় প্রণতি ঘোষ



ফিল্মে ক্র্যাফ্ট পরিবেশিত মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'প্রতীক্ষা' চিত্রে স্মৃতিরেখা বিশ্বাস

বিমানে দীর্ঘ পাড়ির একঘেয়েমী নষ্ট করার জন্য পৃথিবীর মুখ্য যাত্রীবিমানগুলিতে সিনেমা দেখাবার উদ্যোগ হচ্ছে। পরীক্ষামূলকভাবে সম্প্রতি বি ও এ সি একটি বিমানে চিত্রপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাতে অসুবিধে ঘটেছিলো অনেক যাত্রীদের। এইজন্যে পরিবর্তিত ব্যবস্থায় সিনেমার ব্যবস্থা করা হবে বিমানের একধারে যাতে চিত্রামোদী যাত্রীরাই কেবল দেখতে পান।

●

ভেনিস ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেছে। Jeux Interdits নামে একটি ফরাসী ছবি প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন ফ্রেডারিক মার্চ 'ডেথ অব এ সেল্সম্যান' ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য।



বিন্দুর ছেলে

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

দরদী - কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের অমর-কাহিনী 'বিন্দুর ছেলে'র চিত্ররূপ দেখলাম। এরকম হৃদয়াবেদনসমৃদ্ধ প্রাণবন্ত কাহিনী একমাত্র শরৎচন্দ্রই সৃষ্টি ক'রতে পারেন। 'বিন্দুর ছেলে'র চলচ্চিত্র রূপায়ণ আমাদের নিরাশ করে নি। হাসিকান্নার আলোছায়ায় আমাদের মনকে স্নিগ্ধ করেছে, তৃপ্ত করেছে। অভিনয়ের টিম-ওয়ার্ক খুব ভাল লেগেছে। অন্নপূর্ণার ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন মলিনা, তাঁর অভিনয় শুধু নৈপুণ্যে উজ্জ্বল নয় প্রতিভার স্পর্শেও গভীর। বিন্দুর ভূমিকায় সন্ধ্যারাণীও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সব ছবি জুড়ে আছেন এই বিন্দু এবং অন্নপূর্ণা এবং এঁরা এঁদের অভিনয়-কৃতিত্বে ছবিটিতে প্রাণসঞ্চার করেছেন। অন্যান্যেরা নিজ নিজ ভূমিকায় সু-অভিনয়ই করেছেন।

শরৎচন্দ্রের কাহিনী ও সংলাপের মাধুর্য্যে পরিচালনার দোষ-ত্রুটি সহজেই দর্শকের চোখ এড়িয়ে যায়। চিত্রনাট্য ও পরিচালনার যে একটিমাত্র ত্রুটি অত্যন্ত বড় হয়ে চোখে লেগেছে তা' হ'ল খেমটাওয়ালী নাচগানের দৃশ্যটি যেন ছবির একটি ছন্দপতন হ'য়েছে।

আলোকচিত্রগ্রহণ প্রশংসনীয়।

সব জড়িয়ে 'বিন্দুর ছেলে' একটি উপভোগ্য ছবি হয়েছে। ছবিটির সাফল্য কামনা করি।

শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। ইতি—

শ্রীপাঁচুগোপাল দে
শেওড়াফুলী, হুগলী



বেতার কর্ত্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা

মাননীয় 'চিত্রবাণী' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের একটা বিষয় কিছুতেই বুঝে উঠতে পারা যায় না। বেতার পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্ত্তৃপক্ষের কোনো নির্দ্দিষ্ট রীতি-নীতি আছে, না, কর্ত্তার স্বেচ্ছার ওপর ভর দিয়ে যথেচ্ছাচারই নিয়ম? 'প্রোগ্রাম' পেশের কায়দাটাকে বিশ্লেষণ ক'রলেই হয়তো দ্বিতীয়োক্তটাই স্বীকার করতে হয়।

গত ২৪শে অক্টোবর রাত ৮-৩০ মিনিটে রাজেন্দ্রপ্রসাদের ৫।৬ মিনিটের বক্তৃতার জন্যে সেদিনের নাট্যাভিনয় সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা হোলো। প্রতি বুধবার রাত ৮-৪৫ মিনিটে অরূপ ও অপরূপের আসরটিকে নির্দ্ধারিত ১৫ মিনিটের পরিবর্ত্তে ২৯শে অক্টোবর ৫ মিনিটের আসর দিয়ে বাকী ১০ মিনিট রেল সম্বন্ধে জনৈক কর্ত্তৃপক্ষের বক্তৃতাটি

বাংলায় অনুবাদ ক'রে শোনানো হোলো। আবার অনেক সময় এ আসরটিকে পরিবর্ত্তন করা হয়, কিছুদিন পূর্ব্বে সে অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তে একটি বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ শুনিয়ে তাই-ই হয়েছে। গত কয়েক মাস পূর্ব্বে রাত ৮·৪৫ মিনিটে ষ্টুডিও রেকর্ডে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিবেশনের অনুষ্ঠান 'বেতার জগৎ'-এ নির্দ্ধারিত ছিলো কিন্তু উক্ত অনুষ্ঠানটিকে সম্পূর্ণ উজাড় করে বক্তৃতার অনুবাদ শোনানো হোলো।

কিন্তু বেতার কর্ত্তৃপক্ষদের একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—বাংলার বেতার শুধুমাত্র বাংলার বাঙালীদের নয়। বাংলার বাইরে সমস্ত প্রবাসী বাঙালীদের তাতে দাবী আছে। জাতীয়তাকে যাঁরা ভালবাসেন, সেই শ্রেণীভুক্ত বাঙালীরা All-wave-set-এর গ্রাহক হলেও হিন্দী ছায়াছবির সঙ্গীত ইত্যাদির মধ্যে মোহযুক্ত নন, জাতীয় অনুষ্ঠানগুলির তাঁরা ভক্ত। স্থানীয় বাঙালীর ওপর কৃপাবশতঃ তাঁরা যদি নির্দ্ধারিত অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেন, তবে আমার অনুরোধ প্রবাসী বাঙালীদের ওপর তাঁদের হৃদয়হীন কৃপাকে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করুন, অর্থাৎ স্থানীয় মিটারেই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হোক। নতুবা নতুন অনুষ্ঠানটী সর্ব মিটারে প্রচারিত না-করে স্থানীয় বা অ-স্থানীয় মিটারে স্থান দিয়ে নির্দ্ধারিত অনুষ্ঠানটী যেকোনো মিটারে পরিবেশন করুন। অনেক সময় তাঁরা এই পন্থা অবলম্বন করে থাকেন ; আবার অনেক সময় তা প্রত্যাখ্যানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু এ দু'য়ের এলোমেলো তারতম্যের কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

আশা করি, কলিকাতার বেতার কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞরা 'বেতার-জগতে' প্রকাশিত অর্থাৎ নির্দ্ধারিত অনুষ্ঠানগুলিকে পরিবর্ত্তন না করে মিটারের পরিবর্ত্তন করতে সম্মত হবেন। নতুবা অনুষ্ঠান দিয়ে এই রকম পরিবর্ত্তনের পাগলামি বা ছেলেমানুষী যথেচ্ছাচার লক্ষ্য করা সত্ত্বেও 'বেতার-জগৎ' ক্রয় করে জাতীয় সরকারের মুদ্রাভাণ্ডারে অহেতুক অর্থ-জোগানদেবার মতো উদার তথা দানশীল চরিত্রের ব্যক্তি এ-দুনিয়ায় দুর্লভ।

নমস্কার নেবেন। ইতি-

সন্দীপন,
কুকস্ কমপাউণ্ড,
পুরুলিয়া (মানভূম)

চিত্রগ্রহণের অন্তরালে



'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র' ছবির শুটিং-য়ের ফাঁকে চা-পানে ক্লান্তি দূর করছেন মলিনা দেবী : চিত্রগ্রহণ করছেন সুরেশ দাস ফটো : নির্ম্মল মল্লিক

চিত্রবাণী প্রেস—৫, হাজরা লেন, কলিকাতা-২৯ (ফোন : সাউথ ১১১১) হইতে নিতাই চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক

মুদ্রিত ... [illegible] ...ালয় হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত



